ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১
Fruit and Vegetable Cultivation-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

প্রফেসর ড. জসিম উদ্দিন
ড. সৈয়দ নাসির উদ্দিন
ড. মো: সাহিনুল ইসলাম
ড. মোছা আখতার জাহান কাঁকন
মো: কবির হোসেন **(প্যাডাগগ)**
আবদুল্লা আল মাবুদ (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

প্রফেসর ড. ইমরুল কায়েস

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : , ২০২২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২৩

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানবসম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংস্করণ করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষে ২৯টি ট্রেডের মধ্যে ১৩টি ট্রেডের ২৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টি ট্রেডের ৩২টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশনে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী (Personal Protective Equipment for Cultivation Fruits&Vegetables)	১ - ৮
দ্বিতীয়	শাকসবজির চারা উৎপাদন **(Seedling Production of Vegetables)**	৯ - ৩৫
তৃতীয়	শাকসবজি চাষ **(Cultivation of Vegetables)**	৩৬ - ৬৪
চতুর্থ	সোলানেসী গোত্রের সবজি চাষ **(Cultivation of Solanaceous Vegetables)**	৬৫ - ১০৮
পঞ্চম	ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজি চাষ **(Cultivation of Cruciferous Vegetables)**	১০৯ - ১৩৮

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ফল চাষ **(Cultivation of Fruits)**	১৪১ - ১৬৮
দ্বিতীয়	ফল গাছের বংশবিস্তার **(Propagation of Fruit Plants)**	১৬৯ - ২০৩
তৃতীয়	গ্রীষ্মকালীন ফল চাষ **(Cultivation of Summer Fruits)**	২০৪ - ২৩২
চতুর্থ	বর্ষাকালীন ফল চাষ **(Cultivation of Monsoon Fruits)**	২৩৩ - ২৭৪

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১
Fruit and Vegetable Cultivation-1

প্রথম পত্র

নবম শ্রেণি

বিষয় কোড: ৯৪১৩

প্রথম অধ্যায়

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশনে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী

(Personal Protective Equipment for Cultivation Fruits&Vegetables)

এই অধ্যায় শেষে -

- চোখকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে সুরক্ষিত রাখার উপায় বলতে পারবে
- ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- হাতকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- পা ও পায়ের পাতাকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে
- মাথা ও ঘাড়কে সুরক্ষিত রাখতে পারবে

১.১ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী

কিছু বিশেষ পরিধেয় পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম ও উপকরণের সমষ্টিগত নাম, যা পরিধানকারীকে ঝুঁকি, বিপদ বা রোগজীবাণুর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। যেমন রাসায়নিক দ্রব্যাদি হাতে ধরার সময় হাতে গ্লাভস

পরা উচিত। প্রতিটি শ্রমিক বা কর্মচারী, যার পেশাগত কর্ম সম্পাদনের সময় ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা আছে, তার কাছে অবশ্যই ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী থাকা অত্যাবশ্যক। বালাইনাশক মেশানো, বালাইনাশকের খালি প্যাকসমূহকে পরিষ্কার করা, বালাইনাশক স্প্রে করা ও বালাইনাশক স্প্রে করার উপকরণ পরিষ্কারের সময় কি পরতে হবে সে সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য আপনার বালাইনাশককের লেবেলটি ভালভাবে পড়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, বালাইনাশককের বোতল বা প্যাকেটের গায়ে বিবৃত থাকে কমপক্ষে সেই পিপিই পরে থাকা উচিত।

১.২ ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর তালিকা

ফ্রুট এন্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন বইয়ের সকল ব্যবহারিক কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নিলখিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ব্যাবহার করা প্রয়োজন-

১। সুরক্ষা চশমা

২। ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ

৩। বায়ু-পরিশোধনকারী রেসপিরেটর

৪। হাত মোজা /গ্লাভস

৫। সর্বাঙ্গ ঢাকা পোশাক বা ট্রাউজার

৬। রাবারের বুটজুতা বা গামবুট

৭। টুপি বা হুড

১.৩ চোখকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

চোখকে ছিটে, স্প্রে-এর ফোঁটা এবং ধুলো থেকে সুরক্ষিত রাখতে সুরক্ষা চশমা পরতে হবে। শুধুমাত্র বালাইনাশক নিয়ে কাজ করার সময়ই এই সুরক্ষা চশমাগুলি ব্যবহার করুন। একই সুরক্ষা চশমা অন্য কাজে ব্যবহার করবেন না। সুরক্ষা চশমাগুলোকে অবশ্যই সুরক্ষিতভাবে, রোদ ও ধুলো থেকে দূরে রাখা উচিত এবং ভালো হয় একটি পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগে যদি রাখা হয়।

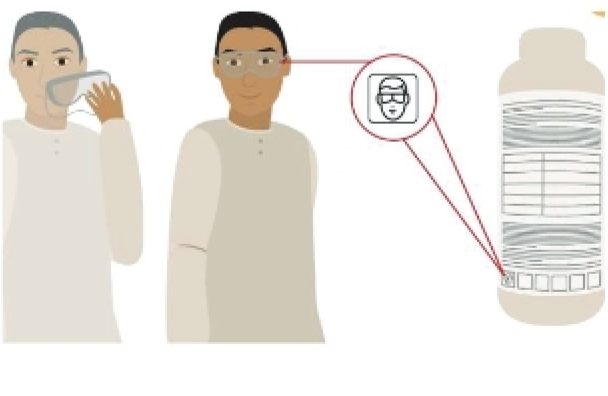

চিত্র: সুরক্ষা চশমা

২০২৪

১.৪ মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে সুরক্ষিত রাখতে করনীয়

মুখমন্ডল ও মুখের অভ্যন্তরকে বালাইনাশক ছিটে বা বড় ফোঁটা থেকে সুরক্ষিত রাখতে একটি মুখের আবরণ পরতে হবে। বালাইনাশক মেশানোর সময় একটি মুখের আবরণ এবং সুরক্ষা চশমা পরে নিতে হবে। মুখের আবরণ বাষ্প, ধোঁয়া বা কুয়াশা থেকে সুরক্ষিত করতে পারবে। ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটি রেসপিরেটর ব্যবহার করতে হবে। যেখানে চোখের বেশি সুরক্ষার প্রয়োজন হবে সেখানে সুরক্ষা চশমা ব্যবহার করতে হবে। কিছু বালাইনাশকের লেবেলে ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ পরার কথা বলা হয়ে থাকে।

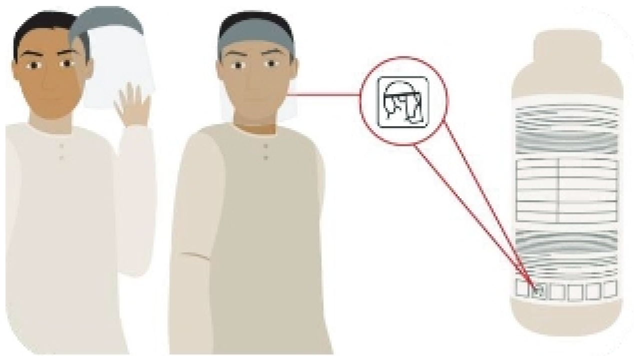

চিত্র: ডাস্ট মাস্ক বা ধুলোরোধী মুখোশ

১.৫ ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

একটি আবদ্ধ জায়গাতে বা বাতাস নিজের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় স্প্রে করলে বালাইনাশকের স্প্রে শ্বাসে চলে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। স্প্রে হল তরলের ফোঁটাসমূহ যা বাতাসের মধ্য দিয়ে গতিশীল হতে পারে। সেগুলো খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে ছোট কণা তৈরি করতে পারে, যা খুব সহজেই শ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করতে পারে। একটি রেসপিরেটর ব্যবহারের মাধ্যমে ফুসফুসকে সুরক্ষিত রাখা যায়। রেসপিরেটর ব্যবহারের জন্য কোন রেসপিরেটরটি সঠিক হবে সে ব্যাপারে বালাইনাশকের লেবেলটি দেখে নিতে হবে এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

২০১৪

চিত্র: বায়ু পরিশোধনকারী রেসপিরেটর

১.৬ হাতকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

শরীরের মধ্যে হাত ও কবজিই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বালাইনাশকগুলির সংস্পর্শে আসে। বালাইনাশকের প্যাক খোলা, অদ্রবীভূত পণ্য পরিমাপ করা এবং স্প্রেয়ার ব্যবহার করার সময় হাত ব্যবহার করতে হবে, যেখানে লীক হওয়া বা চুঁইয়ে পড়ার ঘটনা ঘটতে পারে।

১.৬.১ হাত ও কবজিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য গ্লাভস ব্যাবহার করা

১। বালাইনাশক মেশানোর সময়

২। বালাইনাশক স্প্রে করার সময়

৩। উপকরণ পরিষ্কার করার সময়

হাতমোজা পরার আগে হাত ধুয়ে নিতে হবে এবং হাতমোজাগুলো খোলার আগে সেগুলোকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

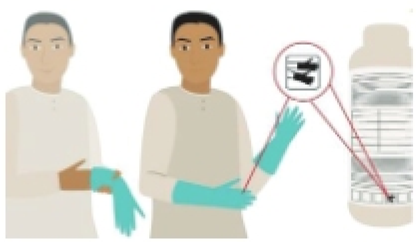

চিত্র: হাত মোজা বা গ্লাভস

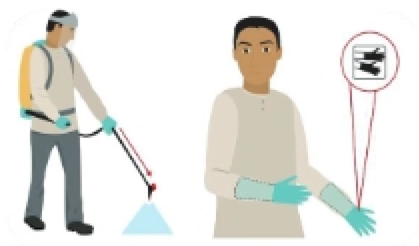

চিত্র: বালাইনাশক নিচে স্প্রে করার পদ্ধতি

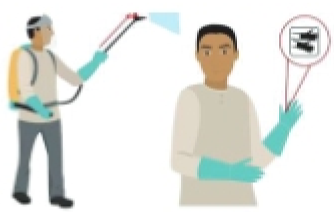

চিত্র: বালাইনাশক উপরের দিকে স্প্রে করার পদ্ধতি

২০২৪

১.৭ পা ও পায়ের পাতাকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

নীচের দিকে বালাইনাশক স্প্রে করার সময় এবং স্প্রে করা পাতাগুলির সংস্পর্শে থাকার সময় পা ও পায়ের পাতাকে বালাইনাশকের ছিটে থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক বা ট্রাউজার ও রবারের বুটজুতা পরতে হবে। বুটজুতাগুলো ভিতর ও বাইরের দিক থেকে পরিষ্কার এবং ভাল অবস্থায় আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে । সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক/ট্রাউজারের পায়ের অংশগুলিকে বুটজুতার বাইরের দিকে রাখতে হবে, যাতে স্প্রে গড়িয়ে বুটজুতার ভিতরে চলে না যায়। খুলে ফেলার আগে অবশ্যই বুটজুতাগুলোকে পরিষ্কার করতে হবে।

চিত্র: বুটজুতার ব্যবহার

১.৮ শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

পিপিই ব্যবহারের সময় কাজের পোষাকের উপর পরা উচিত যাতে দুই স্তর জামা পরা অবস্থায় থাকা যায়। শরীরকে সুরক্ষিত রাখতে সঠিক পিপিই পরতে হবে যাতে:

১। বালাইনাশক মেশানো ও ব্যবহারের সময় ত্বককে ছিটে ও হুলকে পরা থেকে সুরক্ষিত রাখা যায়

২। পিঠ ও হাতকে ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার থেকে ও বালাইনাশক লীক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

১.৯ মাথা ও ঘাড়কে সুরক্ষিত রাখতে করণীয়

উপরের দিকে স্প্রে করার সময় এবং স্প্রে করা পাতাগুলির সংস্পর্শে থাকার সময় উপর থেকে বালাইনাশকের পড়ন্ত ফোঁটাগুলো থেকে মাথাকে সুরক্ষিত রাখতে টুপি বা হুড পরতে হবে।

১.৯.১ টুপি বা হুড পরার নিয়ম

১। টুপি বা হুড পরার সময় বা খুলে ফেলার সময় পরিষ্কার হাতমোজা বা হাত ব্যবহার করতে হবে।

২। টুপি পরার সময় লম্বা চুল পিছনে বেঁধে নিতে হবে এবং ঢেকে দিতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যে, টুপি যাতে মাথাতে আটকে থাকে।

৩। যদি একটি হুড যুক্ত কভার-অল বা সর্বাঙ্গা-ঢাকা পোষাক পরা থাকে, তাহলে নিশ্চিত করতে হবে যে, চুল যাতে হুডের ভিতরে আটকে থাকে।

৪। যদি সুরক্ষা চশমা পরা থাকে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, টুপিটি যাতে সুরক্ষা চশমা ও ত্বকের মধ্যে থাকা সীলটিকে ভেঙ্গে না দেয়।

৫। অবশ্যই টুপিটিকে শুধুমাত্র বালাইনাশকের সাথে ব্যবহারের জন্য রেখে দিতে হবে

চিত্রঃ টুপি বা হুডের ব্যবহার

নিরাপদ কাজের পরিবেশ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সকলকে ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রী ব্যাবহার করতে হবে। ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সামগ্রীর সীমাবদ্ধতা, কী করে সামগ্রীর প্রতিটি উপাদানকে রক্ষণাবেক্ষণ করে রাখতে হবে এবং অকেজো হয়ে গেলে সামগ্রীটিকে কীভাবে বর্জন করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। চোখকে ছিটে, স্প্রে-এর ফোঁটা এবং ধুলো থেকে সুরক্ষিত রাখতে সুরক্ষা চশমা পরতে হবে

২। হাত ও কবজিকে সুরক্ষিত রাখার জন্য গ্লাভস ব্যবহার করতে

৩। বালাইনাশক স্প্রে করার সময় পা ও পায়ের পাতাকে বালাইনাশকের ছিটে থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সর্বাঙ্গ ঢাকা পোষাক, ট্রাউজার ও রবারের বুটজুতা পরতে হবে

৪। বালাইনাশক উপরের দিকে স্প্রে করার সময় মাথাকে সুরক্ষিত রাখতে টুপি বা হুড পরতে হবে

এসো নিজে করি নিচের ছবিগুলো দেখে পিপিইর নাম লিখ এবং তাদের ব্যবহার উল্লেখ কর।

নাম	ছবি	ব্যবহার

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সুরক্ষা চশমার কাজ কী?

২। হ্যান্ড গ্লাভস এর কাজ কী?

৩। গাম্বুট কেন ব্যবহার করা হয়?

৪। টুপি বা হুড কেন ব্যবহার করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। হাত ও কবজিকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়।

২। ফুসফুসকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যায়।

৩। কিভাবে শরীরকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী বলতে কি বুঝ? ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর তালিকা প্রদান কর।

২। ব্যক্তিগত সুরক্ষা হিসেবে টুপি বা হুড পরার নিয়ম আলোচনা কর।

জব ১: পিপিই পরিধান করার নিয়ম

১। কাজের পোশাকের উপর পিপিই-টি পরে নিতে হবে। পিপিই-টিকে ঘাড়ে আটকে নিতে হবে।

২। পিপিই-র পায়জামার পা গুলোকে বুটজুতার বাইরে পরে নিতে হবে, যাতে বালাইনাশক গড়িয়ে বুটজুতার ভিতরে ঢুকে না যায়।

৩। নীচের দিকে বা সমান্তরালভাবে স্প্রে করার সময় হাতমোজাগুলিকে জামার ভিতরে গুঁজে নিতে হবে।

৪। উপরের দিকে ও সমান্তরালভাবে স্প্রে করার সময় জামার হাতাকে দস্তানার ভিতরে গুঁজে নিতে হবে।

৫। যদি উপরের দিকে ও সমান্তরালভাবে স্প্রে করেন, হাতা ও দস্তানার জোড়ায় টেপ লাগিয়ে আটকে দিতে হবে।

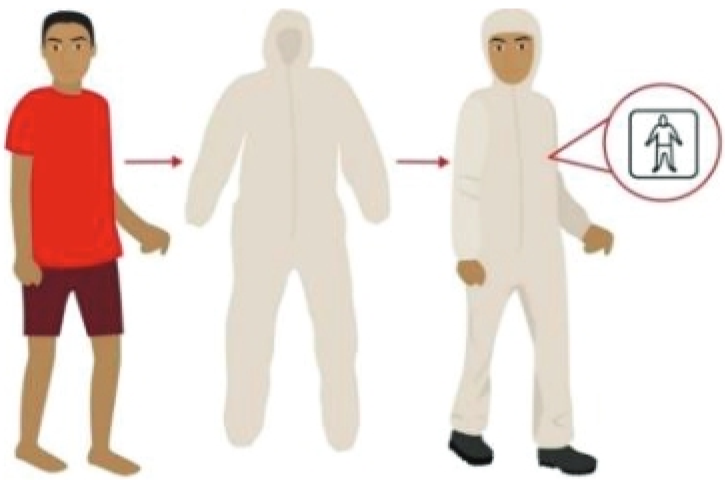

চিত্র: পিপিই পরিধান করার নিয়ম

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাকসবজির চারা উৎপাদন

(Seedling Production of Vegetables)

কিছু কিছু সবজি আছে, যা সরাসরি মুল জমিতে রোপণ করা যায় না। প্রথমে বীজতলায় বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যেমে চারা তৈরী করে নেয়া হয়। পরবর্তিতে মুল জমিতে রোপণ করা হয়। বেগুন, মরিচ, ফুলকপি, বাধাকপিসহ আরো অনেক সবজির চারা বীজতলায় তৈরী করা হয়ে থাকে। বিশেষভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে বীজতলায় বীজ থেকে চারা তৈরী করা হয়।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন প্রকার সুস্থ সবল শাকসবজির চারা চিহ্নিত করতে পারবে
- বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা, বীজের হার, বীজতলা তৈরি ও বীজতলায় বীজ বপন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- বীজতলায় চারার অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে
- চারা উত্তোলনের সঠিক সময় ও পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারবে
- সবজির উৎপাদনে অঙ্গজ বংশবিস্তার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে
- সবজির বীজ হার নির্ণয় ও আধুনিক বীজতলা হাতে কলমে তৈরি করতে পারবে

২.১ শাকসবজির পরিচিতি ও ব্যবহার

২.১.১ শাকসবজির শ্রেণিবিভাগ

শাকসবজি এক গুরুত্বপুর্ণ উদ্যান ফসল। পৃথিবীতে প্রায় ৮০টি পরিবারের ১২০০ প্রজাতির উদ্ভিদ শাকসবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্ধেকের বেশি প্রজাতির শাকসবজি বনে-জঙ্গলে আপনা-আপনি জন্মে, সেগুলো চাষ করা হয় না, তবে খাওয়া হয়। আমাদের দেশে এ পর্যন্ত ৯৮টি শাকসবজি তালিকাভুক্ত করা হয়েছে

যেগুলো এ দেশেই জন্মে। আমাদের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখতে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শাকসবজি খেতে হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন অন্তত ৩০০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া দরকার। কিন্তু এদেশে যে পরিমাণ শাকসবজি উৎপন্ন হয় তাতে আমাদের চাহিদার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ পূরণ হয়। সীমিত জমিতে আমাদের চাহিদা পূরণ করতে হলে সঠিক চাষ পরিকল্পনা ও চাষাবাদের আধুনিক নিয়ম বা প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শাকসবজির উৎপাদন বাড়ানোর বিকল্প নেই।

শাকসবজি এক ধরনের ফসল যা সাধারণত একবর্ষজীবী গুল্মজাতীয় গাছ, যা কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া হয়। যেসব ফসলের আমরা পাতা খাই, সেগুলোকে বলে 'শাক', যেমন- পুঁইশাক, লালশাক, গিমাকলমি ইত্যাদি। আর যেসব ফসলের অন্যান্য অংশ (ফল, ফুল, বীজ) খাই সেটা হলো 'সবজি', যেমন- ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদি। এই দুইয়ে মিলে হলো, 'শাকসবজি'। যেসব সবজি আমরা রান্না না করে কাঁচা খাই, সেগুলোকে বলে 'সালাদ' ফসল। শাকসবজি গুল্ম, বিরুৎ অথবা বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের অংশও হতে পারে।

কৃষি বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে উদ্যানতত্ত্ব যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Horticulture.

উদ্যানতত্ত্ব হচ্ছে কৃষি বিজ্ঞানের সেই শাখা যেখানে উদ্যান বা বাগানে বিশেষ যত্ন সহকারে চাষকৃত উদ্ভিদের সাথে সম্পর্কিত যেগুলো মানবজাতি কর্তৃক খাদ্য ও ঔষধ হিসেবে এবং মনোরঞ্জনের জন্য সরাসরি ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী এগুলো ফল, সবজি, মসলা, ফুল ও ভেষজ উদ্ভিদ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

সবজিবিজ্ঞান (Olericulture): উদ্যানতত্ত্বের যে শাখায় শাক-সবজির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, গঠন, বংশবিস্তার, আবহাওয়া ও মাটির প্রভাব, চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে সবজি বিজ্ঞান বলা হয়। দুটি গ্রীক শব্দ Oleris অর্থ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ এবং culture অর্থ চাষাবাদ মিলে **Olericulture** শব্দটি এসেছে।

ব্যবহারের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন শ্রেণির শাকসবজিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১) ভক্ষণীয় অংশভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

ক) পাতা জাতীয় শাকসবজি: লালশাক, পালংশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক, বাঁধাকপি, পুদিনা পাতা, লেটুস, কচু শাক, হেলেঞ্চা ইত্যাদি।

খ) কান্ডজাতীয় সবজি: ডাটা, ওলকপি।

গ) ফুল জাতীয়: ব্রোকলি, ফুলকপি, বকফুল।

ঘ) ফলজাতীয়: বেগুন, টমেটো, মরিচ, ঢেঁড়শ, পেঁপে, লাউ।

ঙ) মূলজাতীয়: মিষ্টি আলু, গাজর।

চ) বীজ জাতীয়: মটরশুটি, শিম।

২) মৌসুম ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ-

ক) রবি মৌসুম/শীতকালীন শাকসবজি

- টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি, শালগম, লেটুস, চায়না কপি, মূলা, পালংশাক, গাজর, শিম, আলু, লাউ ইত্যাদি।

খ) খরিপ মৌসুম/গ্রীষ্মকালীন শাকসবজি

- ডাঁটা, পুঁইশাক, কুমড়া পরিবারের সবজি, বরবটি, পানি কচু, মুখীকচু, কলমিশাক ইত্যাদি।

গ) উভয় মৌসুম/বারমাসি শাকসবজি

- লালশাক, বেগুন, ঢেঁড়শ, শসা, মরিচ ইত্যাদি।

৩। জীবনকাল ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

বীজ বপনের পর হতে নতুন বীজ পাওয়া পর্যন্ত সময়ের উপর ভিত্তি করে সবজির শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন-

ক) একবর্ষজীবী সবজি: সোলানেসি, কিউকারবিটেসি পরিবারের সবজিগুলোর ১ বছরের মধ্যে জীবন চক্র সম্পন্ন হয়। যেমন- ফুলকপি, ব্রোকলির কিছু কিছু জাত, টমেটো, বেগুন, মরিচ, মটরশুটি, শিম, ঢেড়স, মিষ্টিকুমড়া এদের মধ্যে অন্যতম।

খ) দ্বিবর্ষজীবী সবজি: এসব সবজির জীবন চক্র ২ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন- বাঁধাকপি, গাজর ইত্যাদি। এমন কিছু সবজি আছে যেগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় হিমাবেশন না পেলে ফুল ধারণ করতে পারে না। শীতপ্রধান অঞ্চলে এদের বীজ উৎপাদন করতে হলে দুটি মৌসুম লাগে। প্রথম গ্রীষ্মে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি, তারপর শীতে হিমাবেশন এবং দ্বিতীয় গ্রীষ্মে ফুল ও বীজ উৎপাদিত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এসব উদ্ভিদের অধিকাংশ জাত বীজ ধারণ করতে পারে না। ঐসব দেশে বছরে একটি মাত্র সবজি উৎপাদন মৌসুম আছে এবং তা হলো গ্রীষ্মকাল। এজন্য এ জাতীয় সবজিকে দ্বিবর্ষজীবী বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এদের জীবনচক্র সম্পন্ন করতে একটানা দুবছর লাগে না।

গ) বহুবর্ষজীবী সবজি: এসব সবজির ২ মৌসুমের অধিক ভূ-উপরস্থ অংশ থেকে ফলন পাওয়া যায়। কারণ শীতের শেষে ভূ-নিম্নস্থ অংশ থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। যেমন- শতমূলী (Asparagus), পেঁয়াজ, লীক, সজিনা ইত্যাদি।

৪। কান্ডের প্রকৃতি ও বিস্তৃতিভিত্তিক

ক) বীরুৎ জাতীয় সবজি: এ শ্রেণির কান্ড রসাল এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আংশিক কাষ্ঠল হয়। যেমন- আলু, চালকুমড়া।

খ) গুল্ম জাতীয় সবজি: এ ধরনের সবজি কাষ্ঠল প্রকৃতির, কিন্তু সুস্পষ্ট একক কান্ডহীন। গোড়া থেকে অধিক শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ঝোপে পরিণত হয়। যেমন- শতমূলী (Asparagus), বেগুন।

গ) বৃক্ষ জাতীয় সবজি: একক কান্ড বিশিষ্ট বৃহৎ কাষ্ঠল উদ্ভিদ। যেমন- সজিনা, বকফুল।

৫। উদ্ভিদতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ

ক) একবীজপত্রী সবজি: যেমন- মানকচু, পানিকচু, মুখিকচু, মৌলভি কচু, মেটে আলু, গাছ আলু, পেঁয়াজ, রসুন, অ্যাসপ্যারাগাস ইত্যাদি।

খ) দ্বিবীজপত্রী সবজি: লালশাক, ডাঁটা, পুঁইশাক, পালংশাক, বীট, লেটুস, কলমিশাক, মিষ্টিআলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, লাউ, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, ঢেঁড়শ, বেগুন, মরিচ, গাজর, আলু ইত্যাদি।

২.১.২ শাকসবজি চাষের গুরুত্ব

দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখতে নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। শারীরিক সুস্থতার জন্য অন্যান্য খাদ্যের পাশাপাশি শাকসবজি খাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ শাকসবজিতে খাদ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে। শাকসবজির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করে সহজেই ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের চাহিদা পূরণ করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুস্থ সবল জনসম্পদ সৃষ্টি করার পাশাপাশি দানাদার খাদ্যের উপরে চাপ কমানো যায়। বাংলাদেশে আলুসহ প্রায় ১৫৬ প্রজাতির শাক-সবজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রায় সারা বছরই ২০-২৫ জাতের সবজি উৎপাদিত হয়। রবি বা শীত মৌসুমে অধিকাংশ সবজি চাষের অনুকূলে হওয়ায় মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০% সবজি এ মৌসুমে হয়। বাংলাদেশের খাদ্য তালিকায় বড় অংশ দখল করে আছে দানাজাতীয় খাদ্য (চাল, গম, ভুট্টা)। যেমন- মাথাপিছু দৈনিক গড়ে যেখানে দানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমান ৪৫৪-৫২৮ গ্রাম, সেখানে শাক-সবজিসহ মূল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমান ১৬৬ গ্রাম, যা উদ্ভিদ খাদ্যের মাত্র ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে আলু ও মূলজাতীয় সবজি বাদ দিলে শাকসবজির পরিমান দাঁড়ায় মাত্র ৩০-৩৫ গ্রামের মতো, অথচ প্রয়োজন প্রায় ৩০০ গ্রাম। যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত সেই কৃষি পেশারই প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়াও অন্যান্য পেশাসহ প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার শিকার। আমাদের দেশে প্রায় দেড় কোটি বসতবাড়ির আওতায় প্রায় ৫ ভাগ জমি রয়েছে। বসতবাড়ির আঙ্গিনার এসব জমি সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাড়তি আয় করা ও শাকসবজির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এর তথ্যমতে, বিগত ১২ বছরে সবজি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৭ গুন। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার তথ্য মতে, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে তৃতীয়, চীন ১ম ও ভারত ২য় অবস্থানে রয়েছে। কৃষি হচ্ছে আমাদের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক খাত, এ খাত থেকে জিডিপির ১৩.২৯ শতাংশ আসে।

শাকসবজি চাষের গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

ক) দেহের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের যোগান নিশ্চিত করা যায়।

খ) অর্থনৈতিকভাবে সবজি চাষ করে মাঠ ফসলের তুলনায় বেশি লাভ করা যায়।

গ) খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা যায়।

ঘ) পতিত জমির সদ্ব্যবহার করা যায়।

ঙ) রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

চ) শাকসবজিভিত্তিক শিল্প (Agrobased Industry) সৃষ্টি করা যায়।

২.১.৩ শাকসবজি উৎপাদনে সমস্যাসমূহ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে, প্রতিদিন একজন সুস্থ সবল মানুষের ৩০০ গ্রাম সবজি গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু দেশে মাথাপিছু সবজি সরবরাহ নিশ্চিত করা যাচ্ছে মাত্র ৭০ ভাগ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই) এর সূত্র মতে, শীত ও গ্রীষ্ম কালীন এই দুই মৌসুমে দেশে সবজি চাষাবাদ হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪ লাখ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় ৪০ লাখ ৩০ হাজার মেট্রিক টন সবজি উৎপাদিত হয় (বিবিএস, ২০১৯)। দেশের মোট জমির শতকরা নয় দশমিক ৩৮ ভাগ জমি সবজি চাষে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। যা চাহিদা অনুযায়ী খুবই সীমিত। তাই চাষাবাদের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। বিশ্বে সবজি উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

আমাদের দেশে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ সবজি বিভিন্নভাবে অপচয় হয়ে থাকে। এছাড়া সবজির ব্যবহারও খুব সীমিত। ফলে সবজি গ্রহণে আমরা একেবারেই পিছিয়ে আছি। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ ব্যাপক সফলতা অর্জন করলেও গ্রহণের দিক থেকে একেবারেই নিচের সারিতে অবস্থান করছে। মাথাপিছু চাহিদা অনুযায়ী সবজি গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন ব্যবস্থা নানা কারণে সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। ত্রুটিপূর্ণ চাষাবাদ: ভাল ফলন ও উৎকৃষ্ট মানের পণ্য পাওয়ার জন্য কতকগুলো নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু আমাদের কৃষকরা অনেক সময় এগুলো জেনেও না জানার ভান করে থাকেন। অথবা উদ্যোগী ভূমিকা নেন না।

২। জলবায়ুর পরিবর্তন: সাধারণত নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি এ সময় ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করে বিধায় এই সময়ে শীতকালীন সবজি আবাদ হয়। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এ সময় থেকে আস্তে আস্তে বৃষ্টি বাদলা বাড়তে থাকে। যা অনেক সময় ফসলের ভীষণ ক্ষতি করে। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের অভাব, বর্ষাকালে অত্যাধিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে স্বল্প ঠান্ডা উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদনের জন্য প্রধান অন্তরায়।

৩। উপকরণের অপ্রতুলতা: বীজ, সার ও কীটনাশকের সঠিক সময়ে প্রাপ্যতা, উচ্চ মূল্য, গুণাগুণ ইত্যাদি সবজি চাষকে ব্যাহত করে।

৪। সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভাব: বাংলাদেশে কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, বিএডিসি ও ইনস্টিটিউটসমূহের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার অভাব আছে। এ জন্য কৃষকরা সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক হাতে পায় না। আর এর সুদুরপ্রসারী প্রভাব পড়ে কৃষি উন্নয়নে।

৫। আর্থ-সামাজিক সমস্যা: জমি কম বলে এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। সবজি ফসল উৎপাদনের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা অনুপস্থিত। ফলে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ হলেও উৎপাদন বাড়ছে না।অধিকাংশ সবজি পচনশীল, কিন্তু কার্যকর কোন হিমাগার ব্যবস্থা নেই।আবার বাজারজাতকরণও পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদি বিপণনের সমস্যাকে প্রকট করে রেখেছে। ফলশ্রুতিতে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পায় না। কৃষিজাত পণ্য চাহিদার তুলনায় উৎপাদন করা সম্ভব হয় না।

৬। অনিয়ন্ত্রিত উপায়ে বালাই দমন: সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন না করে অধিক হারে কীটনাশক ব্যবহার করে কৃষকরা পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করছে ঠিকই, কিন্তু পাশাপাশি পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ডেকে আনছে ভয়াবহ বিপদ। ফলে ফলন অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পাচ্ছে।

২.২ বীজ সংগ্রহ ও আদর্শ বীজতলা প্রস্তুত

২.২.১ বীজের সংজ্ঞা

ফুলের পরাগরেণু দ্বারা ডিম্বক নিষিক্ত হবার পর পরিপক্ক ডিম্বককে (ধান, গম, পেঁপে বীজ ইত্যাদি) অথবা গাছের যে অংশ (পটল, পেঁয়াজ, কচু, আলু) বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকেই বীজ বলে। যেমন-

চিত্র: বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ

বীজ প্রধানত: দু'প্রকার, যথা: ক) অংগজ বীজ ও খ) যৌন বীজ

ক) যৌন বীজ: পরিপক্ক ও নিষিক্ত ডিম্বককে যৌন বীজ বলে। যেমন: ধান, গম (স্বপরাগায়ন), পেঁপে বীজ (পরপরাগায়ন) ইত্যাদি।

খ) অংগজ বীজ: গাছের যে কোন অংশ বিশেষ যা একই রকম গাছের বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাকে বীজ বলে। যেমন: আখ গাছের কান্ড, আলুর টিউবার, মিষ্টি আলুর লতা, কলার সাকার, কুলের কুঁড়ি/চোখ, পাথরকুচির পাতা ইত্যাদি।

২.২.২ ভাল সবজি বীজের বৈশিষ্ট্য/গুণাগুণ

১। বাহ্যিক বিশুদ্ধতা: বীজে ধুলো-বালি, আবর্জনা, আগাছার বীজ, অন্য ফসলের ওজাতের বীজের উপস্থিতি দ্বারা বিশুদ্ধতা মাপা হয়। উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় সতর্কতামূলক ব্যবকস্থা গ্রহণ করে বীজের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা যায়।

২। রোগমুক্ততা: ফসলের অনেক রোগই বীজের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। এগুলোর অধিকাংশই ছত্রাকঘটিত রোগ এবং কিছু সংখ্যক ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা ও কৃমিজনিত। রোগের জীবাণু বীজের ত্বকের উপরে বা ভিতরে থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত বীজ থেকে ভাল, সুস্থ, সবল চারা আশা করা যায় না। তাই, বীজ রোগমুক্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩। সজীবতা (Viability) ও তেজ (Vigority): সজীবতা দ্বারা বীজের অংকুরোদগম যোগ্যতা এবং তেজ দ্বারা অংকুরণ ক্ষমতার মাত্রা বুঝানো হয়েছে। ভাল বীজের ক্ষেত্রে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ হতে হবে।

৪। কৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধতা: জাতের গুণাগুণ ফসলের বীজের মান নির্ণয়ের প্রধান মাপকাঠি। ভাল জাতের না হলে অন্যান্য গুণ থাকা সত্ত্বেও বীজ উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে না। যেসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা জাতের উৎকৃষ্টতা নির্ণয় করা হয় তার মধ্যে রয়েছে ফলনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, স্থানীয় জলবায়ুর সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা, পুষ্টিমান, প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্যতা ইত্যাদি।

ভাল বীজের উৎস

১। বিএডিসি-র বীজ বিক্রয় কেন্দ্র এবং ডিলারদের নিকট পাওয়া যাবে।

২। বিশ্বস্ত কোম্পানি/ডিলার ও প্রতিষ্ঠিত দোকানে পাওয়া যাবে।

ভাল বীজ ব্যবহারের উদ্দেশ্য

১। বেশি ফলন পাওয়ার জন্য।

২। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হবে।

৩। বীজ কম লাগবে, ফলে বীজ বাবদ খরচ কম হবে।

৪। ভাল বীজ ব্যয়বহুল নয়, বরং আয়ের উৎস।

বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা (Purity test): একটি বীজলট বা বীজের প্যাকেটে নির্দিষ্ট ফসলের শতকরা কতভাগ বীজ আছে সেটাই লটের বীজের বিশুদ্ধতা। পরীক্ষায় নমুনা বীজকে বিশুদ্ধ বীজ, অন্য ফসল বীজ, আগাছা বীজ এবং জড় পদার্থ এ চার ভাগে ভাগ করা হয়। পরে বিশুদ্ধ বীজ ওজন করে নমুনার ওজনের শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। বীজ বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় নির্দিষ্ট ফসলের বীজকে বিশুদ্ধ বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান বিভিন্নতা, যেমন- ভিন্ন রং, ভিন্ন আকার ইত্যাদি থাকলে তার পরিমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

বীজের বিশুদ্ধতার হার = (মোট বীজের পরিমাণ - অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিমাণ) / ১০০ x ১০০

(Purity Percentage)

বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা (Germination Test): সুস্থ সবল চারা উৎপাদনক্ষম বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হারকে অংকুরোদগম ক্ষমতা বলে। পেট্রিডিস বা মাটির পাত্র বা কলার খোল বা ভেজা চটে নির্দিষ্ট নিয়মে চারা গজিয়ে সুস্থ চারা গণনা করে এ হার নির্ণয় করা হয়।

চিত্র: মাটির পাত্রে বীজ গজানো পদ্ধতি

চিত্র: কলার খোলে বীজ গজানো পদ্ধতি

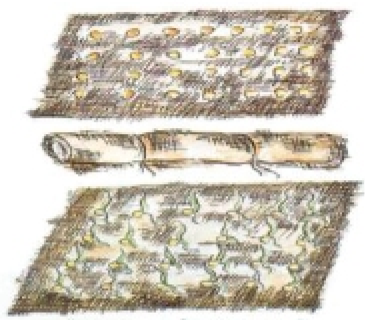

চিত্র: ভেজা চটে বীজ গজানো পদ্ধতি

চিত্র: বিভিন্ন উপায়ে অংকুরোদগম পরীক্ষা

অংকুরোদগমের শতকরা হার= (মোট গজানো বীজের সংখ্যা) / (গজানোর জন্য বসানো বীজের সংখ্যা) X ১০০

বীজের প্রকৃত মান= (বীজ বিশুদ্ধতা হার x বীজ অংকুরোদগম হার) / ১০০ %
(Seed standard)

একটি বীজ লটের বীজ বিশুদ্ধতা ৯৫% এবং অংকুরোদগম হার ৮৫% । ঐ বীজ লটের প্রকৃত মান নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে বের করা যায়-

$$\textbf{বীজের প্রকৃত মান}= \frac{৯৫ \times ৮৫}{১০০}\ \%$$

$$= \frac{৮০৭৫}{১০০} = ৮০.৭৫\%$$

বীজ হার: কোন নির্দিষ্ট একক পরিমান জমিতে সার্থকভাবে ফসল জন্মানোর জন্য যে পরিমান বীজ বপন করতে হয় তাকে বীজ হার বলে।
বীজ হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

$$\textbf{হে: প্রতি বীজ হার (Seed rate)} = \frac{\text{হেক্টর প্রতি কাংখিত গাছের সংখ্যা} \times \text{প্রতি বীজের গড় ওজন (গ্রাম)}}{\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার} \times \text{অংকুরোদগম হার} \times \text{জমিতে বপনের পর বীজের সম্ভাব্য অংকুরোদগমের হার}}$$

উপরোক্ত পদ্ধতিটি রোপণ পদ্ধতির বেলায় প্রযোজ্য। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে রোপণের বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে সবজির বীজ হার পাওয়া যাবে। আবার সারির বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে ছিটিয়ে বপনের বীজ হার পাওয়া যাবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝা যাবে। ধরা যাক, বেগুনের সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি। একটি বীজের জন্য প্রয়োজনীয় যায়গা ৭৫ X ২৫ বর্গ সে.মি. = ০.১৮৭৫ বর্গমিটার।

$$\text{সুতরাং, হেক্টরপ্রতি বীজের সংখ্যা} = \frac{১ \times ১০০০০}{০.১৮৭৫} = ৫৩৩৩৩.৩৩\text{টি}$$

হেক্টরপ্রতি বেগুনের কাংখিত গাছের সংখ্যা ৫৩৩৩৩.৩৩টি। এখন অন্যান্য মান বীজ হার নির্ণয়ের সূত্রে বসিয়ে কাংখিত ফল পাওয়া যাবে।

২.২.৩ বীজতলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

যে স্থানের মাটিকে বিশেষভাবে কর্ষণ করে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে সমতল করে এবং সার প্রয়োগ করে করে সুস্থ চারা তৈরির জন্য সুস্থ ভালো বীজ বপন করা হয় সেই স্থানকে বীজতলা বলে।

সবজি বীজতলার প্রকারভেদ: বীজতলা তৈরির ধরণ অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা ও

২। স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা।

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: পরিবেশ অনুকূলে না থাকলে স্থানান্তরযোগ্য বাঁশের তৈরি ঝুড়ি, মাটি, কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি বাক্স, পাত্র বা ট্রে অথবা পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদিতে মাটি ও সার প্রয়োজন অনুপাতে মিশিয়ে বীজতলা তৈরি করাকে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা বলে। নিচে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলার ছবি প্রদান করা হলো-

চিত্র: বিভিন্ন স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা

২। স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: সরাসরি ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বীজতলা তৈরি করা হয় তাকে স্থায়ী বা অস্থানান্তর যোগ্য বীজতলা বলে।

চিত্র: স্থায়ী বীজতলা

এর চারিদিকে অনেক সময় ইটের ১০ ইঞ্চি উচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেয়া যায়।

২.২.৩ বীজতলার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

বীজতলায় ভালো চারা উৎপন্ন করার জন্য বীজতলার জন্য সঠিক জায়গা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বীজতলার স্থান নির্বাচনে যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে সেগুলো হল:

১। খেয়াল রাখতে হবে বীজতলার জন্য নির্দিষ্ট জমি যেন খামার, অফিস বা বাসগৃহের কাছাকাছি হয় যাতে সঠিকভাবে দেখাশোনা করা যায়।

২। বৃষ্টির পানি জমে না এবং বন্যার পানি উঠে না এমন ধরনের উঁচু জমিতে বীজতলা করতে হবে।

৩। বাতাস চলাচল করে এবং রৌদ্রময় জায়গায় বীজতলা করতে হবে।

৪। প্রয়োজন মত চারায় সেচ দেয়ার সুবিধার্থে পুকুর পাড়ে অথবা পানির উৎসের কাছাকাছি জায়গায় ২০২৪

বীজতলা করতে হবে।

৫। উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটি বীজতলার জন্য উপযোগী। বেলেমাটি বেশি হলে কাদামাটি, গোবর বা কম্পোস্ট মিশিয়ে অথবা অতিরিক্ত কাদামাটি হলে বালু, কম্পোস্ট বা গোবর মিশিয়ে মাটির জল ধারণ ও নিষ্কাশনের উপযোগী করে বীজতলার মাটি উন্নত করতে হবে।

৬। বীজতলা রাস্তার পাশে হতে হবে যেন সহজে যাতায়াত করা যায়।

৭। কাদামাটিতে বীজতলা করা যাবে না কারণ কাদামাটিতে বাতাস সহজে চলাচল করতে পারে না এবং পানি সরে না।

২.২.৪ সবজির বীজ সংগ্রহ

ভাল চারা উৎপাদনের প্রথম শর্ত হলো ভাল বীজ। বীজ যত নিরাপদ ও উন্নত হবে চারা ততো ভালো মানের হবে এবং সবজির ফলনও বাড়বে। টেকসই ফসল উৎপাদনে গুণগত সবজির মানসম্পন্ন বীজ ও ভালো জাতের চারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু গুণগত মানসম্পন্ন বীজই কেবল শতকরা ২০-৩০ ভাগ উৎপাদন বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই বিশ্বস্ত ও প্রকৃত বীজ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাহিদা মাফিক সঠিক জাতের সবজি বীজ ক্রয় বা সংগ্রহ করতে হবে। জাত নির্বাচন ও বীজ ক্রয়ের ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী অথবা একজন আদর্শ কৃষকের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। প্যাকেটের গায়ে বীজের গুণগত মানের কতগুলো তথ্যাদিসহ ওই বীজের মেয়াদ উত্তির্ণের তারিখ স্পষ্ট করে লেখা আছে এমন বীজের প্যাকেট কিনতে হবে।

২.২.৫ বীজ শোধন

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা হলো বীজ শোধন। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। তাই বীজ শোধন প্রতিরোধ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার। বীজের বহিরাবরণে ও ভেতরেও রোগ জীবাণু থাকে, যা বীজের গজানোতে বাঁধা সৃষ্টি করে। তাই বীজ শোধন করে নিলে তাড়াতাড়ি বীজ গজায় এবং ফসলের ফলনও বেশি হয়। বীজতলায় বপনের পূর্বে সবজি বীজ কয়েকটি পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। যেমন- এগুলোর মধ্যে গুঁড়া রাসায়নিক ওষুধ দ্বারা বীজ শোধন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ও কম ঝামেলাপূর্ণ। বীজ রোপণের প্রায় ১ মাস পূর্বে রাসায়নিক পদ্ধতি বীজ শোধন করে রাখলে বীজ বেশি ভাল থাকে। পালংশাক, কপিজাতীয় সবজি, ঢেঁড়শ, মরিচ ইত্যাদি প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স এবং কুমড়াজাতীয় সবজি, গাজর, লেটুস ইত্যাদি সবজির প্রতি কেজি বীজে ১.৫ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স ও মুলা, শালগম, বীট এ ২.০ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা প্রোভেক্স ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা যায়। বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির অ্যানথ্রাকনোজ, পাতায় দাগ, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়। বীজ শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষাক্ত বিধায় শোধিত বীজ, শোধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

২০১৪

২.২.৬ আদর্শ বীজতলা প্রস্তুতকরণ

একটি উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে বীজ বপনের কয়েক দিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সেন্টিমিটার গভীর করে লাঙ্গল বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নিতে হবে। এরপর মুগুর দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা ও ঢেলা মুক্ত করে তৈরি করতে হবে। সব আগাছা ফেলতে হবে। মাটি, বালু, ১০০ গ্রাম চুন ও পচা গোবর-সার বা কম্পোস্ট ভালোভাবে মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেওয়াই ভালো। উর্বরতা কম হলে প্রতি ১০০ গ্রাম টিএসপি সার মেশাতে হবে বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদনের জন্য ইট-সিমেন্ট দিয়ে স্থায়ী বীজতলা তৈরিই শ্রেয়।

চিত্র: আদর্শ বীজতলা প্রস্তুতের কার্যক্রম

বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। বীজতলা সাধারণত ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে তৈরি করতে হবে। জমির অবস্থাভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে বড় জমিকে ভাগ করে এভাবে একাধিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখতে হবে এবং চারপাশে ২৫ সেমি খালি জায়গা রাখতে হবে। খালি জায়গার মাটি ৫ সেমি গভীর করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বীজতলার উপর উঠিয়ে দিতে হবে। ।

২.২.৭ বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ

মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য বীজতলাকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ বা শোধন বলে। বীজ বপনের আগে বীজতলার মাটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। এতে অনেক মাটিবাহিত রোগ, পোকামাকড় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়।

নিম্নে বীজতলা শোধন পদ্ধতি গুলোর বিবরণ দেয়া হলো

ক) তাপ প্রয়োগ

চারটি পদ্ধতিতে তাপ প্রয়োগ করে বীজতলার জীবাণুমুক্ত করা যায়।

১। লোহার কড়াই বা ড্রামের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করণঃ বীজতলার উপরের স্তরের ১০-১৫ সেমি গভীর করে মাটি তুলে চুলার উপর লোহার কড়াই বা ড্রামে নিয়ে ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় তাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে ১ ঘন্টা সময় আগুনের তাপে মাটিকে ভেজে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

১০১৪

২। সরাসরি তাপের মাধ্যমে জীবাণুমুক্তকরণ: বীজতলার উপরে ভাল ভাবে খড় বিছিয়ে দিয়ে তারপর ঐ খড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। ঐ আগুনের তাপে বীজতলার উপরের ৫ সেমি মাটি জীবাণুমুক্ত হবে। এ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করার পর খড় পোড়া ছাই মাটির সাথে এমন ভাবে মেশাতে হবে যেন বীজতলার মাটির ২-৩ সেমি গভীরতার নিচে না যায়। প্রতিবারই বীজ বপনের পূর্বে এভাবে মাটি শোধন করে নিতে হবে। তাপের মাধ্যমে বীজতলা জীবাণুমুক্ত করতে গেলে মাটিতে রক্ষিত নাইট্রোজেন সার বাতাসে উড়ে যায় ফলে মাটিতে নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দেয়।

৩। বাষ্পের মাধ্যমে জীবানুমুক্তকরণ: এই পদ্ধতিতে বীজতলার উপরিভাগের ১০ সে.মি. মাটির মিশ্রণের ভিতর গরম পানির ভাপ ৭০ ডিগ্রী সে: গ্রে: তাপমাত্রায় আধাঘন্টা রাখা হলে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু উপকারী জীবাণুর তেমন ক্ষতি হবে না। এই পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিতে খরচ অনেক বেশী, তাই আমাদের দেশের জন্য তেমন কার্যকর নয়।

৪। সৌর তাপের মাধ্যমে জীবানুকুক্তকরণ: সবচাইতে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতি হলো সৌরতাপ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করা। এক্ষেত্রে বীজ বপনের ১২-১৫ দিন পূর্বে বীজতলার মাটি যথাযথভাবে তৈরি করে ভালোভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরে পলিথিন দিয়ে বায়ু নিরোধক করে ঢেকে রাখতে হবে। এতে সারা দিনের সূর্যালোকে পলিথিনের ভেতরে বীজতলার মাটির তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে ও অনেকাংশে মাটিবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করবে। এছাড়াও অনেক ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও আগাছা দমন হয়। এছাড়া তাপবৃদ্ধির ফলে বিষাক্ত এমোনিয়া গ্যাস নির্গত হবে। তাই এ পদ্ধতিতে জীবানুমুক্ত করার সাথে সাথে বীজতলায় বীজ বপন করা যাবে না। এই বিষাক্ত গ্যাস কোদাল দিয়ে কোপালে ধীরে ধীরে বের হয়ে যাবে। তারপর বীজ তলায় বীজ বপন করা যাবে।

খ) রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ

বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সবজি চারা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বীজতলায় রাসায়নিক দ্রব্য যেমন ফরমালডিহাইড পানিতে মিশিয়ে (৫০: ১) ব্যবহার করা হয়। বীজতলা জীবানুমুক্ত করার জন্য প্রতি ১ লিটার বাণিজ্যিক ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ লিটার পানি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরী করতে হবে। এই মিশ্রন প্রতি ১ বর্গ মিটার বীজতলার জন্য প্রায় ১২ লিটার হারে বীজতলার উপর ছিটাতে হবে। তারপর বীজতলা ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ ২ দিন ত্রিপল বা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে- যাতে ফরমালিনের বাস্প বা গ্যাস সংরক্ষণ করা যায়। এরপর ত্রিপল বা পলিথিন সরিয়ে দিয়ে বীজতলা ১০-১৫ দিন উম্মুক্ত রাখতে হবে। এসময় কোদাল দিয়ে বীজতলা ভালোভাবে কোপায়ে ফরমালিনের গ্যাস বের করে দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ ফরমালিণের গন্ধ থাকবে ততক্ষণ ঐ বীজতলায় বীজ বপন করা ঠিক হবে না। এই পদ্ধতিতে বীজতলার মাটিতে বসবাসরত সব ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং কিছু কিছু আগাছা বীজও ধ্বংস হয়ে যাবে।

পোলট্রি রিফিউজ বা লিটার ব্যবহার করেও বীজতলায় মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আংশিকভাবে বীজতলার মাটি শোধনের প্রক্রিয়া বর্তমানে দেশের অনেক সবজি উৎপাদন এলাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৩ বীজতলায় বীজ বপন ও চারা ব্যবস্থাপনা

২.৩.১ বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলার উপরের স্তর ভালভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। এতে মাটির ভিতরে সহজেই বাতাস ও পানি চলাচল করতে পারবে। চারাগুলোর শিকড় সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে খাদ্য ও রস গ্রহণ করতে পারবে। এরপর বীজতলার উপরের স্তর সমান করে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের সময় সমস্ত বীজতলা জুড়ে সমানভাবে বীজ ছিটিয়ে বা লাইন করে বীজ বপন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বীজতলার কোথাও যেন বেশী বীজ এবং কোথাও কম বীজ না পড়ে। তবে ছিটিয়ে বীজ বপনের চেয়ে লাইনে বীজ বপন করা উত্তম, কারণ উৎপন্ন চারাগুলো ঠিকমত আলো বাতাস পায়, খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা কম হয়, সুস্থ সবল ও মান সম্পন্ন চারা উৎপন্ন হয়।

সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। শুকনা মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেওয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেওয়া মাটির জো অবস্থা এলে বীজ বপন করতে হয়। কোন কোন সবজির বীজ কিছু সময় ভিজিয়ে রাখার পর বপন করা হয়। যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণত বোনার আগে পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাত ভিজিয়ে বপন করতে হয় (যেমন লাউ, চিচিঙ্গা, মিষ্টি কুমড়া, করলা, উচ্ছে ও ঝিঙা)। এতে বীজে অংকুরোদগম ভাল হয়। তবে কপি জাতীয় সবজি ও টমেটোর বীজ বপনের পূর্বে ভিজানোর প্রয়োজন পড়ে না।

২.৩.২ বীজতলার পরিচর্যা

বীজতলায় বীজ বপনের ২ দিন পর থেকে বীজ কি পরিমাণ গজালো তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজ গজানো শুরু হলে সাথে সাথে বীজতলা ঢেকে রাখা চাটাই তুলে ফেলতে হবে। গজানো চারা অতিরিক্ত রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী ঝাপ ব্যবহার করতে হবে। চাটাই অথবা ঝাপ বা আচ্ছাদন এমন ভাবে খুটির উপরে দিতে হবে যেন বীজতলা থেকে ১.৫ ফুট বা ৪৫ সে:মি: উপরে থাকে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগের চারা ঢেকে রাখতে হবে এবং সকাল বিকাল চাটাই অথবা ঝাপ সরিয়ে দিয়ে চারাগুলোতে রোদ বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারাগুলো যতই আকারে বাড়বে ততই তাদের রোদের তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন বোধে সকাল বিকাল ঝাঝারি দিয়ে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স ১০/১২ দিন হলে কাঠ অথবা ক্ষুদ্রাকার নিড়ানী বা বাঁশের কাঠি দিয়ে বীজতলার মাটি হালকাভাবে আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে। এই ভাবে প্রতি ২/৩ দিন অন্তর অন্তর মাটি আলগা করতে হবে। কপির বীজ গজানোর ১৪/১৫ দিন পর অথবা চারাগুলো চার পাতা বিশিষ্ট হলে অন্য একটি আলাদা বীজতলায় রোপণ করলে শিকড় অধিকতর শক্তিশালী হয় ও উৎপাদন ভালো হয়। চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে, প্রতি লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম ইউরিয়া সার গুলে চারার উপর স্প্রে করলে চারা গুলো আরোও সতেজ হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বেশী ইউরিয়া সার দেয়া ঠিক হবে না।

২০২৪

চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে কুমড়াজাতীয় ফসলে রেড পাম্পকিন বিটল ও বিভিন্ন সবজির ভাইরাসের বাহক পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়। বীজতলার মাটি যদি ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে তবে মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুগুলো সক্রিয় হয়ে পড়ে এতে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগের ভিতর গোড়া পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এই রোগের কারণে অনেক সময় চারা উৎপাদন কষ্টকর হয়। এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বীজতলা শুকনা রাখা, কুপ্রাভিট অথবা ডাইথেন এম-৪৫ ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সেচের পানির সাথে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২.৩.৩ চারার কষ্টসহিঞ্চুতা বৃদ্ধি

বীজতলায় চারা বৃদ্ধিকালীন সময়ে এদের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্থ করে চারার কষ্টসহিঞ্চুতা বৃদ্ধি করা যায়। বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমান কমিয়ে বা দুই সেচের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্টসহিঞ্চু করে তোলা হয়। সাধারণত ৭-১০ দিন এ প্রক্রিয়া চালানো হয়। বেশি দেরি হলে ফলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ প্রক্রিয়ায় চারায় অধিক শর্করা জমা হয় যা চারাকে বিভিন্ন ধকল থেকে বাঁচায়।

২.৪ চারা উত্তোলন ও স্থানান্তর

২.৪.১ চারা উত্তোলন

চারা তোলার সময়

চারা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বীজতলায় রাখা যাবে না। বীজ বপনের ২৫-৪৫ দিনের মধ্যে অধিকাংশ চারা রোপণের উপযোগী হয়। বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক হলে বীজ বপনের কতদিন পরে বিভিন্ন প্রকার সবজির চারা রোপনের উপযোগী হয় তা নিচের তালিকা এ দেখানো হলো। তবে চারা তোলার ৫-৭ দিন আগে থেকে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে। এতে গাছে শর্করার পরিমাণ বেশী হবে ও চারা তোলাজনিত আঘাত সহ্য করতে পারবে।

বিভিন্ন চারার উত্তোলনকালীন উপযুক্ত বয়স নিচের তালিকায় দেখানো হলোঃ

চারার নাম	রোপণের সময়কাল	চারার নাম	রোপণের সময়কাল
ফুলকপি	২৫-৩০ দিন	টমেটো	৩০-৩৫ দিন
বাধাকপি	২৫-৩০ দিন	বেগুন	৪০-৫০ দিন
ওলকপি	২৫-৩০ দিন	মরিচ	৪০-৫০ দিন
শালগম	২৫-৩০ দিন	পেঁয়াজ	৪৫-৫০ দিন
লেটুস	২৫-৩০ দিন	পুঁইশাক	২৫-৩০ দিন
বিট	২৫-৩০ দিন	লাউ	১৫-১৬ দিন
চায়নাকপি	২৫-৩০ দিন	মিষ্টিকুমড়া	১৫-১৬ দিন

চারা উত্তোলন পদ্ধতি

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর সময় একবার হালকা সেচ দিয়ে চারা উঠানো উচিত, এতে চারার শিকড় কম

ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে। চারার গোড়ায় মাটি থাকলে শিকড় কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটি চোখা বাঁশের কঞ্চি বা সরু কাঠির লাঠি বা প্লাস্টিকের চামচ চারার পাশ দিয়ে মাটিতে ঢুকিয়ে আড়াআড়িভাবে চাপ দিলে চারা সহজেই মাটিসহ উঠে আসবে।

চিত্র: টমেটোর চারা উত্তোলন

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর পর যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মূল জমিতে লাগানো উচিত।

২.৪.২ চারা স্থানান্তর

চারা সংরক্ষণ ও পরিবহণ

চারা উঠানোর পর পরই রোপন করা উচিত, এতে করে চারার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তবে অনেক সময় চারা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। তখন ঠান্ডা অন্ধকারযুক্ত স্থানে চারা ২৪ ঘন্টা থেকে ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সেক্ষেত্রে চারার পাতায় প্রয়োজনমত পানি ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। উৎপাদিত চারা দূর দূরান্তে নেওয়ার পূর্বে ও চারা তোলার পূর্বে ভালো ভাবে সেচ দিতে হবে যাতে পরিবহনের সময় চারার শরীরে পানির অভাব দেখা না দেয়।

চারা বিক্রয়

চারা রোপনের উপযুক্ত হলে বিক্রয় করতে হবে। চারা বিক্রির জন্য তোলার সময় চারা তোলার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিক্রিত চারা কলাপাতা, কচুপাতা অথবা পলিথিন কাগজ দিয়ে গোড়া বেঁধে পাতার উপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দিয়ে ক্রেতার হাতে দিতে হবে। উৎকৃষ্ট চারাতে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে-

ক) চারা স্বাভাবিক আকারের অর্থাৎ আকারে অত্যাধিক বড়ও নয়, ছোটও নয়

খ) অনধিক ৬টি পাতাযুক্ত

গ) রোগের সব লক্ষণ থেকে মুক্ত

ঘ) শিকড় অক্ষত এবং মাটির দলায় জড়ানো

ঙ) পুরু কান্ড ও সতেজ চেহারা এবং

চ) স্বাভাবিক সবুজ পাতা। অত্যাধিক গাঢ় সবুজ বর্ণের চারায় নাইট্রোজেনের অধিক্যই নির্দেশিত হয়, তাই এস চারা দুর্বল।

২০২৪

২.৫ সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তার

কিছু সবজির বংশবিস্তারে অযৌন প্রক্রিয়াই মুখ্য। এর কারণ এসব সবজির বীজ উৎপাদন কষ্টকর। অধিকাংশ সময় এসব অঙ্গজ অঙ্গ সংগ্রহ করা যায় সহজেই এবং অল্প পরিশ্রমে।

২.৫.১ অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা

সবজিতে অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। অল্প খরচে, অধিক ফসলের জন্য অঙ্গজ পদ্ধতি অনুসরণ করা হতে পারে। অনেক সময় বীজ দিয়ে অধিক ফলন আশা করা যায় না। আবার বীজের অধিক ব্যবহার এড়িয়ে খরচ কমানো সম্ভব। যেমন- কলমিশাক প্রথমবার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে। পরবর্তীতে শাখাকলমের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা হয়।

অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণ সংগ্রহ করতে উন্নত কৌশল, প্রযুক্তি ও যন্ত্র প্রয়োজন-যা সব সময় ব্যবস্থাপনা করা যায় না। যেমন- আলু সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সাইজের আলু গ্রেডিং করে তা হিমাগারজাত করে রাখতে হবে। তা না হলে ভালো টিউবারের অভাবে ফলন বাধাগ্রস্থ হতে পারে। আবার টিউবারের কর্তিত অংশ জীবাণুমুক্ত করে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেয়।

২.৫.২ সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারে ব্যবহৃত বিভিন্ন অঙ্গ বা উপকরণ

সবজির অযৌন বা অঙ্গজ বংশবিস্তারে নিম্নলিখিত অঙ্গ বা উপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১। শাখাকলম (Stem cutting)
২। শল্ককন্দ (Bulb)
৩। গুঁড়িকন্দ (Corm)
৪। রাইজোম (Rhizomes)
৫। কন্দ (Tuber)
৬। টিউবারকল বা বুলবিল (Tubercle)
৭। গুঁড়িচারা (Sucker)
৮। কন্দমূল (Tuberous root)

১। শাখাকলম (Stem cutting)

কান্ডের টুকরা অংশ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপাদন করাকে শাখাকলম বলে। উদাহরণস্বরূপ মিষ্টি আলু, পুঁইশাক, কলমিশাক, পটল ইত্যাদি বংশবিস্তারে ব্যবহৃত কান্ডের টুকরা অংশ কমপক্ষে ২-৩ টি গিঁট বা আইকসহ সে.মি. লম্বা হতে হবে। কান্ডটির দুই-তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে বাকি অংশ মাটির উপরে রেখে উত্তর -পূর্ব দিকে মুখ করে ৪৫' কোণে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

২। শল্ককন্দ (Bulb) এটি একটি বিশেষ ধরনের রূপান্তরিত কান্ড যা খাটো প্রকৃতির এবং গোলাকার চাকতির মত। এটি ভূনিম্নস্থ যা রসালো শল্কপত্র দ্বারা আবৃত থাকে। শল্কপত্র হল পাতার রূপান্তরিত নিম্নাংশ। শল্ককন্দে একটি শীর্ষমুকুল থাকে, যা থেকে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। শল্ককন্দ ও কোয়া ব্যবহার করে পেঁয়াজ ও রসুনের বংশবিস্তার করা হয়।

চিত্র: রসুন ও পেঁয়াজের শল্ককন্দ

৩। গুঁড়িকন্দ (Corm) এটি একটি ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড। কাণ্ডের অক্ষের নিম্নাংশ নিরেট ও মাংসল অঙ্গে পরিণত হলে তাকে বলা হয় গুঁড়িকন্দ। এর গায়ে সমান্তরাল রেখার আকারে পত্রদাগ (Leaf scar) থাকে। গুঁড়িকন্দের আইক থেকে যেসব ক্ষুদ্রাকার শাখা বের হয় সেগুলো মুখী বা গুঁড়িকন্দ (Cormel) নামে পরিচিত। কচু জাতীয় সবজিগুলোতে বংশবিস্তার করতে গুঁড়িকন্দ ও মুখী ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

চিত্র: কচুর গুঁড়িকন্দ

৪। রাইজোম (Rhizomes) রাইজোম এক ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড, যা মাটিসংলগ্ন বা মাটির ভেতরে পাশের দিকে বিস্তার লাভ করে। আদা, হলুদ ইত্যাদি বংশবিস্তার রাইজোমের মাধ্যমে করে থাকে।

চিত্র: আদার রাইজোম

৫। কন্দ (Tuber) কন্দ একটি ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড। কাণ্ডের ভূ-নিম্নস্থ শাখার নিম্নভাগ থেকে সূত্রবৎ অকারের অঙ্গ সৃষ্টি হয় যাকে স্টোলন বলে।এই স্টোলনের অগ্রভাগে খাদ্য সঞ্চিত হওয়ার দরুন স্ফীত হয়ে টিউবার উৎপাদন করে। এর গায়ে অবস্থিত চোখসমূহ কাণ্ডের কাক্ষিক কুঁড়ির অবস্থান নির্দেশ করে। সাধারণত চোখের নিচে শল্কপত্র থাকে। টিউবার দিয়ে আলুর বংশবিস্তার করা যায়।

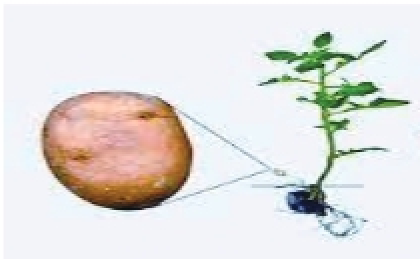

চিত্র: আলুর কন্দ

৬। টিউবারকল বা বুলবিল (Tubercle) কাণ্ডের ভূ-উপরস্থ কক্ষের কুঁড়ি অনেক সময় স্বাভাবিক শাখায় পরিণত না হয়ে রূপান্তরিত হয়ে স্ফীত, গোলাকার, মাংসল অঙ্গ সৃষ্টি করে। এদেরকে টিউবারকল বা বুলবিল বলা হয়। মোটে আলু এর সাহায্যে বংশবিস্তার করে। উপযুক্ত পরিবেশে রসুনেরও এ ধরনের বুলবিল উৎপন্ন হয়।

চিত্র: আলুর টিউবারকল

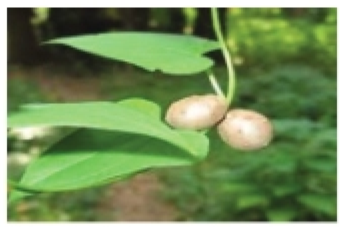

চিত্র: মেটে আলুর টিউবারকল

৭। গুঁড়িচারা (Sucker) উদ্ভিদের কাণ্ডের ভূসংলগ্ন অংশ বা মূল থেকে পার্শ্বমুকুল বের হয়। প্রথমাবস্থায় এগুলো মাতৃ উদ্ভিদ থেকে খাদ্যগ্রহণ করে। পরে নিজস্ব শিকড় ও পত্র পল্লব উৎপাদন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হয়। উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী এগুলো সাকার, রেটুন ইত্যাদি বলা হয়। গুঁড়িচারা কাণ্ডজ বা মূলজ হতে পারে। মানকচু গুঁড়িচারা উৎপাদন করে। বাঁধাকপি, ফুলকপির ফসল সংগ্রহের পর পরিত্যক্ত অংশ থেকে গুঁড়িচারা বের হয়, যা প্রজননে কাজে লাগে।

৮। কন্দমূল (Tuberous root) এটি একটি ভূ-নিম্নস্থ মূল। খাদ্য জমা হয়ে স্ফীত হয়ে উঠে। এদের গায়ে অস্থানিক মূল থাকে যা থেকে চারা বের হয়। মিষ্টি আলু, চারকোণী শিম, কাকরোল ইত্যাদির বংশবিস্তার কন্দমূল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চিত্র: মিষ্টি আলুর কন্দমুল

পাঠ সংক্ষেপ

- দ্বিবর্ষজীবী সবজি হলো বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি, শালগম, পেঁয়াজ, গাজর ইত্যাদি
- বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির অ্যানথ্রাকনোজ, পাতায় দাগ, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়
- চারা তৈরির জন্য বীজ বোনা হয় যে জমিতে তাকে বীজতলা বলে
- উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটি বীজতলার জন্য উপযোগী
- মাটিতে বিদ্যমান ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণ থেকে বাঁচতে বীজতলাকে জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতিকে বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ বলে
- কপি জাতীয় সবজি ও টমেটোর বীজ বপনের পূর্বে ভিজানোর প্রয়োজন পড়ে না
- চারা বের হওয়ার পর থেকে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত মশারির জাল দিয়ে চারাগুলো ঢেকে রাখলে কুমড়াজাতীয় ফসলে রেড পাম্পকিন বিটল ও বিভিন্ন সবজির ভাইরাসের বাহক পোকার আক্রমণ থেকে চারাগুলো বেঁচে যায়
- চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে, প্রতি লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম ইউরিয়া সার গুলে চারার উপর স্প্রে করলে চারা গুলো আরোও সতেজ হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বেশী ইউরিয়া সার দেয়া ঠিক হবে না
- বীজতলা থেকে চারা উঠানোর সময় একবার হালকা সেচ দিয়ে চারা উঠানো উচিত, এতে চারার শিকড় কম ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে
- শল্কপত্র হলো পাতার রুপান্তরিত নিম্নাংশ
- কন্দ একটি ভূ-নিম্নস্থ রুপান্তরিত কান্ড

২০২৪

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারের বিভিন্ন অঙ্গ বা উপকরণ ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছ। তুমি ছবি দেখে সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের নাম এবং উদাহরণ উল্লেখ কর।

ক্র/নং	অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের নাম	অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণের ছবি	উদাহরণ
১			
২		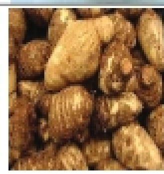	
৩		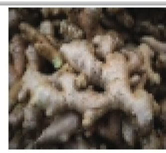	
৪		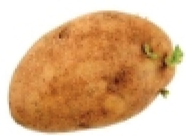	
৫			
৬		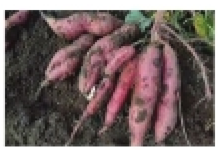	

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতোমধ্যে তুমি সবজির চারা কিভাবে উৎপাদন করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ । তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা কি ভাবে বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদন করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি বীজ সংগ্রহ কোথা থেকে করেছেন এবং বীজের মান বা বৈশিষ্ট্য, বীজতলা তৈরি, বীজ বপন ও পরিচর্যা সম্পর্কে তোমার সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে কি বলে?
২। বীজতলার জন্য কি ধরনের মাটি উপযোগী?
৩। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন?
৪। টমেটো, বেগুন কত ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে?
৫। বীজ শোধনে ব্যবহৃত দুইটি রাসায়নিক ঔষধের নাম লিখ।
৬। বীজতলার উর্বরতা কম হলে কি সার কি পরিমানে ব্যবহার করতে হবে?
৭। বীজতলার চারার বৃদ্ধি কম হলে কি করতে হবে?
৮। সবজির চারা উৎপাদনের জন্য একটি আদর্শ বীজতলার চিত্র অংকন করে তার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
৯। বীজতলার চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলায় কেন পানি দিতে হবে?
১০। সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারে কয় ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়?
১১। আলু, মেটে আলু কোন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করতে পারে?
১২। আদা ও হলুদের বংশবিস্তার কোন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞান কাকে বলে?
২। ভক্ষণীয় অংশভিত্তিক সবজির প্রকারভেদ লিখ।
৩। সবজি বীজের প্রকারভেদ বর্ণনা করো।
৪। ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
৫। ভালো বীজ সংগ্রহের উৎসগুলো লিখ।
৬। বীজতলা নির্বাচনে কি কি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে?
৭। স্থানান্তর ও অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা কাকে বলে?
৮। বংশবিস্তারকারী অঙ্গজ উপকরণগুলোর নাম লিখ।
৯। অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা-অসুবিধা লিখ। ২০২৪
১০। চারার কষ্টসহিঞ্চুতা পদ্ধতি বর্ণনা করো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাকসবজির গুরুত্ব আলোচনা করো।

২। শাকসবজি চাষের সমস্যা বর্ণনা করো।

৩। বীজতলা কাকে বলে? বীজতলার স্থান নির্বাচন সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৪। বীজতলা প্রস্তুতকরণ ও জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি আলোচনা করো।

৫। বীজতলায় বীজ বপন, চারার পরিচর্যা ও চারা উত্তোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করো।

৫। সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারকারী উপকরণগুলির বিস্তারিত বর্ণনা করো।

জব ২.১: সবজির বীজহার নির্ণয়ের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- সবজির বীজ হারের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- বীজ হার সম্পর্কিত সূত্রটি লিখতে পারবে।
- বীজের বিশুদ্ধতা, অংকুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করতে পারবে।
- বিভিন্ন সবজির বীজ হার নির্ণয় করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;

৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

২০২৪

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

কোন নির্দিষ্ট একক পরিমান জমিতে সার্থকভাবে ফসল জন্মানোর জন্য যে পরিমান বীজ বপন করতে হয় তাকে বীজ হার বলে।

বীজ হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

$$\textbf{হে: প্রতি বীজ হার (Seed rate)} = \frac{\text{হেক্টর প্রতি কাংখিত গাছের সংখ্যা } \mathbf{X} \text{ প্রতি বীজের গড় ওজন (গ্রাম)}}{\text{বীজের বিশুদ্ধতার হার } \mathbf{X} \text{ অংকুরোদম হার } \mathbf{X} \text{ জমিতে বপনের পর বীজের সম্ভাব্য অংকুরোদগমের হার}}$$

উপরোক্ত পদ্ধতিটি রোপণ পদ্ধতির বেলায় প্রযোজ্য। সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে রোপণের বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে সবজির বীজ হার পাওয়া যাবে। আবার সারির বীজ হারকে ১.৫-২ দ্বারা গুণ করলে ছিটিয়ে বপনের বীজ হার পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বিভিন্ন সবজি বীজ, ২। পেট্রিডিস, ৩। চোষ কাগজ বা ব্লটিং পেপার, ৪।অপসেট কাগজ, ৫। কলম, ৬। ক্যালকুলেটর।

কাজের ধারা

১) প্রতিটি সবজির ক্ষেত্রে সারি হতে সারি এবং গাছ থেকে গাছের সুপারিশকৃত চাষাবাদ দূরত্ব জেনে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বারি কৃষি প্রযুক্তি হাত বই অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এ সংক্রান্ত ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

২। সারি ও গাছের দূরত্ব গুণ করে মিটারে বের করতে হবে।

৩। ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গমিটারকে সারি ও গাছের দুরত্বে গুণফল দিয়ে ভাগ করে হেক্টরপ্রতি সম্ভাব্য গাছের সংখ্যা বের করে নিতে হবে।

৪। সবজির অনেকগুলো বীজের ওজন মেপে নিয়ে তাকে বীজের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে বীজের গড় ওজন বের করে নিতে হবে।

৫। ১০০ গ্রাম বীজে পুষ্ট ও বিশুদ্ধ বীজের পরিমান মেপে নিতে হবে।

৬। ১০০টি বীজ পেট্রিডিসে ভিজা চোষ কাগজে রাখতে হবে এবং কতটি বীজ অংকুরিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৭। অংকুরিত বীজের সংখ্যাটিকে উক্ত বীজের অংকুরোদগমের শতকরা হার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

৮। মাঠ পর্যায়ে আদর্শ হিসেবে বীজ অংকুরোদগমের হার ৮০% বলে গণ্য করতে হবে।

৯। প্রতিটি শতকরা হারকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে।

১০। এবার একটি অপসেট কাগজ নিয়ে তাতে বীজহারের সূত্রটি লিখে তাতে উপরোক্ত মানগুলো বসাতে হবে।

১১। ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সূত্রের তথ্যগুলো সরলীকরণ করতে হবে।

১২। এভাবে হেক্টরপ্রতি নির্ণীত বীজহার কেজিতে রূপান্তর করার জন্য একে ১০০০ দ্বারা ভাগ করতে হবে।
১৩। এবার ধারবাহিকভাবে কাজটি নিরীক্ষণ করে নিতে হবে এবং নির্ভুলভাবে খাতায় লিখতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সূত্রের মান বসানোর সময় নির্ভুলভাবে বসাতে হবে।
২। ক্যালকুলেটর বা গণনা যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে তথ্য দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সবজির বীজের হার নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.২: সবজির আধুনিক বীজতলা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- জমি নির্বাচন, বীজতলার মাটি প্রস্তুতকরণ ও জীবাণুমুক্ত করতে পারবে।
- বেড তৈরি, জৈব ও অজৈব সারের মাত্রা নির্ধারণ ও সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা
৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

সুস্থ, সবল ও নিরোগ চারা উৎপাদনের জন্য যে স্থান বা পাত্র ব্যবহার করা হয় ঐ স্থান বা পাত্রকে বীজতলা বলা হয়। বীজতলায় বীজ বপনের পর চারাকে সুনির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত রেখে যত্ন করতে হয়। তৈরির ধরন অনুযায়ী বীজতলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, ১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা ও ২। অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা।

১। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: প্লাস্টিকের পাত্র, বড় ট্রে, বাঁশের বড় বেড়া, ভাসমান বীজতলা ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি ও সার মিশিয়ে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা তৈরি করা যায়।সাধারণত বন্যা বা অতি বৃষ্টির হাত থেকে চারাকে রক্ষা করার জন্য এ ব্যবস্থ অনুরণ করা হয়।

২। অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা: সরাসরি ভূপৃষ্ঠের উপর যে বীজতলা তৈরি করা হয় তাকে স্থায়ী বা অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা বলা হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের বীজতলা বেশি ব্যবহার হয়।

সুনিষ্কাশিত, উঁচু, বন্যামুক্ত, আলো-বাতাসযুক্ত, নিরাপদ ও উর্বর হালকা দো-আঁশ মাটির জমি বেছে নিতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বীজতলা তৈরির উপযোগী জমি, ২। কোদাল বা লাঙ্গল, ৩। মই, ৪। নিড়ানী, ৫। আঁচড়া, ৬। খুটি, ৭। রশি, ৮। মেজারিং টেপ, ৯। জৈব ও রাসায়নিক সার, ১০। ওজন মাপার যন্ত্র, ১১। ঝুড়ি বা প্লস্টিকের বাটি, ১২। ঝাঁঝরি, ১৩। পলিথিন, ১৪। টুকরি, ১৫। খড়কুটা ১৬। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

১) আলো ও বায়ুচলাচলের সুবিধাযুক্ত সুনিষ্কাশিত উঁচু উর্বর দো-আঁশ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরির জন্য জমিকে গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, আগাছামুক্ত ও সমতল করতে হবে। বীজতলা সাধারণত ১০-১৫ সেমি উঁচু করে তৈরি করতে হবে।

৩। ভালভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারদিকে ২৫ সেমি চওড়া এবং ১৫ সেমি গভীর নালা তৈরি করতে হবে। বীজতলায় দাঁড়ানো পানি থাকলে চারা দুর্বল ও রোগাক্রান্ত (গোঁড়া পচা রোগ) হয়ে পড়ে।

৪। বীজতলার আশেপাশে ঝোপ-জংগল থাকলে পোকা ও রোগের আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য ঝোপ-জংগল, শিকড়-বাকড় পরিষ্কার করতে হবে।

৫। বীজতলা সাধারণত ৩ ফুট বা ১ মিটারের বেশি চওড়া না হওয়া সুবিধাজনক। চারা তৈরি করার জন্য সাধারণত ৩ X ১ মিটার আকারের কয়েকটি বীজতলা তৈরি করে নিতে হবে।

৬। দুটি বীজতলার বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি চওড়া এবং ১০ সেমি গভীর নালা করতে হবে।

৭। নালার মাটি কোদাল দিয়ে বেডের উপর তুলে দিতে হবে।

৮। প্রতিটি বীজতলার মাটিতে ১০-১৫ কেজি পাতা পঁচা সার বা গোবর সার ও ১০০ গ্রাম চুন দিতে হবে। ১৫০ গ্রাম টিএসপি ১০০ গ্রাম এমওপি বীজতলার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৯। বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ: বীজতলা জীবাণুমুক্ত না করলে চারার শিকড়ে গোড়া পঁচা ও বিভিন্ন ছত্রাক জাতীয় রোগ হয়। আবার অনেক সময় নেমাটোড বা কৃমির আক্রমণে শিকড়ে গিট হয়।

দুই পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করা যায়, যেমন- ১। তাপ প্রয়োগ এবং ২। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে।

তাপ প্রয়োগের সময় সাধারণত খড়কুটা বীজতলার উপরিভাগে রেখে জ্বেলে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। আর রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ পদ্ধতির বেলায় ১ ভাগ কমার্শিয়াল ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ গুণ পানি মিশিয়ে তা বীজতলার মাটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে।

আবার অনেক সময় স্বচ্ছ প্লাস্টিকের পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিলে সূর্যতাপে বীজতলার মাটি সারাদিনের সূর্যালোকে শোধিত হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে কৃষকরা জমি তৈরির সময় সানফুরান বা কার্বোফুরান জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করে থাকে।

১০। জীবাণুমুক্তকরণের পর মাটি কোদাল দিয়ে গভীরভাবে কুপিয়ে উপরের মাটি সমতল করে দিতে হবে।

১১। এভাবে বীজতলা বীজ বপনের জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

১২। বীজতলাকে অতিবৃষ্টি, প্রখরতাপ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপল বা পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে বীজতলায় সমানভাবে পড়ে।

২। সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৩। ফরমালডিহাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি আধুনিক বীজতলা তৈরি ও জীবাণুমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
শাকসবজি চাষ
(Cultivation of Vegetables)

আমাদের দেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ৭টি খাদ্যোপাদানের মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবন অন্যতম। শাকসবজি এর অন্যতম উৎস। কৃষি বিজ্ঞানের ভাষায় সবজিকে উদ্যান ফসল (Horticultural crops) বলা হয়ে থাকে। পুষ্টিমানের দিক থেকে সবজি ফসল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বাণিজ্যিকভাবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য সবজি চাষের আধুনিক কলাকৌশল বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ কৌশল জানা জরুরী। সবজি চাষাবাদ একটি শ্রমসাধ্য ব্যাপার। সবজি ফসল উৎপাদন অন্যান্য ফসলের মতো নয়। সবজি ফসল উৎপাদনের জন্য নিবিড় বা বিশেষ ধরনের যত্নের প্রয়োজন হয়। এর জন্য কিছু মৌলিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

এই অধ্যায় শেষে-

- সবজির বীজ শোধন, বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন করতে পারবে
- সবজি চাষের উপযোগী জমি ও মাটি নির্বাচন এবং জমি প্রস্তুত করতে পারবে
- সবজি চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের নাম, গুণাগুণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে
- সবজি ফসলে পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও ফসল পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- সঠিক উপায়ে সবজি সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা করতে পারবে

৩.১ জমি ও মাটি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

৩.১.১ জমি ও মাটি নির্বাচন

ফল জাতীয় সবজি (বেগুন, ঢেঁড়শ, মরিচ, বরবটি, শিম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, কাঁকরোল, পেঁপে ইত্যাদি) চাষের জন্য বেশি আলোর দরকার হয়। শাক ও মূলজাতীয় সবজি (ডাঁটা, পুঁইশাক, কলমিশাক, লেটুস, বিট, মূলা, শালগম) কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি

ছায়াতেও ভালোভাবে জন্মাতে পারে। সবজি চাষের জমি পানি সেচ ও নিকাশের সুবিধাযুক্ত, রৌদ্রময়, উঁচু ও বসতবাড়ির কাছে হলে ভাল হয়। এক্ষেত্রে জমির মাটি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু থাকা ভাল। সবজির বাজারজাতকরণে কোন সমস্যা হবে না এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে।

দো-আঁশ মাটি সবজির জন্য অতি উত্তম। এটেল দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ মাটিতেও সবজি ভাল হয়। তবে মাটি যেন জৈব সার সমৃদ্ধ হয়। মূল বা কন্দজাতীয় সবজির জন্য বেলে দো-আঁশ মাটি খুব ভাল। অধিকাংশ সবজির জন্য পিএইচ (pH) এর মান ৬-৭ ভালো। মাটি বেশি অম্লীয় (৭ এর নিচে) বা ক্ষারীয় (৭ এর উপরে) হলে উদ্ভিদের কয়েকটি খাদ্যোপাদান শোষণযোগ্য অবস্থায় থাকে না। অম্লত্ব কমাবার জন্য মাটিতে চুন এবং বৃদ্ধির জন্য সালফার প্রয়োগ করতে হবে।

৩.১.২ জমি প্রস্তুতকরণ

লাভজনকভাবে সবজি উৎপাদন করতে হলে ভালভাবে জমি প্রস্তুত করতে হয়।

এ ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যথা-

১। প্রাথমিকভাবে জমি তৈরিকরণ: সাধারণত মাটিতে 'জো' (মাটির উপযুক্ত আর্দ্রতা) আসার সাথে সাথে পাওয়ার টিলার বা লাঙ্গলের সাহায্যে ১৫-২০ সে.মি. গভীর চাষ করে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও ঢেলামুক্ত করতে হবে। মাটি এমনভাবে চাষ করতে হবে যেন খুব বেশি গভীর মাটি উপরে উঠে না আসে। জমি ভিজা থাকাকালীন চাষ দেয়া উচিত নয়। এঁটেল মাটি ভেজা অবস্থায় চাষ করলে এর ঢেলা ভাঙ্গা কঠিন হয়ে পড়ে। দো-আঁশ মাটি কিছু ভেজা অবস্থায় চাষ করা গেলেও মাটি শুকানোর পূর্বে মই দেয়া উচিত নয়। জমি তৈরিকরণের সময় অর্থাৎ শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার (Basal) জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হয়।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ে জমি প্রস্তুতকরণ: বেশির ভাগ ফসল জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য সেচ দিতে হবে এবং পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক) কেয়ারী নালা (২০ সে.মি.) পদ্ধতি: জমি চাষ করার পর রোপণ দূরত্বের সাথে সংগতি রেখে ১৫-২০ সে.মি. চওড়া অগভীর নালা কেটে একে সরু লম্বা ফালিতে বিভক্ত করে কেয়ারী বা বেড তৈরি করতে হবে। নালার মাটি দিয়ে দু'পাশের কেয়ারীগুলোকে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করা হয়। নালাগুলো পানি সেচ, নিষ্কাশন বা ফসলের পরিচর্যামূলক কাজের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- টমেটো, বেগুন, বাঁধাকপি ইত্যাদি।

খ) কেলি নালা (২০ সে.মি.) পদ্ধতি: সারির মাটি না খুড়ে অর্থাৎ নালা না করে সারির দাগ বরাবর বীজ নির্দিষ্ট ব্যবধানে বপন করার পর দুই সারির মধ্যবর্তী জায়গা হতে মাটি টেনে উঁচু করে বীজ ঢেকে নালা তৈরি করা হয়। যথা- আলু, লেটুস, মটরশুঁটি, ঢেঁড়স ইত্যাদি।

২০১৪

চিত্র: কেলি নালা পদ্ধতিতে আলু চাষ

গ) গর্ত বা মাদা পদ্ধতি: শিম ও কুমড়া পরিবারের সবজির শিকড় এবং কান্ডের শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বেশি ছড়ায়। তাই সেগুলো আবাদের জন্য জমিতে যথেষ্ট ফাঁক ফাঁক করে গর্ত বা মাদা তৈরি করে বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়। মাদা তৈরির জন্য সাধারণত ৫০-৬০ সে.মি. ব্যাস ও ৪০-৫০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুড়তে হয় এবং এর মাটির সাথে বীজ বপন বা চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে মৌল সারের অর্ধেক পরিমাণ মাটিতে মিশিয়ে গর্ত বা মাদা ভর্তি করতে হয়।

ঘ) জুলি পদ্ধতি: বীজ বপনের জন্য জমি ও কেয়ারীর উপর অগভীর খাদ বা নালা কাটা হয় তাকে জুলি পদ্ধতি বলে। কোদাল, পুরাতন লাঙ্গল বা অণ্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে জুলি কাটা হয়। যেমন- গিমাকলমি, আদা ইত্যাদি।

সার: মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করার জন্য জমিতে যে দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে সার বলে। সার মূলত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা- জৈব সার এবং অজৈব বা রাসায়নিক সার।

জৈব সার: গোবর, গোচেনা, কম্পোস্ট, হাঁস-মুরগী বিষ্ঠা, খৈল, সবুজ সার, কচুরিপানা ইত্যাদি মিলিয়েই জৈব সার। জৈব সার হচ্ছে মাটির প্রাণ। জৈব সার গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈব সার ব্যবহারে মাটির গুণাগুণ উন্নত হয়। গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে গাছকে সবসময় খাদ্য ও পুষ্টি উপাদান যুগিয়ে থাকে। গাছের অনুখাদ্য উপাদানের উৎস হিসেবে জৈব সারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জৈব সার গ্রীষ্মকালে মাটির রসধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং তাপমাত্রা কমায়। আবার শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখে। কীটনাশকের বিষাক্ততা কমাতে ভাল ভূমিকা পালন করে।

রাসায়নিক সার: খনিজ পদার্থ থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কারখানায় তৈরি সারকে রাসায়নিক সার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। রাসায়নিক সারে এক বা একাধিক খাদ্যোপাদান থাকে। খাদ্যের অভাব হলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে তাড়াতাড়ি গাছ খাদ্যোপাদান শোষণ করতে পারে। মাটিতে রাসায়নিক সারের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রধান রাসায়নিক সারগুলো হল ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত কয়েকটি সার ও এতে অবস্থিত রাসায়নিক উপাদানের হার নিচে তুলে ধরা হলো:

সারের নাম	নাইট্রোজেন (N) (%)	ফসফরাস (P) (%)	পটাশিয়াম (K) (%)	সালফার (S) (%)	দস্তা (Zn) (%)	বোরন (B) (%)
ইউরিয়া	৪৬					
টিএসপি (ট্রিপল সুপার ফসফেট)		২০				
ডিএপি (ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট)	১৮	২০				
এমপি (মিউরেট অব পটাশ)			৫০			
জিপসাম				১৮		
জিংক সালফেট (হেপ্টা-হাইড্রেট)				১৮	৩৬	
জিংক সালফেট (মনো-হাইড্রেট)				১১	২৩	
বোরিক এসিড						১৭

জৈব সার ব্যবহারের গুরুত্ব

১। জৈব সার মাটির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এতে ফসলের খরা-সহনশীলতা বেড়ে যায় এবং সেচের পানি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়।

২। গাছের অনুখাদ্য উপাদানের উৎস হিসেবে জৈব সারের ভূমিকা আছে।

৩। জৈব সার গাছের খাদ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪। গ্রীষ্মকালে মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয় এবং শীতকালে মাটিকে উষ্ণ রাখে।

৫। জমিতে কীটনাশক ঔষধ ও রাসায়নিক সারের আধিক্যজনিত কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি হলে জৈবসার ঐ বিষাক্ততা কমাতে সাহায্য করে।

জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের গুরুত্ব

রাসায়নিক সারে এক বা একাধিক খাদ্যোপাদান বেশি থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো পানিতে দ্রবণীয় হওয়ায় মাটিতে প্রয়োগের সাথে সাথে এদের খাদ্যোপাদান উদ্ভিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। মাটিতে রাসায়নিক সারের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।

সারের চাহিদা নির্ধারণ

মাটি পরীক্ষার মাধ্যমে কোন সবজিতে কিরূপ খাদ্যোপাদান আছে তা পরীক্ষা করে নিতে হবে। মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ দেশের কৃষি ভিয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। উপজেলা কৃষি অফিসসমূহেও এ ধরনের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন সবজির বিভিন্ন সারের প্রতি আকর্ষণ থাকে। এগুলো হচ্ছে:

১। নাইট্রোজেন পছন্দ করে পাতা জাতীয় সবজি।

২। ফুল ও ফল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও ফসফরাস পছন্দ করে।

৩। কান্ডজাতীয় সবজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে।

৪। লিগুমিনাস জাতীয় সবজি অর্থাৎ শিম পরিবারের সবজি ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে।

৫। মূল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও পটাশ পছন্দ করে।

এসব সবজির সারের প্রতি তাদের আকর্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হয়। সবজি চাষের মেয়াদ বিবেচনায় নিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে সবসময় সামান্য অম্লত্ব হলে ভাল হয়। অম্লত্ব কমাবার জন্য চুন এবং অম্লত্ব বাড়াবার জন্য সালফারসমৃদ্ধ সার দিতে হয়। জমিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলেও জৈব সার রাখতে হয় বেশি। কারণ জৈব সার গাছকে প্রচুর খাদ্যোপাদান সরবরাহ করে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটির স্বাস্থ্য দেখে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগ কার্যক্রম সাধারণত দুই পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে মৌল প্রয়োগ এবং অন্যটি উপরিপ্রয়োগ।

১। মৌল প্রয়োগ: যে সব সার ধীরে ধীরে দ্রবণীয় বা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় এবং সহজে বিনষ্ট হয় না সেগুলো মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। জমি তৈরির সময় মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন জৈব সার, চুন, টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম ইত্যাদি পুরোপুরি মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। আবার মিউরেট অব পটাশ (এমওপি), জিংক সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি মাটির ও ফসলের প্রকারভেদে ২৫-৫০ ভাগ মৌল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

মৌল সার ছিটিয়ে ও স্থানীয় প্রয়োগ এই দুই পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়-

ছিটিয়ে প্রয়োগ: এ ক্ষেত্রে জমি চাষের পর সমস্ত জমিতে সার ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ, কম শ্রম ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময়ও কম লাগে।

স্থানীয় প্রয়োগ: অনুর্বর জমিতে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী এবং কম সার ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বীজের কাছাকাছি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশে ও গভীরতায় যথাক্রমে ৮ সে.মি. দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আর গাছের বেলায় শেকড়ের বিস্তৃতি লক্ষ্য করে সার প্রয়োগ করা উচিত। মৌল সার অর্ধেক ছিটিয়ে এবং বাকী অর্ধেক সারি বা শেকড়ের কাছে প্রয়োগ করা উত্তম। নিচে এ ধরনের সার প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো

ক) চারার গর্তে প্রয়োগ: সবজির চারা রোপণের পুর্বে নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মৌল সারের অর্ধেক মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকোলী, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি।

২০২৩

খ) মাদায় প্রয়োগ: ফলজাতীয় সবজির বীজ বা চারা জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে মাদা তৈরি করে বপন/রোপণের পূর্বে মাদায় মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। যথা- কুমড়াজাতীয় লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শসা, চিচিঙ্গা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

গ) লাঙ্গল স্তরে প্রয়োগ: জমি তৈরি শেষে লাঙ্গলের সাহায্যে অগভীর নালা তৈরি করে তাতে মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। পরে মই দিয়ে জমি সমান করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। বীজ বা চারার শেকড় বাড়ার পর প্রয়োগকৃত সার শেকড়ের সাহায্যে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

ঘ) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ: এ পদ্ধতিতে বীজ ও সার একত্রে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রথায় বীজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একত্রে বীজ ও সার ড্রিল বা বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ না করাই উত্তম।

২। উপরিপ্রয়োগ: জমিতে সবজি বীজ বপন বা চারা রোপণ করার পর সার প্রয়োগকে উপরিপ্রয়োগ বলে। সাধারণত ইউরয়া, এমওপি, জিংক সালফেট, ছাই, তরল গোবর সার ইত্যাদি সার জমিতে উপরিপ্রয়োগ করা হয়। সার উপরিপ্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক) ছিটিয়ে উপরিপ্রয়োগ: ছিটিয়ে বোনা সবজির জন্য নাইট্রোজেন ও পটাশজাতীয় সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা বেশ সহজ। যেমন- মূলা, ডাটা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি।

খ) পার্শ্বপ্রয়োগ: সারি পদ্ধতিতে চাষ করা সবজির পাশে লাইন টেনে তাতে সার প্রয়োগ করা হয়। যথা- ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, গোলআলু, টমেটো, শসা, মুখীকচু ইত্যাদি।

গ) চারা/গাছের গোড়ায় সার প্রয়োগ: মাদায় লাগানো গাছের চারপাশে শিকড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে রিং করে নালা কাটা হয়। এ ক্ষেত্রে নালায় সার প্রয়োগ করে মাটি ঢেকে দেওয়া হয়। যথা- লাউ, শিম, কুমড়াজাতীয় সবজি, শসা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

৩। দ্রবণ আকারে পাতায় প্রয়োগ: বিশেষ ক্ষেত্রে, সার পানির সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে সারের দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে বা সিঞ্চনের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। দ্রবণকৃত সার সব সময় পাতার কোষের রসের ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া দরকার। অন্যথায় পাতা পুড়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে যে কোন মুখ্য উপাদানের অর্ধেক ও গৌণ উপাদানের প্রায় সবটুকু সার পাতায় প্রয়োগ করা চলে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ জাতীয় সার অধিক পরিমাণে লাগে বিধায় শুধু পাতায় প্রয়োগ করে সবজি ফসলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তবে গৌণ উপাদান প্রকৃত অনুপাতে দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে করে সবজি ফসলের চাহিদা পূরণ করা যায়।

এছাড়া, ১.০ – ১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকেলে প্রয়োগ করা যায়। এতে পাতাজাতীয় সবজি তাড়াতাড়ি সবুজ ও সতেজ হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলেই প্রথম পাতায় স্প্রে করা যায়। বর্ষজীবী সবজিতে ৩-৪ বার স্প্রে করা চলে। গোবর, খৈল ইত্যাদি জৈব সার ভালভাবে পচিয়ে তরলাকারে পাতায় প্রয়োগ করা যায়। জিংক সালফেট ও বোরিক এসিড ২.৫-৫.০ ভাগ দ্রবণ তৈরি করে পাতায় প্রয়োগ করা যায়।

উপরি-প্রয়োগ পদ্ধতি

সাধারণত দুই পদ্ধতিতে সবজি ক্ষেতে উপরিপ্রয়োগ করা হয়। একটি হচ্ছে জমি চাষের পর সার ছিটানো হয় এবং আরেকটি হচ্ছে অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে সার ছিটানো হয় এবং ছিটানোর পরে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

ছিটিয়ে সার প্রয়োগ অনেক সহজ এবং কম ব্যয়বহুল। তবে এ পদ্ধতিতে ফসফরাস ও পটাশ মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায়। গাছের নিকট গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে না। ভাল শিকড় না হওয়া পর্যন্ত গাছ দক্ষতার সাথে এ সার গ্রহণ করতে পারে না।

অন্যদিকে অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে সার প্রয়োগের কারণে বীজ বা গাছের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। এ পদ্ধতিতে শিকড়ের বিস্তৃতির দিকে খেয়াল রেখে সার প্রয়োগ করলে গাছ অধিক পরিমান সার শোষণ করতে পারে। ফলে ফলনও আসে বেশি।

সবজি চাষে সারের চাহিদা নিরুপণ

সবজির চাহিদা মোতাবেক সঠিক পরিমাণ অপেক্ষা কম সার ব্যবহার করলে ফলন কমে যাবে। অন্যদিকে বেশি সার ব্যবহারে সারের অপচয় হবে, খরচ বেড়ে যাবে, ফসলের গুণাবলি ও জমির উর্বরতা নষ্ট হবে, ফলন কমে যাবে। সারের চাহিদা পূরণের জন্য রাসায়নিক সারের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অন্তত ১০-২৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত।

বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান চাহিদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

সবজির নাম	খাদ্যোপাদান কখন বেশি পরিশোষণ করে
ফুলকপি	ফসল তোলার পূর্বের ৪০ দিন
বাঁধাকপি	মাথা বাঁধার শুরু থেকে ৩০ দিন
শালগম	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
মুলা	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
গাজর	ঐ
বেগুন	ফসল ধরা শুরু থেকে ৭০ দিন
টমেটো	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
গোল আলু	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
মিষ্টি আলু	ঐ
শিম	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
মটরশুটি	ঐ
শসা	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
পেঁয়াজ	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
পালংশাক	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন

২০২৪

সার প্রয়োগ সম্পর্কিত সতর্কতা

১। কিছু সার ব্যবহারে বা মিশ্রণে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন-

ক) চুন পটাশ সারের সাথে মেশানো উচিত নয়।

খ) চুন, সুপার ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর সার, কম্পোস্ট ইত্যাদি কখনও একসাথে মিশানো উচিত নয়।

গ) ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর সার, খামার সার কিংবা বিভিন্ন বিষ্ঠা সারের সাথে মিশানো যাবে না।

ঘ) ঝড়ো বাতাসের সময় বা ফসলের পাতা ভেজা অবস্থায় সার উপরিপ্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

ঙ) কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাঁচা গোবর সার মাটিতে প্রয়োগ করা হলে তার ১ মাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।

চ) প্রখর রোদের সময় বিশেষ করে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ছিটালে বেশির ভাগই নষ্ট হতে পারে।

ফার্টিগেশন পদ্ধতি

কঠিন বা তরল সার যখন সেচের পানির সাথে বৈজ্ঞানিক পন্থায় জমিতে প্রয়োগ করা হয় সে পদ্ধতিকে ফার্টিগেশন পদ্ধতি বলে।

চিত্র: ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে সবজি চাষ

ফার্টিগেশন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

১। অধিক ফলনের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

২। অল্প পরিমাণ সারকে সবজির মূলীয় অঞ্চলে খুব অল্প সময়ে পৌছানো সম্ভব হয়।

৩। সার এর অপচয় হ্রাস করা সম্ভব।

৪। সার ও পানির সমবন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৫। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

অসুবিধা

১। এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল।

২০২৪

২। গাছের চাহিদার সাথে সমন্বয় করে সার বন্টন অনেক সময় সম্ভব হয় না।

৩। এ পদ্ধতির জন্য পানির গুণগতমান ভাল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ফার্টিগেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

১। ভেনচুরি পাম্প

২। ফার্টিলাইজার ট্যাংক

৩। ফার্টিলাইজার ইনজেকশন পাম্প

ফার্টিগেশনের জন্য উপযোগী সবজি ফসল

টমেটো, বেগুন, মরিচ, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পেঁয়াজ, ঢেড়স, করলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, পালংশাক ইত্যাদি।

৩.২ সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ, প্রস্বেদন, বৃদ্ধি, ফুল, ফল ও বীজ উৎপাদনে পানি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তাই চাহিদা অনুসারে পানি না পেলে সবজির ফলন হ্রাস পেতে থাকে। শীত মৌসুমে জন্মানো সবজির সংখ্যা বেশি। কিন্তু এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। গ্রীষ্মকালেও একই অবস্থা বিরাজ করে। অন্যদিকে বর্ষাকালে সেচের বদলে নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে হয়।

৩.২.১ সেচ ব্যবস্থাপনা

সেচ সময় নির্ধারণ

চারা গজানো থেকে ফুল ধরা পযন্ত সবজির পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর চাহিদা কমতে থাকে। তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সেচের সময় নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণত বৃষ্টি না হলে সবজির ফুল আসা পর্যন্ত জমিতে প্রতি ১০ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। তবে বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম বিধায় এ জাতীয় মাটিতে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। পানির অভাবে গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখা দেয়ামাত্র পানি সেচ দিতে হবে। তাছাড়া পানির অভাবে মাটি হালকা রং ধারণ করে বিধায় তখন সেচ দিতে হবে। পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা বেশি। এগুলোর শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় বেশি পরিমাণে ও ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন, শসা এবং টমেটোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পানির প্রয়োজন। গোলআলু, মুলা প্রভৃতির জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন থাকলেও নিয়ন্ত্রিত সেচ দিতে হবে। শিম ও কুমড়াজাতীয় এবং অন্যান্য বর্ষজীবী সবজি পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত সেচে ভাল ফলন দেয়।

সেচ পদ্ধতি

প্রধানত ৩টি পদ্ধতিতে সবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো

১। **পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি:** প্লাবন, নালা, থালা পদ্ধতিগুলো পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতির আওতাভুক্ত। এ পদ্ধতিতে দোন বা সেঁউতির সাহায্যে পুকুর, খাল বিল এবং নদী থেকে পানি তুলে অথবা গভীর এবং অগভীর নলকূপের সাহায্যে

ভূ-নিম্নস্থ পানি তুলে সেচ দেয়া হয়ে থাকে। সেচের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সহজতর ও সেচ খরচ কম পড়ে, পানির অপচয় হয় না এবং সেচের পর মাটি সহজেই কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। জমি সমতল না হলে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া কষ্টকর। নালা করে সেচ দেওয়ার সময় জমি একদিকে অল্প ঢাল করে তেরি করে নিলে সেচের পানির অপচয় কম হয়। আবার বেশি ঢালু হলে পানির সাথে মাটি ও গাছের খাদ্যোপাদান ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সবজির দুই সারি বা কেয়ারির মাঝে নালা করে পানি দেওয়া যায়। এতে সবজি গাছের গোড়ার মাটি রসালো হয়, মাটি ঝুরঝুর থাকে এবং কর্দমাক্ত হয় না।

২। নিম্ন পৃষ্ঠদেশ সেচ: এ পদ্ধতিতে সবজি গাছের শিকড়াঞ্চলে পানি পৌছে দেয়া হয়। এ কাজে ছোট ছিদ্রযুক্ত পাইপের সাহায্যে করা হয় বলে খরচ অনেক বেশি পড়ে। এ পদ্ধতিতে মাটি কর্দমাক্ত হয় না এবং মাটিতে বায়ু চলাচল অব্যাহত থাকে।

৩। ঝরনা সেচ: এ পদ্ধতিতে পাইপের ভিতর দিয়ে পানি সরবরাহ করে বৃষ্টির মত ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এটি পানি সেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর সুবিধা হলো পানি সমভাবে বন্টন সম্ভব হয়।

চিত্র: বিভিন্ন ধরনের সেচ পদ্ধতি

৩.২.২ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে বর্ষাকালে সবজি ক্ষেতে অন্যতম প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা। গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন না পেয়ে শিকড় অকেজো হয়ে পড়ে। গাছের নিচের পাতা লাল হয়ে ঝরে পড়তে থাকলে বুঝতে হবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। জলাবদ্ধতার কুফলগুলো হল-

১। মাটি পানিতে পূর্ণ থাকলে শিকড়ের শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়।

২। শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না।

৩। মাটিতে অক্সিজেনের অভাবে অপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং উপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটে।

৪। গাছের গ্রহণযোগ্য নাইট্রেট নাইট্রাইটে এবং সালফেট সালফাইডে পরিবর্তিত হয়। এগুলো গাছ গ্রহণ করতে পারে না।

৫। মাটির তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

৬। মাটির লবনাদি বিধৌত ও নি:সরণ হতে পারে না।

৭। জলাবদ্ধতার কারনে মশার বংশবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে বাড়ে।

সুবিধামত নিষ্কাশন পদ্ধতি অবলম্বন করলে জলাবদ্ধতার হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে-

- নিষ্কাশন নালা তৈরি করা, বাঁধ নির্মাণ, পানির গতি পরিবর্তনের জন্য নালা তৈরি এবং উঁচু করে বেড তৈরি করা।
- ভারী কাদামাটি ধরনের হলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার এবং নদীবাহিত পলিমাটি প্রয়োগ করতে হবে।

৩.৩ সবজি চাষে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সবজি বীজ বপন বা চারা রোপণের পর থেকে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছের যথাযথ বৃদ্ধি, ফুল ও ফলায়নের জন্য যে সমস্ত পরিচর্যা গ্রহণ করতে হয় সেগুলোকে অন্তর্বর্তী পরিচর্যা বলা হয়। যথা-

৩.৩.১ কর্ষণ

প্রতিবার বৃষ্টি ও সেচের পর মাটির উপরিভাগ শুকিয়ে এলে মাটির উপরিভাগে শক্ত আস্তরণ পড়ে। ফলে মাটির অভ্যন্তরে বাতাস ও পানি চলাচল ব্যাহত হয়। এতে শিকড়ের মাধ্যমে গাছের শ্বসন ক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়। কর্ষণের ফলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং আগাছা দমনও অনেক সহজ হয়। কর্ষণের জন্য কোদাল, আচড়া, নিড়ানি ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩.৩.২ মালচিং বা আচ্ছাদন প্রয়োগ

মাটিতে রস ধারণ, আগাছা দমন ও মাটির চটা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য গাছের মধ্যবর্তী জায়গায় খড়কুটা, কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেয়াকে মালচিং বলে। জৈব পদার্থ বা কালো প্লাস্টিক ব্যবহার করে জমিতে মালচিং করা যায়। কালো প্লাস্টিকের আস্তরণ বেডের উপর দিয়ে তার উপর চারা রোপণ করা হয়। এতে মাটির রস সংরক্ষিত হয় এবং আগাছা দমন হয়।

মালচিং এর উপকারিতা

১। জৈব পদার্থের মালচিং পচে গিয়ে মাটিতে যুক্ত হয়।

২। মাটির ক্ষয় রোধ করা যায়।

৩। জৈব পদার্থের মালচিং মাটির তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।

৪। মাটির জমাট বাঁধা রোধ করে।

৫। মাটির রসের বাষ্পীভবন রোধ করা ও রস সংরক্ষণে সহায়তা করা।

৬। রঙিন প্লাস্টিকের চকচকে রংয়ের ঝলকানী দিয়ে অনেক অনিষ্টকারী পোকাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

৭। স্বচ্ছ প্লাস্টিক ফিল্মের মালচিং আগাছা দমনে সাহায্য করে।

মালচিং এর উপকরণ: জৈব পদার্থের মালচিং, যেমন- খড়, কচুরিপানা, আখের ছোবড়া, করাতের গুঁড়া, পুরনো পত্রিকার কাগজ ইত্যাদি।

৩.৩.৩ আগাছা দমন

ক্ষেতে কোন প্রকার আগাছা জন্মাতে দেয়া উচিত নয়। বাংলাদেশে মুথা, বড় চুচা, ভাদাইলা, শ্যামা, চাপড়া ঘাস, বথুয়া, নুনে, দুর্বা ইত্যাদি আগাছা দেখা যায়। এসব আগাছা দমন করতে নিম্নোক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে-

১। আগাছামুক্ত সবজি ফসলের বীজ ব্যবহার করা।

২। উত্তমরুপে ভূমিকর্ষণ করা।

৩। কেলি বা নালা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা।

৪। শস্য পর্যায় পদ্ধতি অবলম্বন করা।

৫। নিড়ানী দেয়া অথবা কোপানো।

৬। আগাছা সমূলে উৎপাদন করতে হবে।

৭। ২-৪ ডি আগাছা নাশক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

৩.৩.৪ গাছের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ

সব সময় জমিতে গাছের স্বাভাবিক দূরত্ব বজায় রেখে সর্বাধিক ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে না গজানো চারা বা মরে যাওয়া চারার শূন্যস্থানে নতুনভাবে বীজ বপন বা চারা লাগাতে হয়। সকল বীজ গজানোর পর বা চারা রোপণের ৩-৫ দিন পর থেকে এ কাজ করতে হবে।

৩.৩.৫ চারাকে সূর্যালোক থেকে রক্ষা

কিছু সবজির চারা যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস, ওলকপি ইত্যাদি চারা লাগানোর পর কলা গাছের খোল বা কাগজের টুপি বানিয়ে সরাসরি সুর্যের আলো থেকে রক্ষা করতে হবে।

৩.৩.৬ চারা পাতলাকরণ

বপন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে জমিতে বীজ বপন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে চারা দু'পাতা বিশিষ্ট হলে ঘন জায়গা হতে সাধারণত দুর্বল চারা উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হয়।

৩.৩.৭ সবজির পরাগায়ন

পুরুষ ফুলের পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থাপিত হলে তাকে পরাগায়ন বলা হয়। এই রেণু গর্ভমুন্ড থেকে গর্ভদন্ডের মধ্যে এক ধরনের কৈশিক বা সরু নলের মাধ্যমে গর্ভাশয়ে পৌঁছে এবং সেখানে ডিম্বাণুর সাথে নিষিক্তকরণের বা মিলনের মাধ্যমে ফল ও বীজ গঠন শুরু করে। কাজেই সব ফলজাতীয় সবজি উৎপাদনে পরাগায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গাজর, ওলকপি, শালগম, বীট প্রভৃতি সবজির পরাগায়ন ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, আমরা এসব সবজির রুপান্তরিত মূল বা কান্ড খাই। পরাগায়ন সুষ্ঠুভাবে না হলে ফুল ঝরে যায় বা ফল নষ্ট হয়। তবে নিম্নোক্ত কারণেও ফুল ঝরে যায় বা ফল নষ্ট হয়-

১। জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া বা নাইট্রোজেন সার ব্যবহার
২। ছায়া জায়গায় সবজি চাষ করলে
৩। অত্যাধিক গরম আবহাওয়া থাকলে
৪। প্রবল বৃষ্টিপাত, খরা, সেচসংকট বা মাটিতে রস না থাকলে
৫। রোগ ও ফলের মাছি পোকার আক্রমণ।

পরাগায়নের ধরন: পরাগায়ন প্রধানত দুভাবে হতে পারে- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। অধিকাংশ গাছেই পরাগায়ন প্রাকৃতিক উপায়ে, যেমন-পোকামাকড় (মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, সিরফিড মাছি), বাতাস ইত্যাদির মাধ্যমে ঘটে। আবার এমন কিছু কিছু গাছ রয়েছে যাদের পরাগায়ন কৃত্রিমভাবে ঘটাতে হয়; প্রাকৃতিক পরাগায়নের উপর নির্ভর করলে এ ক্ষেত্রে ফলন কমে যায়। যেমন- কুমড়াজাতীয় গাছ।

পরাগায়নের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে সবজিসমূহকে ক) স্বপরাগায়িত ও খ) পরপরাগায়িত এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক) স্ব-পরাগায়িত সবজি: যেসব সবজির একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ থাকে এবং ফুলের পরাগধানী হতে পরাগরেণু বাহিত হয়ে একই ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হওয়ার মাধ্যমে পরাগায়ন ঘটে তাদেরকে স্বপরাগায়িত সবজি বলে। স্বপরাগায়িত সবজির পরাগায়ন ঘটার জন্য কোন বাহক পোকা বা মাধ্যমের দরকার হয় না। যেমন- মটরশুটি, টমেটো, শিম, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি।

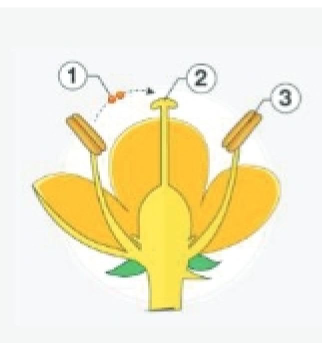

১. পরাগরেণু
২. গর্ভমুন্ড
৩. পরাগধানী

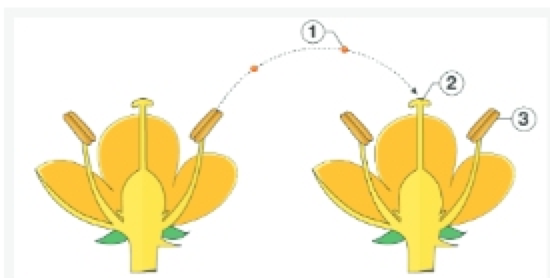

চিত্র : স্ব পরাগায়ন

চিত্র : পর-পরাগায়ন

খ) পর পরাগায়িত সবজি: সে সব সবজির একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গ না থাকায় পরাগায়নের জন্য স্ত্রী ফুলের অন্য একটি পুরুষ ফুলের প্রয়োজন হয় তোদেরকে পরপরাগায়িত সবজি বলে। পরপরাগায়িত সবজির পরাগায়ন ঘটার জন্য বাহক পোকা বা বাতাস দরকার হয়। এক্ষেত্রে একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদাভাবে থাকতে পারে, আবার ভিন্ন ভিন্ন গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটতে পারে। একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটলে সেসব গাছকে বলে সহবাসী (Monoecious) গাছ। যেমন-মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা ইত্যাদি। আবার

২০২৪

যেসব সবজির স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা তাদেরকে ভিন্নবাসী (Dioecious) গাছ বলে। যেমন- পটল, কাঁকরোল।

কৃত্রিম পরাগায়ন: কৃত্রিম পরাগায়ন হলো প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে অন্যভাবে পরাগায়ন নিশ্চিত করা। সাধারণত কৃষকেরা হাত দ্বারা কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। এজন্য একে হাত পরাগায়নও বলা হয়।

কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটাতে হলে প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল চেনা প্রয়োজন। সাধারণভাবে যেসব ফুলের গোড়ায় বোটার উপরে ফলের একটি ছোট গঠন থাকে যাকে গর্ভাশয় বলে, সেসব ফুলই স্ত্রী। আর যেসব ফুলের গোড়ায় কোন গর্ভাশয় বা এ ধরনের কোন গঠন থাকে না সেগুলো পুরুষ ফুল।

কৃত্রিম পরাগায়ন বা হাত পরাগায়ন পদ্ধতি: কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য পুরুষ ফুলের পরাগরেণু সংগ্রহ করে বা পুরুষ ফুল নিয়ে তার পরাগধানী স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ছোঁয়াতে বা হালকা করে ঘষতে হয়। কৃত্রিম পরাগায়নের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটার সময়, পরাগ বিদারণ কাল এবং পরিবেশগত উপাদানসমূহ বিবেচনা করতে হয়। সাধারণত কুমড়াজতীয় সবজির ফুল সকালেই ফোটে। শসা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি সবজির ফুল মার্চ মাসে ফোটে সকাল ৬ টার মধ্যেই। কিন্তু এপ্রিলে ৮ টা পর্যন্ত ফুটতে দেখা যায়। আবার লাউ ও ঝিঙা সকালের পর দুপুর পর্যন্তও ফোটে ও ফল ধারণ ঘটে। কিন্তু পটল ও চিচিঙ্গার ফুল ফোটা ও ফল ধারণ অবশ্যই খুব ভোরে ঘটে এবং এ দুটি সবজির ফুল ফোটা ও পরাগ বিদারণ বা ফেটে যাওয়া রাতের তাপমাত্রা দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়। পটল ও কাঁকরোলের ক্ষেত্রে জমিতে অন্তত ১০-১৫ শতাংশ পুরুষ গাছ রাখতে হয়। তাহলে কৃত্রিম পরাগায়নের উপযোগী পুরুষ ফুল প্রতিদিন পাওয়া যায়। কৃত্রিম পরাগায়ন করতে হলে সকালবেলায় একই সময়ে ফোটা পুরুষ ও স্ত্রী ফুল বেছে নিতে হয়। ভোরে একাজটি করা ভালো। পুরুষ ফুলটি গাছ থেকে বোঁটাসহ ছিঁড়ে তার পাপড়ি ফেলে দিতে হয়। এ অবস্থায় বোঁটার উপর শুধু পরাগদন্ডটি দাঁড়িয়ে থাকে। এসব কাজ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পরাগদন্ডের মাথায় যে পরাগধানী ও হলুদ গুঁড়ো গুঁড়ো পরাগরেণু থাকে তা যেন নষ্ট না হয় এবং কোন প্রকার ঘষা না লাগে। এরূপ একটি পরাগদন্ড নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে হালকা করে ঘষে দিতে হয়।

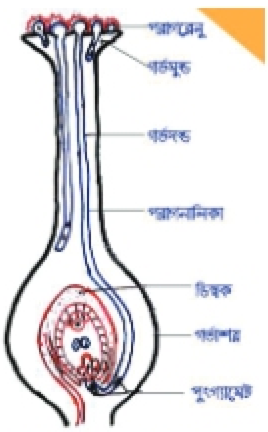

চিত্রঃ নিষেক প্রক্রিয়া

এতে গর্ভমুন্ডের আঠালো পদার্থে পরাগরেণু লেগে যায় ও পরাগায়ন ঘটে। প্রজাতিভেদে এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৫-১০টি স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন ঘটানো যায়। কাঁকরোলের ক্ষেত্রে স্ত্রী ফুলের চেয়ে পুরুষ ফুল ফুটতে সময় বেশি লাগে। গাছ গজানোর পর সাধারণত ৩০-৬০ দিন পর স্ত্রী ফুল ফোটে এবং পুরুষ ফুল ফোটে তারও ১০-১৫ দিন পর। এজন্য কন্দ রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে পুরুষ গাছের কন্দ বা মোথা লাগাতে হয়।

কৃত্রিম পরাগায়নের ধাপ সমূহ

১ম ধাপ-

পুরুষ ও স্ত্রী ফুল চিহ্নিত করা।

২য় ধাপ-

উপযুক্ত পুরুষ ফুল (কিছুটা অফুটন্ত) সংগ্রহ করে পাপড়ি ছিড়ে পরাগধানী অথবা তুলি দিয়ে পুরুষ ফুল হতে পরাগরেণু সংগ্রহ করা।

৩য় ধাপ –

এবার সংগ্রহকৃত পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে আলতোভাবে ঘষে দিতে হবে, অথবা তুলি বা কটন বাড ব্যতীত সরাসরি পুরুষ ফুলের পরাগধানী সংগ্রহ করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে আলতোভাবে ঘষে দিলেও পরাগায়ন সম্পন্ন হলে ফল টিকে যাবে বা কোন ফল পচে বা ঝরে পড়বে না।

চিত্র: মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ন

৩.৩.৮ অন্যান্য পরিচর্যা

ফলন বৃদ্ধি এবং এর গুণগতমান রক্ষা করার জন্য কতগুলো সবজির বেলায় বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। যেমন-

ক) লতানো প্রকৃতির সবজির বেলায় বাউনি ও মাচা তৈরিকরণ

খ) টমেটোর বেলায় অঙ্গ ছাটাই ও খুঁটি দেয়া

গ) গোলআলুর জন্য গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ইত্যাদি।

ঘ) টমেটোর উপরের দিকে বেয়ে উঠার কোন ক্ষমতা না থাকায় প্রতিটি গাছের পাশে আলাদাভাবে ঠেস দিতে হয়।

৩.৪ সবজি পর্যায় ও অন্তর্বর্তী চাষাবাদ

৩.৪.১ সবজি পর্যায়: প্রতি বছর একই জমিতে একই ফসল না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসল করাকে সবজি পর্যায় বলে। প্রতি মৌসুমে একই ফসল চাষ না করে চাষযোগ্য সবজিকে চার ভাগে ভাগ করে চার মৌসুমে চাষের ব্যবস্থা নিলে ভালো হয়।

প্রথম মৌসুমে: পাতা জাতীয় শস্য চাষ করা উচিত। কারণ, এরা নাইট্রোজেন চাহিদা যুক্ত। যেমন- লেটুস, পালং, ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ও অন্য আরো পাতা জাতীয় সবজি।

২০২৪

দ্বিতীয় মৌসুমে: ফসফরাস চাহিদাযুক্ত ফসলচাষ করা উচিত; এদের মধ্যে থাকতে পারে টমাটো, বেগুন, মরিচ, কুমড়া জাতীয় সবজি- যেমন মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, তরমুজ, বাঙ্গি, চিচিঙ্গা, শসা ও ক্ষিরা ইত্যাদি।

তৃতীয় মৌসুমে: পটাশ পছন্দকারী ফসল চাষ করা যায়, যেমন- পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, মুলা, শালগম ইত্যাদি।

চতুর্থ মৌসুমে: মাটি বন্ধনকারী ও পরিষ্কারকরণ ফসল চাষ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে লিগিউম জাতীয় ফসল বেশি ভালো। কেননা, এরা বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন আহরণ করে মাটিতে যুক্ত করতে পারে।

অর্থাৎ পাতা জাতীয় সবজি চাষের পর ফল জাতীয়, এরপর মূল জাতীয় এবং

শেষ মৌসুমে: লিগিউম জাতীয় শস্য চাষ করলে মাটির পুষ্টি তথা সার যথাযথভাবে ব্যবহার হয়। একই জাতীয় ফসল চাষ করলে মাটিতে বিশেষ ধরনের পুষ্টির অভাব হয় ও সমস্যা দেখা দেয়, এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বিভিন্ন রকমের ফসল চাষ বেশি লাভজনক। আমরা জানি, রাইজোবিয়াম বা নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাক্টেরিয়া মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

৩.৪.২ অন্তর্বর্তী চাষাবাদ

ক) অনুক্রমিক চাষ: একই জমিতে পরপর দুই বা ততোধিক শস্য বপন বা রোপণ করা।

খ) সাথী ফসলের চাষ: এ পদ্ধতিতে একটি শস্য মাঠে থাকতেই আরেকটি শস্য ঐ জমিতে রোপণ করে দিতে হবে। যেমন-ঢেঁড়সের মাঝে ফ্রেঞ্চবীনের চাষাবাদ।

গ) মিশ্র চাষ: এ পদ্ধতিতে একই জমিতে একই সাথে সাধারণত দুইটি বা ততোধিক শস্য রোপণ করা হয়। যেমন- ঢেঁড়সের সাথে ডাঁটা বা মরিচের চাষ।
ঘ) শিম জাতীয় ফসল জন্মিয়ে বা সবুজ সারের চাষ করে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করে মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়। যে সমস্ত ফসল জৈব পদার্থ কম যোগ করে (যেমন- লেটুস, পেঁয়াজ, মুলা, পালংশাক ইত্যাদি) সেগুলোর পর সেই জমিতে এমন সবজি চাষ করতে হবে যেগুলো আবার অধিক জৈব পদার্থ যোগ করে। যেমন- শিম, বরবটি ইত্যাদি।

৩.৫ শাক-সবজির বালাই দমনে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

আই.পি.এম এর ইংরেজি পূর্ণরুপ হচ্ছে 'Integrated Pest Management' যার বাংলা অর্থ 'সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা'। আই.পি.এম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি দমন ব্যবস্থা যাতে পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য সমন্বিতভাবে কয়েকটি দমন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আই.পি.এম এর অর্থ পোকা নিধন করে পোকাবিহীন বাগান নয় বরং পোকামাকড়ের আক্রমণকে কমিয়ে আনা যাতে ফসল উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়।

২০২৪

আই.পি.এম পদ্ধতিসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো

১। পরিচর্যা পদ্ধতি

ক) জমি কর্ষণ: ভালভাবে জমি কর্ষণ করলে পোকার ডিম, কীড়া (লার্ভা), পুত্তলি (পিউপা), রোগজীবাণু ইত্যাদি মাটির উপরে চলে আসে। ফলে রৌদ্রে এগুলো নষ্ট হতে পারে এবং পাখি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এগুলো ধ্বংস হতে পারে।

খ) ফসল বপন/রোপণ সময় ঠিক করা: ফসল বপন, রোপণের সময় পরিবর্তন করে কিছু পোকা দমন করা যায়।

গ) প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা: প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করে পোকা রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ঘ) শস্য চক্র: শস্য চক্র অনুসরণ করে পোকা নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়।

ঙ) সার প্রয়োগ: পরিমিত সার প্রয়োগে গাছের প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়ে, ফলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

চ) সেচ: পরিমিত সেচ প্রয়োগে গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ফলে পোকার আক্রমণ কম হয়।

২। যান্ত্রিক দমন: বিভিন্ন যন্ত্র যেমন-জাল, পাত্র ফাঁদ, আলোর ফাঁদ এবং আঠার ফাঁদ ব্যবহার করে কিছু পোকা দমন করা যায়। ফাঁদ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পোকা এসে ফাঁদে আটকা পড়ে এবং সহজেই পোকা মারা যায়। যেমন- পাত্র ফাঁদ- একটি পাত্রে কেরোসিন মিশ্রিত পানি রেখে তার উপরে একটি জ্বলন্ত হারিকেন স্থাপন করে অন্ধকার রাত্রে ফসলের জমিতে রেখে দিলে পোকা উড়ে এসে পোকা আলোর নিকট আসবে এবং ঘুরপাক খেতে খেতে পাত্রে রাখা কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে পড়ে মারা যাবে।

৩। ভৌত পদ্ধতি: হাত দ্বারা ধরে লেদা পোকা, জাব পোকা, বিছা পোকা, ডিমের গাদা ইত্যাদি হাত দিয়ে দমন করা যায়।

৪। জৈবিক পদ্ধতি: এটি ৩ ধরনের। যেমন-

ক) পরভোজী পোকা, যেমন-লেডি বার্ড বিটল, বোলতা, ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পরভোজী পোকা দ্বারা আক্রান্ত পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করা।

খ) পোকাবিতাড়নকারী গাছ, যেমন- ধনিয়া, বগামেডুলা, বিষকাঠালী ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে আক্রমণকারী পোকা জমিতে না আসার জন্য ব্যবস্থা করা।

গ) গাছপালা থেকে তৈরি ঔষুধ ব্যবহার করে আক্রান্ত পোকা দমন।

৫। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করে পোকা দমন ১-৪ নম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি পোকার আক্রমণ দমন না হয় তখন রাসায়নিক কীটনাশক কিংবা রোগনাশক ব্যবহার করে পোকা ও রোগ দমন করতে হবে। মনে রাখতে হবে সঠিক রাসায়নিক কীটনাশক নির্বাচন, সঠিক মাত্রা ও সঠিক পরিমানে ব্যবহার এবং কোম্পানীর নির্দেশনা অনুযায়ী একটি আক্রান্ত জমিতে যতবার ব্যবহারের নির্দেশনা থাকে ঠিক সেভাবে ততবার ব্যবহার করা ভালো।

জৈব কীটনাশক: যে কীটনাশক গাছের লতা পাতা, বীজ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয় তাকে জৈব কীটনাশক বলে। এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং গ্রামে মহিলারা এটি সহজেই তৈরি করে পোকা দমনে ব্যবহার করে। যেমন-

২০২৪

ক) নিম পাতা: ১ ভাগ নিম পাতা ৮ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধ করা পানি ঠান্ড করে গাছে স্প্রে করতে হবে। এটা সব ধরনের পোকা দমনে ব্যবহার করা যায়।

খ) বিষকাটালী পাতা: ১ ভাগ বিষ কাটালী পাতা পিষে ৮-১০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে ছেকে সেটা গাছে স্প্রে করে জাব পোকা, মাছি পোকা, রেড পাম্পকিন বিটল ইত্যাদি মারা যায়।

৩.৫ সবজি সংগ্রহ, বাছাইকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ

সবজি সংগ্রহ পর্যায়: সবজির স্বাদ, পুষ্টিমান এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কখন সবজি সংগ্রহ করতে হবে। তবে সবজি মোটামুটি পরিপক্ক হয়ে আসলে সবজি সংগ্রহ করতে হয়। বেশি কচি অবস্থায় সবজি সংগ্রহ করলে সে সবজি নষ্ট হয়ে যায়।

সবজির পরিপক্কতা: বিভিন্ন অবস্থায় সবজি সংগ্রহ করতে হয়। এগুলো হচ্ছে খাওয়ার উপযোগী পরিপক্কতা, শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতা এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিপক্কতা।

ক) খাওয়ার উপযোগী পরিপক্কতা: সবজি যখন সর্বোৎকৃষ্ট স্বাদ, আকার, রং ও অন্যান্য গুণাগুণ অর্জন করে। বিভিন্ন সবজির বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে খাওয়ার উপযোগী হয়। কাঁচা অবস্থায় বা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার আগেই শসা, শিম, ঢেঁড়স খাওয়ার উপযোগী হয়। এ সমস্ত সবজির বেলায় পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয় ফলের রং ও আকৃতি দেখে। গোলআলুর বেলায় গাছের উপরিভাগ শুকি য় এলে এবং আলুর খোসা সহজেই ছাড়ানো গেলে আলু খাওয়ার উপযোগী হয়। পেঁয়াজ ও রসুন গাছের উপরিভাগ শুষ্ক হয়ে পড়লে সংগ্রহ করতে হবে।

খ) শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতা: সবজি শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতায় তখনই পৌঁছে যখন সবজির উৎপাদিত বীজ পরিপক্ক হয়ে অংকুরোদগম ক্ষমতা অর্জন করে। সাধারণত বীজ উৎপাদনের জন্য সবজি সংগ্রহ করা হয়। বেশিরভাগ সবজি যেমন- বেগুন, ফুলকপি, লেটুস ইত্যাদি শারীরবৃত্তিক পরিপক্কতায় খাওয়ার অনুপযোগী হয়। শিম, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি সবজি খাওয়ার উপযোগী ও শারীরবৃত্তিক উভয় পরিপক্কতায় খাওয়া যায়।

গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিপক্কতা: সবজিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বয়সে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। আচার প্রস্তুত করার জন্য ৭-৮ সে.মি. লম্বা ও আঙ্গুলের ন্যায় ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কচি শসা খাওয়ার উপযেগী পর্যায়ে আসার আগেই সংগ্রহ করতে হবে। আবার টমেটোর রস বা সস তৈরি করতে টমেটোকে পরিপূর্ণ পাকা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে।

সবজি সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি: অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাঠ থেকে সবজি সংগ্রহ করতে হবে যাতে করে শারিরীক ক্ষত কম হয় এবং পণ্যের গুনগতমান বজায় থাকে। সবজি সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমে কিছু কিছু সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শ্রমিক খরচ কম হয়, কাজের গতি বাড়ে এবং পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রন করা যায়। সবজি সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমের সময় কর্মীদের নিরাপত্তামূলক পোষাক (এপ্রোন) পরিধান করা উচিত যা গাছের কাঁটা বা কষ থেকে রক্ষা করবে। এছাড়া মরিচের রস (Sap) ত্বকে জ্বালাপোড়া বা এলার্জী সৃষ্টি করতে পারে।

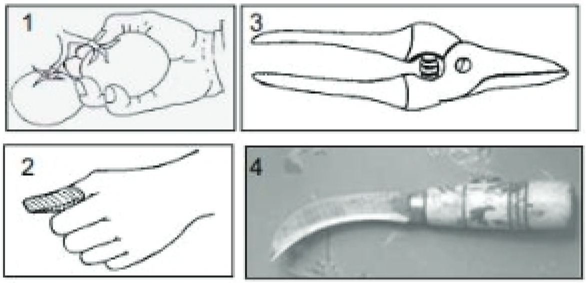

১) নখ দ্বারা হ্যান্ডপিকিং; ২) আঙ্গুলে নিপার পড়া ৩) ক্লিপার ৪) হারভেস্টিং চাকু

৫) মসৃন তলাবিশিষ্ট ফসল সংগ্রহ পাত্র; ৬) নিরাপদ এপ্রোন পরিহীত সবজি সংগ্রহকারী

চিত্র: সবজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কতিপয় উপকরণ

সবজি সাধারণত ঠান্ডাও শুষ্ক আবহাওয়ায় সংগ্রহ করতে হবে। শাকসবজি জাতীয় যেমন- লেটুস, পালংশাক ইত্যাদি অধিক তাপমাত্রায় বিশেষ করে দুপুর বেলায় সংগ্রহ করলে শ্বসন, প্রস্বেদন এবং অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলার ফলে ওজন কমে যায়। ফল জাতীয় সবজি, যেমন- টমেটো, তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি দুপুর বেলায়ও সংগ্রহ করা যায়। টমেটো, বেগুন, শশা এবং অন্যান্য ফলজাতীয় সবজির বোঁটা কর্তনের মাধ্যমে ফলকে গাছের কান্ড থেকে পৃথক করা হয়। ফল এমনভাবে টেনে ছেঁড়া যাবে না যাতে করে কান্ডের শেষ প্রান্ত (Stem end) ফলের সাথে সংযুক্ত থাকে। ফল টেনে ছিঁড়লে অনেক সময় ফলবৃন্ত উঠে আসে এবং মাতৃগাছের বাকল ক্ষতিগ্রস্থ হয় যা পরবর্তীতে রোগাক্রান্ত হয়, যার ফলে গাছ থেকে পানি ও শ্বসনীয় গ্যাসসমূহ বের হয়ে যায়। নিচে সবজি সংগ্রহের পদ্ধতি ছক আকারে প্রদর্শিত হল-

সবজির নাম	সংগ্রহের পদ্ধতি
বেগুন, শসা, কুমড়া ইত্যাদি	ধারালো ছুরি দিয়ে গাছের বোঁটা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
গিমাকলমি, ডাটা, লালশাক	পুরো গাছটি শিকড়সহ উপড়ে ফেলতে হবে।
পুঁইশাক, লাউয়ের ডগা	গাছের অংশ কেটে সংগ্রহ করতে হবে।
টমেটো, মরিচ, শিম	হাত দিয়ে তুলে সংগ্রহ করতে হবে।

সবজি সংরক্ষণ: অধিকাংশ সবজিতে পানির পরিমাণ ৮০-৯০ ভাগ। বাংলাদেশে ভালভাবে সংরক্ষণের অভাবে প্রচুর সবজি নষ্ট হয়। সবজির এক চতুর্থাংশ ফেলে দিতে হয়। ২০২৪

সংগ্রহোত্তর গুণাগুণ বজায় রাখতে করণীয়

১। পরিষ্কারকরণ: মাঠে থাকা অবস্থায় এবং সংগ্রহের সময় সবজির গায়ে ধুলাবালি লাগতে পারে। এজন্য সংগ্রহের পরপরই পরিষ্কার পানিতে সবজি ধুয়ে নিতে হবে।

২। ছাঁটাইকরণ: নিকটবর্তী বা দূরের বাজারে প্রেরণেআগে আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে পাতা জাতীয় সবজির মূল ও নিম্নাংশের বয়স্ক পাতা ছাঁটাই করতে হবে। খুব ধারালো ছুরি দিয়ে ছাঁটাই করা উচিত।

৩। বাছাইকরণ: সবজির আকার আকৃতি, বর্ণ, পরিপক্কতা অনুসারে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে গ্রেডিং করতে হবে। মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, আলু মাঠে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় (২০-৪০° সে.) এবং উচ্চ আর্দ্রতায় (কমপক্ষে ৮০%) কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

মাঠ পর্যায়ে সংগ্রহোত্তর সবজির পরিচর্যা

সঠিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সবজি হ্যান্ডিলিং করলে ক্ষতি পরিমাণ কম হয় এবং পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ করা যায়।

১. মাঠ থেকে সংগৃহীত সবজিসমূহ প্লাষ্টিক ক্রেটে রাখতে হবে। এতে করে বাঁশের ঝুঁড়ির তুলনায় পণ্যের ক্ষতি অনেক কম হবে।

২. একই সাথে ভিন্ন ভিন্ন পরিপক্কতার সবজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিপক্কতার পর্যায় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ পাত্র ব্যবহার করতে হবে।

৩. সংগ্রহের পর সবজিকে উম্মুক্ত মাঠে রোদের মধ্যে এবং মাটিতে বিছিয়ে রাখা যবে না। এতে করে উক্ত সবজি থেতে দ্রুত পানি বের হয়ে নেতিয়ে পড়বে এবং ক্ষতিকর জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনাও খুব বেশী থাকে।

৪. মাঠ থেকে সংগৃহীত সরিষা শাক বা চাইনিজ কপিকে যদি রৌদ্রে ৩০ মিনিট রাখা হয় তবে তা সাময়িকভাবে নেতিয়ে পড়ে কিন্তু সংগ্রহোত্তর পরিচর্যার সময় ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। পরবর্তীতে এই সবজিগুলোকে ধৌতকরণের সময় ময়লা দ্রব্যসমূহ অপসারিত হওয়ার পাশাপাশি পুনরায় পানি পেয়ে সজিব হয়ে উঠে।

৫. একই ভাবে ক্যাম্বোডিয়াতে মাঠ থেকে সংগ্রহ করার পর বাঁধাকপিকে এক ঘন্টা রোদে রাখা হয়। এতে বাঁধাকপির বোঁটার কর্তিত তল শুকিয়ে যায় যা নরম পঁচা রোগের ব্যাকটেরিয়াকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়।

৬. বাঁধাকপিকে ধৌত করা যাবে না। এজন্য প্যাকেজিং এর পূর্বে ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে ।

৭. উপযুক্ত ছায়ার ব্যবস্থা থাকলে মাঠ পর্যায়েই সবজির বাঁছাইকরণ, প্যাকেজিং এবং ট্রাকে পণ্য তোলা সম্ভব। সর্টিং, গ্রেডিং, প্যাকেজিং এবং বাজারে প্রেরণের জন্য পরিবহনের পণ্য উত্তোলনের কাজগুলো মাঠেও সম্পাদন করা যায়।

প্যাকেটজাতকরণ: বাংলাদেশে সবজির প্যাকেটজাতকরণ বা মোড়কীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দূরে পাঠাতে বা অনেকক্ষণ সবজি সংরক্ষণের জন্য মোড়কীকরণ করা আবশ্যক। কিছু সংখ্যক সবজি সংগ্রহের পরপরই দ্রুত পানি পরিত্যাগ করে এবং নেতিয়ে পড়ে। বিভিন্ন শাক, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, দেশি শিম, লেটুস,

১০১৪

ধনিয়া পাতা ইত্যাদি এভাবে মোড়কজাত করতে হবে। দূরের বাজারে পরিবহনের সময় সবজিতে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সময় বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত প্লাস্টিক, কাঠ, বাঁশের খাচা, অথবা কার্ডবোর্ডের বাক্সে সবজি বাজারজাতকরণ করতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ: সবজি সংগ্রহ করার পর কিছু কিছু প্রক্রিয়াজাত করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। টমেটো সংগ্রহ করে আচার, জ্যাম, জেলি, কেচাপ তৈরি করা যায়। এভাবে এগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। আবার মূল্য সংযোজনের ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। গোলআলু থেকে চিপস তৈরি করে অতিরিক্ত আলুর নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পচনশীল পণ্য হওয়ায় শাকসবজি দ্রুত বাজারজাত করতে হয়। শাকজাতীয় পণ্যগুলো দ্রুত বাজারে নিতে হবে। পুরো পরিপক্ক বা বড় হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করে মোটামুটি কাংখিত সাইজের হলেই বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাজা সবজি বাজারে দেয়া যাবে চাহিদাও তত বেশি । প্রতিকূল অবস্থা বা আবহাওয়া থেকে সবজিকে রক্ষা করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

- ফল জাতীয় সবজি চাষের জন্য বেশি আলোর দরকার হয়। শাক ও মূলজাতীয় সবজি কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি ছায়াতেও ভালোভাবে জন্মাতে পারে।
- দো-আঁশ মাটি সবজির জন্য অতি উত্তম।
- জমি তৈরির সময় সার প্রয়োগকে মৌল প্রয়োগ বলে।
- কান্ডজাতীয় সবজি নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে, লিগুমিনাস জাতীয় সবজি অর্থাৎ শিম পরিবারের সবজি ফসফরাস ও পটাশ পছন্দ করে এবং মূল জাতীয় সবজি নাইট্রোজেন ও পটাশ পছন্দ করে।
- ১.০ – ১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকেলে প্রয়োগ করা যায়।
- সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অন্তত ১০-২৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত।
- কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাঁচা গোবর সার মাটিতে প্রয়োগ করা হলে তার ১ মাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।
- পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালংশাক, পুঁইশাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা বেশি।
- ঝরনা সেচ পানি সেচের সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এর সুবিধা হলো পানি সমভাবে বন্টন সম্ভব হয়।
- কর্ষণের ফলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং আগাছা দমনও অনেক সহজ হয়।
- সকল বীজ গজানোর পর বা চারা রোপণের ৩-৫ দিন পর থেকে গাছের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে।
- একই গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফুটলে সেসব গাছকে বলে সহবাসী (Monoecious) গাছ। যেমন-মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা ইত্যাদি। আবার যেসব সবজির স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা তাদেরকে ভিন্নবাসী (Dioecious) গাছ বলে। যেমন- পটল, কাঁকরোল।
- লতা জাতীয় সবজি আবাদের জন্য স্থায়ী মাচার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

২০২৪

- শসা, বাঙ্গি, তরমুজ ইত্যাদি সবজির ফুল মার্চ মাসে ফোটে সকাল ৬ টার মধ্যেই। কিন্তু এপ্রিলে ৮ টা পর্যন্ত ফুটতে দেখা যায়। আবার লাউ ও ঝিঙা সকালের পর দুপুর পর্যন্তও ফোটে ও ফল ধারণ ঘটে। কিন্তু পটল ও চিচিঙ্গার ফুল ফোটা ও ফল ধারণ অবশ্যই খুব ভোরে ঘটে।
- কাঁকরোলের ক্ষেত্রে স্ত্রী ফুলের চেয়ে পুরুষ ফুল ফুটতে সময় বেশি লাগে। গাছ গজানোর পর সাধারণত ৩০-৬০ দিন পর স্ত্রী ফুল ফোটে এবং পুরুষ ফুল ফোটে তারও ১০-১৫ দিন পর।
- পরভোজী পোকা, যেমন-লেডি বার্ড বিটল, বোলতা, ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই, ইত্যাদি জমিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পরভোজী পোকা দ্বারা সবজির আক্রান্ত পোকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে পোকা দমন করা।
- শাকসবজি জাতীয় যেমন- লেটুস, পালংশাক ইত্যাদি অধিক তাপমাত্রায় বিশেষ করে দুপুর বেলায় সংগ্রহ করলে শ্বসন, প্রস্বেদন এবং অন্যান্য রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুতগতিতে চলার ফলে ওজন কমে যায়।

- গ্রেডিং করার পর মিষ্টি আলু, পেঁয়াজ, আলু মাঠে ছায়াযুক্ত স্থানে অথবা অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় (২০-৪০° সে.) এবং উচ্চ আর্দ্রতায় (কমপক্ষে ৮০%) কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সবজি চাষে বিভিন্ন সারের ব্যবহার ও গুণাগুণ সম্পর্কে জেনেছ। তুমি ছবি দেখে সারের নাম এবং এতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান উল্লেখ কর।

ক্র/নং	সারের নাম	সারের ছবি	পুষ্টি উপাদানের শতকরা হার
১			
২		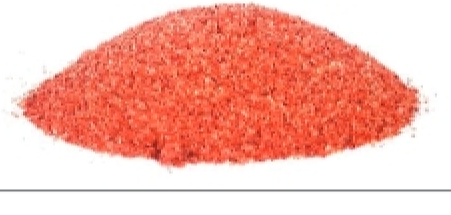	

৩			
৪			

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে তুমি শাকসবজি কিভাবে উৎপাদন করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা কিভাবে শাকসবজি উৎপাদন করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কিভাবে জমি ও মাটি প্রস্তুত, সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ও নিষ্কাশন অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা রোগবালাই দমন এবং সবজি সংগ্রহ,বাছাইকরণ, পক্রিয়াজাত করণ ও বাজারজাতকরণ বিষয় সম্পর্কে তোমার সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। সবজি বিজ্ঞানকে ইংরেজিতে কি বলে?

২। ফুল ও ফল জাতীয় সবজি কি কি পুষ্টি উপাদান পছন্দ করে।

৩। একজন সুস্থ লোকের দৈনিক কত গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন?

৪। টমেটো, বেগুন কত ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে?

৫। অম্লত্ব কমানো ও বাড়ানোর জন্য কি দ্রব্য ব্যবহার করা হয়?

৬। জুলি পদ্ধতি কাহাকে বলে?

৭। সার প্রয়োগের ২টি পদ্ধতি লিখ।

৮। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার কত ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত?

২০২৪

৯। চুন কোন সারের সাথে মিশানো উচিত নয়?
১০। সবজি ক্ষেতে সেচ প্রধানত কয় পদ্ধতি দেওয়া হয়।
১১। মালচিং কি?
১২। পরাগায়নের ধরন কি কি ?
১৩। IPM- এর পূর্ণরূপ কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। শাক-সবজি চাষের জন্য কি ধরণের মাটি উপযোগী?
২। সার কাহাকে বলে? ৫টি রাসায়নিক সারের নাম লিখ।
৩। জৈব সারের গুরুত্ব লিখ।
৪। ফার্টিগেশন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।
৫। সবজি চাষে জলাবদ্ধতার কুফলগুলো লিখ।
৬। মালচিং এর উপকারিতা সমূহ লিখ।
৭। ফুল ঝরা বা নষ্ট হওয়ার কারণগুলো লিখ।
৮। সহবাসী ও ভিন্নবাসী উদ্ভিদ কাহাকে বলে।
৯। সবজি চাষে শস্য পর্যায় কৌশল বর্ণনা কর।
১০। জৈব বালাইনাশক কাহাকে বলে? ২টি জৈব বালাইনাশকের নাম লিখ।
১১। সংগ্রহোত্তর গুণাগুণ বজায় রাখতে করণীয় কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শাক-সবজির জমি প্রস্ততকরণ সম্পর্কে আলোচনা কর।
২। সার প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩। সবজি চাষে বিভিন্ন প্রকার সেচ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৪। পরাগায়ন কাহাকে বলে? কিভাবে কৃত্রিম পরাগায়ন করা হয়?
৫। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কাহাকে বলে? শাক-সবজির বালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

জব ৩.১: সবজি বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- বীজের অংকুরোদগম হারের সংজ্ঞা বলতে পারবে।
- অংকুরোদগম হার সম্পর্কিত সূত্রটি লিখতে পারবে।
- মাটির পাত্র, কলার খোল, ভিজা চট ও পেট্রিডিসে সবজি বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করতে পারবে।

২০১৪

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৪. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৫. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

সুস্থ চারা উৎপাদনক্ষম বিশুদ্ধ বীজের শতকরা হারকে অংকুরোদগম ক্ষমতা বলে। ফসল উৎপাদনে ভালমানের বীজ ব্যবহার করা হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ ভাল কিনা তা অংকুরোদগমের হার দেখে বোঝা যায়। নির্দিষ্ট নিয়মে চারা গজিয়ে সুস্থ চারা গণনা করে এ হার নির্ণয় করা যায়। বীজ অংকুরোদগম বা গজানোর হার বিভিন্ন মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়।

বীজের অংকুরোদগম হার নির্ণয়ের সূত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো

$$\textbf{অংকুরোদগমের শতকরা হার (Germination percentage)} = \frac{\text{মোট গজানো বীজের সংখ্যা}}{\text{গজানোর জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \%$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাটির পাত্র, ২। কলার খোল, ৩। ভিজা চট, ৪। পেট্রিডিস, ৫। কেচি/চাকু, ৬। পানি, ৭। ব্লটিং পেপার, ৮। সবজির বীজ, ৯। খাতা কলম।

কাজের ধারা

১) মাটির পাত্র পরিমাণ মত মাটি বা ধুলা দ্বারা ভর্তি করতে হবে।
২। কলার খোল: কলার পাতার বোঁটার দিকটার মোটা অংশে ১ ফুট পরিমাণ টুকরো করে কেটে নিতে হবে।
৩। ভেজা চট: ৩০ বর্গ সেমি পরিমাণ চট টুকরা করে কেটে নিতে হবে।

৪। পেট্রিডিস: পেট্রিডিসের ভিতরের তলায় ব্লটিং পেপার (চোষ কাগজ) বিছিয়ে নিতে হবে এবং চট ও ব্লটিং পেপারে অল্প অল্প পরিমান পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে নিতে হবে।

৫। এরপর বীজ লট হতে নমুনা বীজ সংগ্রহ করে সেখান হতে কোনরুপ পক্ষপাতিত্ব না করে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০০টি বীজ আলাদা করে নিতে হবে।

৬। ১০০টি নমুনা বীজ মাটির পাত্রে সারি করে বসায়ে আলো-বাতাসযুক্ত ছায়া স্থানে বসাতে হবে ও প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অল্প পানি দিতে হবে।

৭। কলার ডাঁটা বা কান্ড বা পাতার বোঁটার মোটা অংশের ১ দিক হতে বাঁশ ফালি করা বা ফাঁড়ার ন্যায় সমান্তরালভাবে দুই পাশ হতে ফাঁড়তে হবে। এতে মাঝখানের অংশ দন্ডের ন্যায় থেকে যাবে।

৮। কলার ডাঁটার দুই দিক হতে প্রায় ২০ সে.মি. পরিমাণ করে কাটা ফালি ২টি দুদিকে ভাঁজ করতে হবে, ঠিক যেভাবে কলা ছিলা হয়।

৯। কলার ডাঁটার ভিতরের দন্ডের খাঁজে খাঁজে ১০০টি বীজ সাজায়ে ফালি করা অংশ ২টি সোজা করে নিলে বীজ ঢেকে যাবে। এখন ডাঁটাটি সূতা/চিকন সূতলি দিয়ে পেঁচায়ে বেঁধে ঠান্ডা ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিতে হবে।

১০। চটটি বিছিয়ে একপাশে সারি করে ১০০টি বীজ সাজাতে হবে এবং একটা কাঠি চটের মাথায় ধরে আস্তে আস্তে চটটি কাঠির সাথে রোল করে পেচিয়ে নিয়ে ঠান্ডা ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিতে হবে। চটটি শুকায়ে গেলে মাঝে মাঝে ভিজায়ে নিতে হবে।

১০। পেট্রিডিসেও বীজ ১০০টি সাজায়ে ডিসের ঢাকনা দেওয়ার আগে পিপেটের সাহায্যে পানি দিয়ে বীজগুলো ভিজিয়ে নিয়ে জানালার কাছে টেবিলে রেখে দিতে হবে।

অংকুরিত বীজ গণনা

চারার শ্রেণিভেদ	কতবার/ রেপ্লিকেশন (কমপক্ষে ৩ বার)	অংকুরিত বীজের সংখ্যা ও দিন										গড় %
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
স্বাভাবিক চারা	১ম বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												
স্বাভাবিক চারা	২য় বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												
স্বাভাবিক চারা	৩য় বার											
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												

ক) সাধারণত বীজ বসানোর ৩য় দিন হতে অংকুর গণনার কাজ শুরু এবং ৭ম দিনে শেষ করতে হয়। প্রতিদিন অংকুরিত বীজ গণনার পর পাত্র হতে সেগুলো ফেলে দিতে হয় এবং তা ছকে লিখে রাখতে হয়।

খ) যে বীজের মূল ও কান্ড স্পষ্টভাবে গজাতে দেখা যায় সে বীজকেই গজানো বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে কমপক্ষে ৩টি পাত্রের (একই জাতীয়) অংকুরিত বীজের হিসাব নিয়ে গড় করে শতকরা হারে প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ মাটির পাত্রে বসানো বীজের অংকুর হার নির্ণয়-

২০২৪

মাটির পাত্র	প্রতি পাত্রে বীজের সংখ্যা	গজানো বীজের সংখ্যা	বীজ গজানোর শতকরা হার (%)	গড় হার (%)
১ম পাত্র	১০০টি	৮২	৮২	৮২.৫
২য় পাত্র	১০০টি	৮০	৮০	
৩য় পাত্র	১০০টি	৭৮	৭৮	
৪র্থ পাত্র	১০০টি	৯০	৯০	
মোট ৪টি পাত্র	মোট=৪০০টি	মোট=৩০০টি	৩৩০/৫৪=৮২.৫%	

কাজের সতর্কতা

১। সূত্রের মান বসানোর সময় নির্ভুলভাবে বসাতে হবে।
২। ক্যালকুলেটর বা গণনা যন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে তথ্য দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সবজির বীজের অংকুরোদগম হার নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৩.২: সবজি ফসলে মাদা ও বেড তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- সবজি চাষ করার জন্য মাদা ও বেড তৈরিতে কি কি উপকরণ লাগে তা জানতে পারবে।
- আধুনিক উপায়ে মাদা ও বেড প্রস্তুত করতে পারবে
- মাদা ও বেডে ব্যবহৃত সারের নাম ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- পানি সেচ ও নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী(পিপিই) ও শোভন
৪. পোশাক পরিধান করা;
৫. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৬. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

যে সকল সবজির শিকড়, কান্ড, শাখা-প্রশাখা বেশি বিস্তৃত হয় সেসব সবজির জন্য মাদা তৈরি করতে হয়। এসব মাদা পার্শ্ববর্তী নালা থেকে উঁচুতে হয়, যা অতিবৃষ্টি থেকে মাদা তথা সবজি ফসলকে বাঁচায়।
সবজি ফসলের জন্য সুনির্দিষ্ট মাপের বেড তৈরি করতে হয়। বীজতলায় বড় হওয়া চারা বেডে স্থানান্তর করা হয়। আবার কিছু কিছু সবজি বেডে সরাসরি লাগানো হয়। রোপণকৃত চারার আন্ত: পরিচর্যার জন্য ছোট ছোট বেডে প্রতিস্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। ম্যাজারিং টেপ, ২। কোদাল, ৩। টুকরি, ৪। আঁচড়া, ৫। রশি, খুঁটি, ৭। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৮। চুন, ৯। বাঁশের কঞ্চি বা লাঠি, ১০। খাতা-কলম।

কাজের ধারা

ক) মাদা তৈরি

১। মাদা তৈরির জন্য জমিতে কোদাল দিয়ে ৬০ সে.মি. ব্যাস এবং ৬০ সে.মি. গভীর করে গর্ত তৈরি করতে হবে।

২। গর্তের উপরের অর্ধেক ও নিচের অর্ধেক মাটি আলাদা করে তুলে রাখতে হবে এবং ২-৩ দিন গর্ত ও মাটিতে সূর্যকিরণ লাগতে দিতে হবে।

৩। গর্তের উপরের অংশের মাটির সাথে অনুমোদিত জৈব সার ও টিএসপির সম্পূর্ণ পরিমাণ এবং এমওপির অর্ধেক পরিমাণ মিশিয়ে নিতে হবে।

৪। এ মিশ্রিত মাটি ও সার গর্তে ফেলতে হবে।

৫। এরপর গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্তের বাকী অংশ ভর্তি করতে হবে।

৬। মাদার মুখ জমির লেভেলের তুলনায় ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে দিতে হবে এবং কমপক্ষে ৭ দিন এভাবে রাখতে হবে। এরপর বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হবে।

২০২৪

খ) বেড তৈরি

১। প্রথমে একটি কোদাল নিয়ে ১৫ সে.মি. গভীর করে ভালোভাবে কুপিয়ে নিতে হবে।

২। আঁচড়া ও কোদাল দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে, আগাছামুক্ত, সমতল করে নিতে হবে।

৩। এরপর এতে ৩ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১ মিটার প্রস্থ আকারের বেড মেপে নিতে হবে।

৪। বেডের জন্য মাপা জমির চারিদিকে ২৫ সে.মি. চওড়া এবং ১৫ সে.মি. গভীর পানি নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে। নালার মাটি বীজতলার জমির উপর কোদাল দিয়ে উঠিয়ে দিতে হবে।

৫। নালার তলা থেকে বেডের উচ্চতা ১৫ থেকে ২০ সে.মি. করে নিতে হবে।

৬। প্রতিটি বেডে ২০ কেজি জৈব সার ও ১০০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৭। উপরের মাটি সমতল ও মিহি করে নিতে হবে।

৮। বীজ বপন ও চারা রোপণের জন্য এবার বেড প্রস্তুত হলো।

৯। সার প্রয়োগের কমপক্ষে ৭ দিন পর বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে পারবে।

কাজের সতর্কতা

১। মাদা ও বেডে কাঁচা জৈব সার প্রয়োগ করা যাবে না।

২। সার প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে সব সার যাতে বীজতলায় সমানভাবে পড়ে।

৩। মাদা ও বেডের মাটির সাথে অনুমোদিত জৈব ও রায়নিক সার ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

সবজি ফসলে মাদা ও বেড করতে সক্ষম হয়েছে।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়
সোলানেসী গোত্রের সবজি চাষ
(Cultivation of Solanaceous Vegetables)

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় শাকসবজির গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা শাকসবজিতে প্রচুর পরিমানে ভিটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায় যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে আলু, বেগুন, টমেটো, মরিচ ইত্যাদি খেয়ে থাকি। তবে এগুলো কি ধরণের সবজি এটা অনেকেই জানিনা? এগুলো সোলানেসী গোত্রের বা বেগুন পরিবারের সবজি। বেগুন পরিবারে সবজির সংখ্যা খুব কম, কিন্তু উৎপাদনের পরিমান ও অর্থনৈতিক গুরত্বের কথা বিবেচনায় করলে এই পরিবারের আলু,বেগুন ও টমেটো বিশ্বের তিনটি শীর্ষস্থানীয় সবজি। পরিকল্পিতভাবে সোলানেসী গোত্রের সবজি উৎপাদন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থ উপার্জন করা সম্ভব । এই অধ্যায়ে আমরা এ সকল সবজি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবো।

এই অধ্যায় শেষে-

- বিভিন্ন সবজির জাত নির্বাচন করতে পারবে
- জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ করতে পারবে
- চারা রোপন করতে পারবে
- অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা করতে পারবে
- সেচ ও নিষ্কাশন করতে পারবে
- সবজি ফসল সংগ্রহ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে

৪.১ বেগুন (Eggplant/Brinjal)

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি । এটি একটি সুস্বাদু, পুষ্টিকর ও চেনা সবজি যা প্রায় প্রত্যেকের রান্নাঘরেই মজুদ থাকে। বছরব্যাপি বেগুন চাষের জন্য বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু খুবই উপযুক্ত। বেগুন চাষ করে অনেক কৃষকই স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

৪.৩.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: বাংলাদেশ, ভারত ও তৎসংলগ্ন এলাকা বেগুনের উৎপত্তিস্থল।

ইংরেজি নাম: **Brinjal/Egg Plant ,**

বৈজ্ঞানিক নাম: *Solanum melongena*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: পুষ্টিমূল্যের দিক দিয়ে বেগুন একটি উৎকৃষ্ট মানের সবজি। ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ১.১ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ৪ গ্রাম, স্নেহ ০.১ গ্রাম, ভিটামিন এ ৭০ (আই. ইউ.), থায়ামিন ০.০১ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০২ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৭ মিলিগ্রাম রয়েছে।

ব্যবহার: বাংলাদেশে বেগুনের বহুবিধ ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রধানত তরকারী, ভাজি, ভর্তা ও বেগুনী হিসাবে ভক্ষণ করা হয়। বিশেষত বাংলাদেশে বিকালের নাস্তায় বেগুনী একটি জনপ্রিয় খাবার।

জলবায়ু ও মাটি: বেগুন উষ্ণ জলবায়ুর ফসল। বেগুনের ফল ধারণের উপযুক্ত তাপমাত্রা সাধারণত ১৫ থেকে ২৫ ডিগ্রি সে। তাপমাত্রা এর কম বেশি হলে বেগুনের ফুল ও ফল ধারণ ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের জন্য শীতকালীন জলবায়ু বেগুন চাষের জন্য খুবই উপযোগী। আমাদের দেশে প্রায় সব মাটিতেই বেগুন জন্মে থাকে। ভাল ফলন পেতে এঁটেল দো-আঁশ, দো-আঁশ ও পলিমাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।

উৎপাদন মৌসুম: বাংলাদেশের জলবায়ুতে বছরের যে কোন সময়ই বেগুনের চাষ করা যেতে পারে। তবে রবি মৌসুমে বেগুন চাষ করলে ফলন খরিপ মৌসুমের চেয়ে ভালো পাওয়া যায়। রবি মৌসুম অর্থাৎ শীতকালের জন্য সাধারণত আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুম অর্থাৎ বর্ষাকালীন বেগুনের জন্য জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। রবি মৌসুমে চাষের জন্য যে কোন জাতের বেগুন লাগানো যেতে পারে, কিন্তু খরিপ মৌসুমে চাষের জন্য বারমাসী জাতসমূহ লাগাতে হবে।

জাত পরিচিতি: দেশের বিভিন্ন জেলাগুলোতে স্থানীয় ফসল হিসেবে বিভিন্ন জাতের বেগুন চাষ করা হয়। মৌসুম ভিত্তিতে সব জাত গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় যেমন- শীতকালীন জাত ও বারমাসী জাত। শীতকালীন জাতের বেগুন কেবল মাত্র রবি মৌসুমেই চাষ করা হয়ে থাকে। আর বারমাসী জাতের বেগুন সারা বছরই চাষ করা যায়।

ক) স্থানীয় জাত: আমাদের দেশের স্থানীয় উল্লেখযোগ্য জাতগলো হলো ইসলামপরী, উত্তরা, লাফফা, নয়নকাজল, ঈশ্বরদি- ১, খটখটিয়া, সাহেব বেগুন, তাল বা তল্লা বেগুন, কেজি বেগুন, শীংনাথ ইত্যাদি।

খ) হাইব্রিড জাত: বিটি বেগুন, কাজলা (বারি বেগুন ৪), নয়নতারা (বারি বেগুন ৫), তারাপুরী (বারি বেগুন ২), ডিম বেগুন, মুক্তকেশী ইত্যাদি জাত সমুহ।

ইসলামপুরী

খটখটিয়া

ঈশ্বরদি - ১

লাফফা

উত্তরা (বারি বেগুন ১)

বারি বিটি বেগুন-১

চিত্র : **বেগুনের বিভিন্ন জাত**

৪.৩.২ উৎপাদন পদ্ধতি/ চাষাবাদ পদ্ধতি

৪.৩.২.১ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ বপনের সময়: রবি মৌসুম অর্থাৎ শীতকালের জন্য সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। খরিপ মৌসুম অর্থাৎ বর্ষাকালীন বেগুনের জন্য জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

বীজ সংগ্রহ: বিশ্বস্ত কোনো উৎস (সরকারি/ বেসরকারি) থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

বীজ বাছাই: বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে বেগুনের উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। তাই অপুষ্ট ও অন্য শস্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করা জরুরি।

বীজশোধন: বীজতলায় বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান) ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে বীজ শোধন করা।

বীজহার: অংকুরোদগমের হার ৮০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টর জমিতে বেগুন চাষের জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

চারা উৎপাদন: বেগুন চাষের জন্য প্রথমে বীজতলায় চারা করে তা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। বীজতলা এমন স্থানে তৈরী করতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়াবে না অর্থাৎ সুনিষ্কাশিত হতে হবে, সর্বদা আলো-বাতাস পায় অর্থাৎ ছায়ামুক্ত হতে হবে। দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির আকারভেদে দৈর্ঘে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। বীজতলায় সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য ৫ সেমি দূরত্বে ক্ষুদ্র নালা/সারি তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পাশাপাশি দুটো বীজতলার মধ্যে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত। এ ফাঁকা জায়গা থেকে মাটি নিয়ে বীজতলা উঁচু করে নিতে হবে। অল্প সংখ্যক চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলা হিসেবে কাঠের বাক্স, প্লাস্টিকের ট্রে অথবা বড় টব ব্যবহার করা যেতে পারে। চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা যেমন- চাটাই/নেট দ্বারা ঢেকে অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে সকালে ও সন্ধ্যায় হালকাভাবে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চারা গজানোর পর ২-৩ দিন অন্তর হালকা সেচ দেওয়া উচিত।

চিত্র : বীজতলার পরিচর্যা

৪.৩.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: যে জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না ও সবসময় আলো-বাতাস পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি প্রস্তুতকরণ: সাধারণতঃ মাঠের জমি তৈরির জন্য ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝরঝরে করে নিতে হবে। বেগুনের শিকড় যেহেতু দীর্ঘ প্রসারী, কর্ষণের গভীরতা যত বেশী গাছের জন্য তত মঙ্গলজনক।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: বেগুন চাষে সার প্রয়োগ একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টর জমিতে ১৪৫ থেকে ১৫৫ কেজি টিএসপি, ৩৭০ থেকে ৩৮০ কেজি ইউরিয়া, ২৪০ থেকে ২৬০ কেজি এমপি এবং গোবর ৮ থেকে ১২ টন হারে প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর প্রয়োগ করতে হয় আর বাকি অর্ধেক গোবর সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও এমপি সার পিট বা মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি সার চারা লাগানোর ১০-২৫ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং তৃতীয় কিস্তি ফল

তোলার মাঝামাঝি সময়ে দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েকদিন পর মাটিতে চটা ধরে। মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হয় যাতে করে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ: বীজতলায় চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে চারা রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় চারাতে ৫-৬টি পাতা গজায় এবং চারা প্রায় ১৫ সেমি. লম্বা হয়। বেগুনের চারার বয়স একটু বেশী হলেও লাগানো যেতে পারে। প্রয়োজনে দু'মাস পর্যন্ত চারা বীজতলার রেখে দেওয়া যায়। চারা তোলার সময় যাতে শিকড় নষ্ট না হয় সেজন্য চারা তোলার ১-২ ঘন্টা আগে বীজতলায় পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারার রোপণ দূরত্ব জাত, মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন মৌসুমের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ বড় আকারের বেগুনের জাতের ক্ষেত্রে ৯০ সেমি. দূরে সারি করে সারিতে ৬০ সেমি. ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে এবং ক্ষুদ্রাকার জাতের ক্ষেত্রে ৭৫ সেমি. সারি করে সারিতে ৫০সেমি. ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে। জমিতে লাগানোর পর পরই যাতে চারা শুকিয়ে না যায় সে জন্য সম্ভব হলে বিকালের দিকে চারা লাগানো উচিত।

বেগুনের চারা রোপণের সময়: সাধারণত বেগুনের চারা মাঘ-ফাল্গুন মাসে গ্রীষ্মকালীন, বৈশাখ মাসে বর্ষাকালীন, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে শীতকালীন ফসলের জন্য রোপণ করা হয়ে থাকে।

৪.৩.২.৩ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

১) শূন্যস্থান পূরণ (Gap Filling): কোন গাছ মরে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে ৮-১০ দিনের মধ্যে সেখানে নতুন করে চারা রোপণ করতে হবে।

২) আগাছা দমন: কোন ভাবেই জমিতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া যাবেনা। আগাছা দেখা দিলে সাথে সাথে নিড়ানী দিয়ে পরিস্কার করতে হবে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিতে শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

৩) আইল তুলে দেওয়া: চারা রোপনের মাসখানেক পর দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান হতে মাটি উঠিয়ে সারি বরাবর অনুচ্চ আইল তুলে দেওয়া একটি উত্তম ব্যবস্থা। শীতকালীন ফসলের বেলায় এইভাবে সৃষ্ট নালা পানি সেচ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, বর্ষাকালীন ফসলের পানি নিষ্কাশনের জন্য এটি প্রয়োজন।

চিত্র : আইল বা মাটি তুলে দেওয়া

৪) সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: বেগুন গাছের প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। বেলে মাটিতে ১০ থেকে ১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া জমিতে রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। বর্ষাকালে বেগুনের জমিতে পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখতে হবে। বেগুন গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না।

চিত্র : সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থা

৫) খুঁটি দেওয়া ও ছাঁটাই করা: গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। লম্বা জাতের গাছে খুঁটি দিতে হবে যাতে বেগুন গাছ হেলে না পড়ে। সাধারণত বেগুনে ডাল ছাটাই করা হয়না তবে বারোমাসী বেগুনের ক্ষেত্রে প্রথম বছর ফল দেওয়ার পর গাছের পুরাতন ডালপালা ছেটে দিলে নতুন সতেজ কুঁড়ি বের হয় ও তাতে উৎকৃষ্ট ফল ধরে।

চিত্র : খুঁটি প্রদান

৬) মাটি আলগা করে দেওয়া: গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে আলগা করে দিতে হবে।

৭) সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

৮) বেগুনের রেটুন/ মুড়ি ফসল: মুড়ি ফসলকে ইংরেজিতে বলে ‘রেটুন ক্রপ’। মূল ফসল কাটার পর অবশিষ্টাংশ গোড়া থেকে পুনরায় গাছ হয় ও ফলন পাওয়া যায়। একেই মুড়ি ফসল বলে। মুড়ি ফসলে চাষ, লাগানো ও অন্যান্য যত্ন কম নিতে হয়। তাই ফলন কম হলেও চাষের খরচ কম হয় বিধায় কৃষকের লাভ হয়। তবে কিছু যত্ন যেমন আগাছা ও মরা পাতা পরিষ্কার করে দেয়া, ছত্রাকনাশক স্প্রে করা এ সকল পরিচর্যা

২০২৪

করলে ফলন বাড়ে। পুরাতন বেগুনের গাছ থেকে কম সময়ে নতুন গাছের মত ফলন পাওয়ার জন্য অনেকেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। শীতকালীন জাতকে রেটুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৯) ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

ক্ষতিকর পোকামাকড়: বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম।

ক) বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: ডগা ও ফল ছিদ্র করে কুড়ে খায়। আক্রান্ত ডগা ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায়। ফলে আক্রমন হলে তা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে।

চিত্র :বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার ক্ষতির লক্ষণ

দমন ব্যবস্থাপনা

- অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করতে হবে।
- কীটনাশকের বদলে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- নিদিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে নিয়ে এর নির্যাস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার/ ৪ মুখ অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার /২ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।

চিত্র : আলোর ফাঁদ

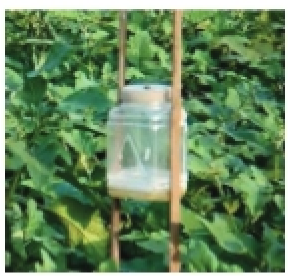

চিত্র : সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

খ) বেগুনের কাটুই পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: কীড়া অবস্থায় এই পোকা দিনের বেলা মাটির ফাটলে বা গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাতের বেলা বের হয়ে চারা গাছের গোড়ায় মাটি বরাবর কেটে দেয়। বেঁচে থাকার জন্য যা খায় তার চেয়ে বেশি কেটে নষ্ট করে। তীব্র আক্রমণে ক্ষেত প্রায় চারা শূন্য হয়ে পড়ে।

চিত্র : বেগুনের কাটুই পোকার ক্ষতির লক্ষণ

দমন ব্যবস্থা

- সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশে পাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ দেখা গেলে সেচ দিতে হবে, এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মুখ) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার।

গ) বেগুনের কাঁটালে পোকা

ক্ষতির ধরণ: দলবদ্ধভাবে আক্রমন করে। আক্রান্ত পাতার সবুজ আংশ খেয়ে জালিকার মত ঝাঁঝরা করে ফেলে। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রমন বেশি হলে গাছ মারা যায়।

চিত্র : পুর্নাঙ্গ কাঁটালে পোকা

চিত্র : ক্ষতির নমুনা

দমন ব্যবস্থা

- শতকরা ১০ ভাগ পাতা পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ২০ গ্রাম) ৫ শতক জমির জন্য ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। অথবা প্রতি লিটার পানিতে সুমথিয়ন ২মি.লি. মিশিয়ে স্প্রে করা।

ঘ) বেগুনের জাব পোকা

ক্ষতির ধরণ: পূর্নাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা গাছের পাতা, কচি কাণ্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়ে যায়, পাতা কুচকে যায়। ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমন হলে ফুলের কুঁড়ি ঝরে পড়ে । আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মারা যায়।

চিত্র :জাব পোকায় আক্রান্ত পাতা

চিত্র : হলুদ ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

- গাছের আক্রান্ত অংশ অপসারণ করা। প্রাথমিক অবস্থায় শুকনো ছাই প্রয়োগ করা ।
- পরিস্কার পানি জোরে স্প্রে করা।
- ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা ।
- হলুদ রঙের ফাঁদ ব্যবহার করা। হলুদ ফাঁদ মূলত বিভিন্ন পোকার উপস্থিতি (বিশেষত জাব পোকাসহ অন্যান্য ছোট পোকা) ও পরিমাণ বোঝার জন্য এবং দমনে ব্যবহার করা হয়। ফসলের ক্ষেতে আঠা মিশ্রিত হলুদ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয়। পোকা সেখানে উড়ে এসে পড়ে এবং আঠাতে আটকে যায়। পরে পানিতে কাপড় ধুয়ে নিলে সব পোকা মারা যায়। কাপড়টিতে পুনরায় আঠা/ভাতের মাড় লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়।
- তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার নির্যাস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা ।
- আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বেগুনের রোগ ও দমন পদ্ধতি

ক) ঢলে পড়া বা গোড়া ও মূল পচা (Damping off or foot and root rot) রোগ: বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: এই রোগটি নার্সারীতে হয়ে থাকে। এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ অংকুরোদগমের সময় আক্রমণ শুরু করে। পরে চারার শিকড়, কান্ডের গোড়া ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রধান মূলে আক্রমণ করে। আক্রান্ত চারার কান্ডের গোড়ার অংশে ফ্যাকাশে সবুজ ও বাদামী দাগ দেখা যায়। দাগটি কান্ডের উপরের দিকে ও নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চারার গোড়ার আক্রান্ত অংশের কোষ সমূহ পচে যায়। চারা ঢলে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার

- সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজতলা তৈরী করতে হবে।
- বীজ বপনের ২ সপ্তাহ পূর্বে বীজতলা শোধন করতে হবে।

- বীজতলার পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম (প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

খ) ফোমোপসিস ব্লাইট/ফল ও কান্ড পচা (Phomopsis blight/Fruit and stem rot)

রোগ: এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: বীজ, চারা, কান্ড, ডাল, পাতা, ফুল ও ফল এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সাধারণত: নীচের পাতায় প্রথম দাগ দেখা যায়, পরে দাগগুলি স্পষ্ট গোলাকার ও ধুসর বাদামী রং ধারন করে। বেশী আক্রান্ত পাতা হলুদ হয়ে মারা যায়

চিত্র : ফোমোপসিস ব্লাইট/ ফল ও কান্ড পচা রোগ

ও ঝরে পড়ে। ফল গাছে থাকতেই আক্রান্ত হয়। ফলের উপর ফ্যাকাশে কিছুটা বসানো দাগ পড়ে, আক্রান্ত স্থলে বাদামী ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায়।

প্রতিকার

- সুস্থ ও নীরোগ বেগুন হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- কালো ও কুচকানো বীজ ব্যবহার করা যাবে না।
- কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) অথবা কার্বোক্সিন + থিরাম (প্রোভ্যাক্স ২০০ ডব্লিউপি) প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।
- বেগুন পরিবারের সবজি বাদ দিয়ে শস্য পর্যায় (অন্য সবজি চাষ) অবলম্বন করতে হবে।
- এই ছত্রাক আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশসমূহে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে, তাই আক্রান্ত গাছ, ঝড়ে পরা পাতা, ডালপালা একত্র করে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বা প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার জমির সব গুলো গাছে স্প্রে করতে হবে।

গ) ব্যাকটেরিয়া ঢলে পড়া (Bacterial wilt) রোগ: ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: গাছের যে কোন বয়সে রোগটি দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ডাটা খুব দ্রুত ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছ বিকালের দিকে ঢলে পড়ে আবার সকালের দিকে সতেজ হয়। এভাবে ৩-৪ দিন পর সকালেও সতেজ হয় না এবং গাছ সবুজ অবস্থাতেই ঢলে পড়ে ও মরে যায়।

প্রতিকার

- সুস্থ চারা সংগ্রহ করতে হবে ।
- রোগ প্রতিরোধী জাত যেমন- বারি বেগুন ৬, বারি বেগুন ৭, বারি বেগুন ৮ চাষ করতে হবে।
- বুনো বেগুন গাছের কান্ডের সাথে কাংখিত জাতের বেগুনের জোড়কলম করতে হবে।

২০২৪

- শস্য পর্যায়ে বাদাম, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করতে হবে।
- ঢলে পড়া চারা বা গাছ দেখা মাত্র মাটি সহ তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- কিউপ্রোক্স্যাট ৩৪৫ এসসি ১ লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার জমিতে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।
- ব্যাকটেরিয়া নাশক স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট + টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড (ক্রোসিন-এজি ১০ এসপি) প্রতি লিটার পানিতে ০.৮ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার জমিতে গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।

ঘ) বেগুনের ছোট পাতা বা ক্ষুদে পাতা রোগ (Little Leaf of Brinjal): এটি মাইকোপ্লাজামা জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: আক্রান্ত গাছে ছোট ছোট অনেক পাতা হয় এবং পাতাগুলো গুচ্ছ দেখা যায়। জ্যাসিড পোকা এ রোগ ছড়ায়। বেগুন চাষের সময় তাপমাত্রা বাড়লে জ্যাসিড পোকার আক্রমণ বেশী হয়। গাছের বয়স এক মাস হওয়ার পর এ রোগ দেখা যায়। তবে পূর্ণ বয়স্ক গাছে এ রোগের তীব্রতা বেশী হয়।

চিত্র :বেগুনের ছোট পাতা বা ক্ষুদে পাতা রোগ

দমন ব্যবস্থাপনা

- বেগুন পরিবারভুক্ত ফসলের চাষ কমানো।
- আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলা।
- আক্রান্ত গাছের গোড়ায় গাছ প্রতি ২৫৮ গ্রাম চুন মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে গাছ ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠে।
- গাছের বয়স এক দেড় মাস হরে বাহক পোকা (জ্যাসিড) দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে সুমিথিয়ন ১.৫ গ্রাম, এডমায়ার ১.২ মিলি ও এমিটাফ- ২৫ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: ফল সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করতে হবে। ফল যখন পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় অথচ বীজ শক্ত হয় না তখন ফল সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। এ সময় ফলের ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে থাকব। অনেকে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দুই আঙুলের সাহায্যে চাপ দিলে যদি বসে যায় এবং চাপ তুলে নিলে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে বেগুন কচি রয়েছে আর চাপ দিলে যদি নরম অনুভূত হয়, অথচ বসবে না এবং আঙ্গুলের ছাপ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে। সাধারণতঃ চারা রোপণের ৩০ দিনের বেশি সময় পর ফুল আসে এবং এর প্রায় ৩০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফুল ফোটার পর ফল পেতে গড়ে প্রায় ১ মাস সময় লাগে। জাত ভেদে হেক্টর প্রতি ১৭-৬৪ টন ফলন পাওয়া যায়।

খাওয়ার উপযোগী বেগুন ক্ষেত থেকে তোলার সময় সাবধানে সংগ্রহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের গায়ে যেন আঘাত না লাগে বা ক্ষত সৃষ্টি না হয়। গাছ থেকে তোলা বেগুন কাঁচা পাতা অথবা খড়ের উপর রাখতে হবে যেন বেগুনে আঘাত না লাগে; এটা অতি প্রয়োজনীয়।

৪.২ টমেটো

টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ বেগুন পরিবারের একটি প্রধান শীতকালীন সবজি। টমেটো পুষ্টি গুণে ভরা এক ধরনের সালাদ সবজি। বাংলাদেশে যেসব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে টমেটো অন্যতম। সারা বিশ্বে আলুর পরই টমেটো উৎপন্ন হয়। এর কদর মূলত ভিটামিন-সি এর জন্য। তবে এর রঙ, রূপ ও স্বাদ অনেককে আকৃষ্ট করে।

৪.২.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : মধ্য অথবা দক্ষিণ আমেরিকা টমেটোর উৎপত্তি স্থান।

ইংরেজি নাম: Tomato

বৈজ্ঞানিক নাম: *Lycopersicum esculentum*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী অংশে যে পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা হল - পানি ৯৩.১ গ্রাম, প্রোটিন ১.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, খনিজ ০.৬ গ্রাম, আঁশ ০.৭ গ্রাম, শর্করা ৩.৬ গ্রাম, সোডিয়াম ৪৫.৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১১৪ মিলিগ্রাম, কপার ০.১৯ মিলিগ্রাম, সালফার ২৪ মিলিগ্রাম, ক্লোরিন ৩৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৩২০ আর্ন্তজাতিক একক, থায়ামিন ০.০৭ মিলিগ্রাম, রিবোফ্লাবিন ০.০১ মিলিগ্রাম, নিকোটিনিক এসিড ০.৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ৩১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১৫ মিলিগ্রাম, অক্সালিক এসিড ২ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ৩৬ মিলিগ্রাম এবং লৌহ আছে ১.৮ মিলিগ্রাম।

ব্যবহার: টমেটো কাঁচা, পাকা এবং রান্না করে খাওয়া হয়। টমেটোর পুষ্টির পাশাপাশি ভেষজ মূল্যও আছে। এর শাঁস ও জুস হজমকারক এবং ক্ষুধাবর্ধক। টমেটো রক্ত শোধক হিসেবেও কাজ করে। আমাদের দেশে ইহা প্রধানত: সালাদ, ব্যঞ্জনের উপকরণ এবং ঝোল বা টক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি মৌসুমে বিপুল পরিমাণ টমেটো সস, কেচাপ, চাটনি, জুস ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। রাতের তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রী সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগী সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। মাটির পিএইচ (pH) ৬ - ৭ হলে ভাল হয়। মাটির অম্লতা বেশি অর্থাৎ pH কম (৬ এর নীচে) হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

টমেটোর জাত: মৌসুম অনুযায়ী এ দেশে চাষযোগ্য টমেটো জাতসমূহকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে ভাগ করা যেতে পারে:

ক) আগাম জাত: এসব জাত শীতকালেই হয়, তবে আগাম ফলে। আগাম জাতসমূহের বীজ বপন করা হয় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। আগাম জাতসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বারি টমেটো ৪, বারি টমেটো ৫, রোমা ভিএফ, টিপু সুলতান, গ্রেট পেলে, ডেল্টা এফ ১, পুষারুবী ইত্যাদি।

খ) ভরা মৌসুমী জাত: শীতকালে স্বাভাবিক সময়েই এসব জাতের গাছে ফল ধরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বীজ বুনে অক্টোবর-নভেম্বরে এসব জাতের টমেটোর চারা রোপণ করা হয়। এসব জাতের মধ্য থেকে মানিক, রতন, বারি টমেটো ৩, বারি টমেটো ৬, বারি টমেটো ৭, বারি টমেটো ৯, বাহার ইত্যাদি জাতকে বেছে নেয়া যেতে পারে।

গ) নাবী শীত মৌসুমী জাত: এসব জাতের বীজ বুনতে হয় জানুয়ারিতে, ফল পাওয়া যায় মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। বাহার, রোমা ভিএফ, রাজা, সুরক্ষা ইত্যাদি জাত নাবি চাষের জন্য ভাল।

৪.২.২ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ ও বীজতলার মাটি শোধন

টমেটো চাষ করা হয় চারা তৈরি করে। এজন্য বীজতলায় বীজ বুনে সেখানে চারা তৈরি করে নিতে হয়। টমেটো চাষে সফলতার জন্য কেনা বীজ বা ঘরে রাখা বীজ প্রথমে শোধন করে নিতে হবে। সম্ভব হলে বীজতলায় বোনার আগে অংকুরোদগম পরীক্ষাও করে নেয়া উচিত। বীজের মধ্যে অনেকসময় রোগজীবাণু লুকিয়ে থাকে। যেমন আগাম ধ্বসা বা আর্লি ব্লাইট রোগ, মোজাইক ভাইরাস, ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া ইত্যাদি রোগের জীবাণু বীজে থাকতে পারে। মাটিতে ফেলার পর পানি পেয়ে সেসব রোগজীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে চারা মারা যায়। আবার অনেক সময় বীজতলার মাটিতেও কিছু রোগজীবাণু থাকতে পারে। যেমন চারা ধ্বসা বা ড্যাম্পিং অফ রোগের জীবাণু। এসব রোগজীবাণু চারাকে আক্রমণ করতে পারে। সেজন্য বীজতলার মাটিও শোধন করে নিলে ভাল হয়।

বীজ শোধন: বীজ শোধন করা যেতে পারে কয়েক পদ্ধতিতে। গরম পানিতে ভিজিয়ে বীজ শোধন করা সহজ। ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩০ মিনিট টমেটোর বীজ ভিজিয়ে রাখলে বীজের গায়ে লেগে থাকা বা ভেতরে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক মরে যায়। এরপর ভিজে যাওয়া বীজ তুলে ছায়ায় শুকিয়ে বপন করতে হবে। কিছু গাছগাছড়ার রস যেমন রসুনের রস দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। এছাড়া ছত্রাকনাশক দিয়েও বীজশোধন করা যায়।

মাটি শোধন: বীজ তলার মাটি চাষ দিয়ে তাতে জৈব সার মিশিয়ে পলিথিন দিয়ে দু'সপ্তাহ ভাল করে ঢেকে রেখে দিলে সূর্যের তাপে মাটিতে থাকা অনেক জীবাণু মরে যায় ও বীজতলার মাটি শোধন হয়ে যায়। সময়

না থাকলে বীজতলার মাটির উপরে ৩ ইঞ্চি পুরু করে কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে আগুন দিলে সে তাপেও রোগ জীবাণু নষ্ট হয়।

বীজতলা তৈরি: চারা তৈরির দুই মাস আগে বীজ বপনের জন্য বীজতলা তৈরির প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য রোদযুক্ত উঁচু জায়গায় পরিস্কার করে ভালভাবে মাটি চাষ দিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে। চাষের পর মাটি সমতল করে ১ মিটার চওড়া করে বেড বানাতে হবে। বেড খুব বেশি লম্বা না করে ৩-৫ মিটার করা ভাল। এতে পরিচর্যার সুবিধে হয়। বীজ বোনার আগে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এ রকম ২০-২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

বীজ বপনের সময়: শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল-জুন (বৈশাখ-আষাঢ়)।

বীজের হার: বীজতলায় বীজ বপনের ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি ১ গ্রাম (২০০ গ্রাম/হেক্টর) বীজ লাগে। তবে জাত ভেদে বীজের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।

চারা উৎপাদন: সরাসরি জমিতে বীজ বুনে ও টমেটো চাষ করা যায়। তবে দ্রুত ভাল ফলন পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে চারা তৈরি করে সেই চারা মূল জমিতে লাগাতে হবে। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য পরিপক্ক ও রোগমুক্ত বীজ ঘন করে ৩ মি. X ১মি. আকারের বীজতলায় বুনতে হবে। বীজ থেকে চারা গজাতে ৬-১৪ দিন লাগে। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ X ৪ সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে।

৪.২.৩ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

সারের পরিমান: টমেটো উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নরুপ সার প্রয়োগ করতে হবে

সারের নাম	সারের পরিমান/ হেক্টর
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ কেজি
এমওপি	২০০-৩০০ কেজি
গোবর	৮-১২ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক গোবর সার ও সবটুকু টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশী ছাঁটাইয়ের পর চারা লাগানোর ৩য় সপ্তাহে ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ায় প্রয়োগ

২০২৪

করতে হয়। ঘাটতি থাকলে জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড পাউডার এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সারও প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপন: চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারির উপরে চারা থেকে চারা ৪০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম এবং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

রোপণ সময়: শীতকালীন টমেটোর জন্য মধ্য কার্তিক থেকে মাঘের ১ম সপ্তাহ (নভেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি) পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। তবে আগাম চাষের জন্য রোপণ সময় এগিয়ে আনতে হবে। আগাম চাষের জন্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এবং নাবি চাষের জন্য ফাল্গুণ মাসে এবং গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য জন্য চৈত্র-বৈশাখ মাসে চারা রোপণ করতে হবে।

পলিথিন ছাউনি: ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেডে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে। একটি ছাউনি ২০X২.৩ মিটার আকারের হয়। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালাসহ) দুটি বেডে লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবহার করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ছাউনির উচ্চতা হবে দুপাশে ৪.৫ ফুট বা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানে ৬ ফুট বা ১৮০ সেমি। দুটি ছাউনির মাঝে অন্তত ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে করে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। পলিথিন ছাউনি লম্বায় জমির আকার আকৃতির ওপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে কিন্তু চওড়া (বাজারে প্রাপ্ত পলিথিনের সর্বোচ্চ চওড়া অনুযায়ী) ২.৩ মিটার হওয়া বাঞ্চনীয়। ছাউনি ২০ মিটার লম্বা হলে প্রতি হেক্টরে এ ধরনের প্রায় ১৭০টি ছাউনি প্রয়োজন হতে পারে।

চিত্র : পলিথিন ছাউনি

৪.২.৪ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন

একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নিড়ানী দেয়া: প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

আগাছা দমন: টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ: সময়মতো বর্ণিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ছাটাই বা প্রুনিং: এটি এক ধরণের বিশেষ পরিচর্যা। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে এতে ফলের গুণগতমান বাড়ে। মরা পাতা ছাঁটাইসহ 'এ' আকৃতি বাঁশের খুটি দিয়ে ঠেকনা দেওয়া টমেটো গাছের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ।

চিত্র : খুটি দিয়ে দেওয়া টমেটো গাছ (A আকৃতির)

রোগ-বালাই ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা: টমেটো উৎপাদনে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো রোগবালাই। টমেটো রোগগুলো নিয়ন্তণে রাখতে পারলে ফলন অনেক বৃদ্ধি পাবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

(১) গোড়া ও মূল পচা রোগ (Damping off and root rot): বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: বীজে আক্রমণ হলে বীজ পচে যায়। বীজ অংকুরোদগমের পরেই প্রাথমিক পর্যায়ে চারা মারা যায় একে প্রিইমারজেন্স ড্যাম্পিং অফ বলে। পোস্ট-ইমারজেন্স ড্যাম্পিং অফের বেলায় চারার হাইপোকোটাইলের কর্টিক্যাল কোষ দ্রুত কুঁচকে যায় ও কালো হয়ে যায়। চারার কান্ড মাটির কাছাকাছি পচে চিকন হয়ে যায়। কান্ডের গায়ে ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়।

প্রতিকার

- বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে; বীজ ৫০°সে তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৩০ মিনিট রেখে শোধন করে নিয়ে বপন করতে হবে
- রোগের আক্রমণ দেখা দিলে ব্যভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা কিউপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম হিসাবে মিশিয়ে চারার গোড়ায় দিতে হবে।

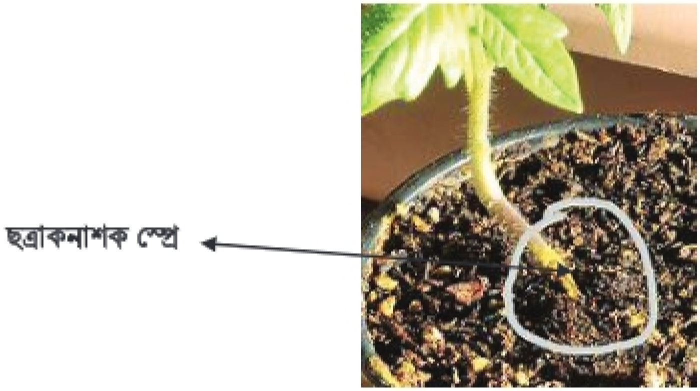

চিত্র : গোড়া পচা রোগ

(২) গাছ বা পাতা কুঁকড়ানো (Leaf curl): এটি ভাইরাস জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: পাতার কিনার থেকে শিরার দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। পাতা খসখসে হয় এবং হলুদ হয়ে যায়, এতে করে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাতা কুঁকড়ানো রোগের তিনটা কারনে হয়ে থাকে। যদি গাছে মাকর ও থ্রিপস্ পোকা থাকে তাহলে গাছ কুঁকড়ে যায় মটিতে এবং জিংক এর ঘাটতি থাকে তখন এটা বেশি দেখা যায়।

চিত্র : গাছ বা পাতা কুঁকড়ানো

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধ জাতের চারা লাগাতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

- গাছ রোপনের ১৫ দিন পর থেকেই আট দিন পর পর ভার্টিমেক ও কনফিডর মিক্সার করে স্প্রে করতে হবে।চারা লাগানোর এক মাস পর থেকে ১৫ দিন পর পর একবার মিমজিংক গোল্ড স্প্রে করতে হবে।

(৩) ঢলে পড়া (Bacterial wilt): এটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: এ রোগের আক্রমনে প্রথমে গাছের উপরের দিকের কিছু পাতা নেতিয়ে পড়ে, দু একদিনের মধ্যে পুরো গাছ ঢলে পড়ে ও মারা যায়। এ রোগে গাছের শিকড়, মূল, কান্ড বা অন্য কোথাও পচন দেখা দেয় না। সাধারনত গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় যখন ফুল ফল আসতে শুরু করে তখন রোগের আক্রমন ব্যাপক হয়।

চিত্র : ঢলে পড়া রোগ

প্রতিকার

- জমি চাষের সময় ব্লিচিং পাউডার ১৫-২০ কেজি/হেক্টর মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে মাটিতে বিদ্যমান ব্যাক্টেরিয়া মারা যায়।
- গাছের চারা লাগানোর আগে চারার গোড়ার অংশ কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক বা অনুমোদিত ব্যাক্টেরিয়া নাশকের দ্রবনে ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে লাগাতে হবে।
- জমিতে চারা লাগানোর আগে মাটিতে চারা লাগানোর স্থানে এক চিমটি ৫-১০ গ্রাম/ পিট ফুরাডান ৫ জি মিশিয়ে দিতে হবে। এতে মাটিতে বিদ্যমান কৃমি ও কাটুই পোকা মারা যাবে।
- জমিতে রোগের আক্রমন দেখা দিলে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না, শুধুমাত্র গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে।
- ইউরিয়া সার কম দিতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত স্থানের মাটি সরিয়ে ফেলে, নতুন মাটি দিয়ে নতুন করে গাছ লাগাতে হবে।
- কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকে ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী উপাদান রয়েছে।

(৪) নাবী ধ্বসা (Late blight): এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ: এ রোগটি গাছের আক্রান্ত অংশ, বীজ, মাটি ও পানি দ্বারা বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমণে হলে টমেটো গাছের পাতায় বিভিন্ন আকারের ভেজা বাদামি বর্ণের দাগ পড়ে। দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি ২০২৪

পেতে থাকে। একটা সময়ে গাছের পাতা পচে যায়। শুষ্ক ও আর্দ্র আবহাওয়ায় পাতার পচন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমনের কয়েক দিনের মধ্যে গাছ মারা যায়। প্রথমে ফলের উপরিভাগে ধূসর সবুজ, পানি ভেজা দাগের আবির্ভাব হয়। ক্রমশ সে দাগ বেড়ে ফলের প্রায় অর্ধাংশ ছড়িয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত অংশ বাদামি হয়ে যায় এবং ধূসর বর্ণের দাগ পড়ে।

চিত্র : নাবী ধ্বসা

প্রতিকার

- এ রোগ দেখা দিলে ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- নীরোগ বীজ ব্যবহার করে চারা তৈরি করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- রোগের লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে রিডোমিল গোল্ড বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ডায়থেন এম-৪৫ প্রভৃতি ৪ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

(১) টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা (Tomato Fruit Borer)

ক্ষতির লক্ষণ: ছিদ্রকারী স্ত্রী পোকা টমেটোর পাতার উপরে ও ফুলের মধ্যে ডিম পাড়ে। এক একটি স্ত্রী পোকা ৫০০টি পর্যন্ত ডিম দিতে সক্ষম। ডিম থেকে কীড়া বের হয়। এ পোকার কীড়াগুলো ফল আসার আগে বিশেষ করে গাছের পাতা ও কচি ডগা খেয়ে বড় হয়। টমেটোর ফল আসার পরে এই পোকার কীড়াগুলি বেড়ে ওঠা ফলের ভিতর ঢুকে শাঁস ও বীজ খেয়ে থাকে। তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এদের আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়।

চিত্র:আক্রান্ত ফল

চিত্র:টমেটোর ফল ছিদ্রকারী পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা

- নিয়মিত পোকাসহ আক্রান্ত পাতা, ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ঝরে পড়া পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে উক্ত পোকার পূর্ণাঙ্গ মথ মেরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ মথকে সহজে নিয়ন্ত্রন করা যায়। প্রতি ১ বিঘা জমিতে ১৫ টি ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যায়।
- আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে সাইপারমেথ্রিন গ্রপের কীটনাশক রিপকর্ড/সিমবুশ ১ মিঃলিঃ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(২) টমেটোর জাবপোকা

ক্ষতির লক্ষণ: পূর্ণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই টমেটোর পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়। এছাড়া জাব পোকা এই জাতীয় ফসলে মোজাইক রোগ ছড়ায়।

চিত্র : জাব পোকা আক্রান্ত পাতা

দমন ব্যবস্থাপনা: জাব পোকার আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক মাত্রানুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন ফসলে জাব পোকা দমনের জন্য একতারা ২৫ ডব্লিউজি কার্যকরী ও অনুমোদিত। (২.৫ গ্রাম একতারা ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে সেপ্র করতে হবে।

৪.২.৭ ফসল সংগ্রহ ও ফলন

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে বাজার জাতকরণের জন্য। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

চিত্র : পরিপক্কতার লক্ষণ **চিত্র : সংগ্রহকৃত টমেটো**

২০২৪

ফলন: জাত ভেদে ফলন ১৫-৫০ টন/একর হয়। মৌসুম, জাত, আবহাওয়া এবং পরিচর্যা অনুযায়ী প্রতি একর জমিতে ৫০ টনের বেশি টমেটো পাওয়া সম্ভব।

৪.৩ মরিচ (Chilli)

মরিচ বাংলাদেশের একটি অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের সব জায়গায়ই এর চাষ হয়। আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে কাঁচা মরিচের বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়ে থাকে। যে কোন বাড়ি/বাসার সামনে বা পিছনে সামান্য জমিতে সারা বছরই মরিচের চাষ করা যায়। বাড়ীর ছাদে বা বারান্দায় টবে কাঁচা মরিচের চাষ করে সারা বছরই কাঁচা মরিচের সুবিধা উপভোগ করা সম্ভব।

৪.৩.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল মরিচের উৎপত্তিস্থান।

ইংরেজি নাম: Chilli / Red pepper

বৈজ্ঞানিক নাম: *Capsicum frutescens*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: ১০০ গ্রাম কাচা মরিচে ২-৩ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ৬ গ্রাম, ৭ গ্রাম আঁশ, স্নেহ ০.৬ গ্রাম, ভিটামিন এ ১০০-২০,০০০ (আই. ইউ.), থায়ামিন ০.০৬ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০৮ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ১.০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৫-২৮০ মিলিগ্রাম এবং পানি রয়েছে ৮০-৮৬ গ্রাম।

ব্যবহার: আমাদের প্রতিদিনের রান্নায় মরিচের স্থান বেশ প্রচলিত। এটি বাংলাদেশের নিত্য ব্যবহৃত মশলা। মরিচ কাঁচা ও পাকা দুই অবস্থায় খাওয়া হয়। মরিচ শুধু মশলা বা রসনা তৃপ্তিতে ব্যবহার হয় না। পরিমিত এবং নিয়মিত খেলে এটি ভিটামিন এ, বি, সি এর যোগান দেয়। এছাড়া হজমশক্তি বাড়ায়, ফুসফুস সুস্থ রাখে, দেহ পুনর্গঠন করে।

জলবায়ু ও মাটি: মরিচ গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর ফসল। ফুল ধারণের সময় ৩৫-৪৫ ডিগ্রী সে তাপমাত্রা মরিচের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বৃষ্টিপাতের আধিক্য এবং মেঘলা আকাশ ফুল ধারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যে মাটিতে বেশি অম্ল আছে সে মাটি ছাড়া সব ধরনের মাটিতে মরিচ জন্মে। মরিচ চাষের জন্য জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ সুনিস্কাসিত দো-আঁশ মাটি সব থেকে উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়।

জাত পরিচিতি: সাধারণত মরিচকে দু ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ঝাল মরিচ ও মিষ্টি মরিচ। বাংলাদেশে ঝাল মরিচের ব্যবহার বেশি। ঝাল মরিচের জনপ্রিয় জাতগুলোর মধ্যে নাগা মরিচ, বগুড়ার মরিচ, বিজলী মরিচ, ফরিদপুরীসহ ইত্যাদি জাত রয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক মৌসুমি জাতগুলো হলো- কামরাংগা,

আকালী, কালো মরিচ, ইত্যাদি। আঞ্চলিকভাবে আরো কিছু জাত রয়েছে, যেমন- বালিঝুরা মরিচ, সাহেব মরিচ, বোম্বাই মরিচ, ধানী মরিচ, পাটনাই, গোলমরিচ। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কতৃক উদ্ভাবিত ৩টি উন্নত জাত রয়েছে। এগুলো হলো বারি মরিচ-১, বারি মরিচ-২, বারি মরিচ-৩।

নাগা মরিচ (সিলেট)

বারি মরিচ-১

বারি মরিচ-২

চিত্র : বিভিন্ন ধরণের মরিচ

৪.৩.২ উৎপাদন পদ্ধতি

৪.৩.২.১ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজ সংগ্রহ: ভাল কোন উৎস হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

মরিচের বীজতলা তৈরি: মরিচের বীজ সরাসরি জমিতে বপণ করা যায় না, যার জন্য বীজতলা তৈরি করে নিতে হয়। বীজতলা তৈরির জন্য আদর্শ মাপ হলো ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া। তবে বীজতলায় চারার সংখ্যার উপর নির্ভর করে মাপ কম বেশি হতে পারে। গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা ১৫ সেঃমি এর বেশি নয় এবং শীতকালীন বীজতলার জন্য ৭-৮ সেঃ মিঃ হতে হবে। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার জন্য গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা বেশি থাকে।

বীজ শোধন: জমিতে বা বীজতলায় বীজ বপণের আগে মরিচের বীজ শোধন করে নিতে হয়। বীজ শোধন করে নিলে চারা অবস্থায় রোগ বালাই কম হয়ে থাকে। নিরোগ চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপণের আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে ২ গ্রাম প্রোভেক্স-২০০ দ্বারা ৩০ মিনিট ভিজিয়ে তারপর ১০-১৫ মিনিট ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।

বীজহার: একবিঘা জমির চারার জন্য ১২০ থেকে ১৩০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

মরিচের বীজ বপনের সময় ও পদ্ধতি: বীজ বপণের উপযুক্ত সময়: বর্ষা মৌসুমের জন্য মার্চ - এপ্রিল মাস এবং রবি মৌসুমের জন্য অক্টোবর - নভেম্বর মাস। মিষ্টি মরিচ রবি মৌসুমেই ভালে জন্মে আর ঝাল মরিচ বছরের সবসময়ই জন্মে থাকে। ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর বীজ থেকে পানি ঝরিয়ে হালকা ছায়াতে শুকিয়ে ঝরঝরা করে বীজতলায় ছিটিয়ে দিতে হবে। মরিচ বপনের সময় মনে রাখতে হবে- বীজ কোনো ক্রমেই যেন ১-১.৫ সে.মি এর বেশি মাটির গভীরে না যায়। মরিচের বীজ সরাসরি বপণ করলে ১৫-২০ সে.মি. পরপর গাছ রেখে পাতলা করে দিতে হবে।

২০২৪

মরিচের চারা তৈরি ও রোপণ: বীজতলায় চারা যখন ১০ সে: মি: লম্বা হয় তখন চারা মুল জমিতে রোপণের উপযোগী হয়। মরিচ ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কারের পরে ৩-৪ টি চাষ এবং মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে চারা রোপণ করতে হয়।

৪.৩.২.১ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: মরিচ চাষের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকে না এবং বর্ষায় পানি উঠে না। জমিতে পানি নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। যে স্থানে প্রচুর রোদ ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে মরিচ চাষের জন্য সেই স্থান নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি: চারা প্রস্তুত হলে মূল জমির আগাছা পরিষ্কার করে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্ততির পর চারা রোপণ করা হয়।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মরিচ চাষে সার প্রয়োগের সময়কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটা চারা লাগানোর পূর্বের সময় এবং অন্যটা চারা লাগানোর পরে। এ দুটি সময়ের করণীয় পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে। মরিচের জমিতে জমি তৈরির সময়/ মরিচের চারা লাগানোর ২০-২৫ দিন পূর্বে প্রতি হেক্টরে গোবর ১০ টন, ইউরিয়া ২৫০ কেজি, টিএসপি ২০০ কেজি এবং এমওপি সার ১৫০ কেজি প্রয়োগ করা হয়। গোবর সারসহ অন্যান্য সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ২৫ দিন পর ৮৫ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫ কেজি এমওপি সার প্রথম উপরি প্রয়োগ করা হয়। লাগানোর ৫০ দিন পর ২য় ও ৭০ দিন পর তৃতীয় কিস্তির উপরি সার প্রয়োগ করা হয়। ২য় ও ৩য় কিস্তির প্রতিবারে ৮৫ কেজি ইউরিয়া ও ৩৫ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করা হয়। প্রতিবার সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। সেচের কয়েকদিন পর মাটিতে চটা ধরে। মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হয় যাতে করে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চারা রোপণ: চারা রোপণে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭০ সে.মি. ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সে.মি. রাখতে হবে। চারা বিকেলে লাগাতে হবে এবং ২-৩ দিন সকাল বিকাল পানি দিতে হবে।

৪.৩.২.৩ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

শূণ্যস্থান পূরণ: কোন গাছ মরে গেলে বা অন্য কোনো কারণে নস্ট হয়ে গেলে ৮-১০ দিনের মধ্যে সেখানে নতুন করে চারা রোপণ করতে হবে।

আগাছা দমন: আগাছা দেখা দিলে সময়মত নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরা করাটা হলো মরিচ গাছের পরিচর্যার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সারের উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা বলা হয়েছে সে অনুযায়ী সার ব্যবহার করতে হবে।

১০১৪

সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: জমিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে ও পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারা লাগানোর পরে হালকা পানির সেচ দিলে চারা সহজেই সতেজ হয়। গ্রীষ্মকালে ৪ থেকে ৫ দিন এবং শীতকালে ১০ থেকে ১২ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। তাছাড়া প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পরে সেচ দেয়া প্রয়োজন। জমিতে বৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে অতিরিক্ত পানি জমিলে অতি দ্রুত তা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে গাছ মরে যেতে পারে। গাছের গোড়ায় অল্প সময়ের জন্য পানি জমে থাকলেও পাতা ঝরতে আরম্ভ করে।

ক্ষতিকর পোকামাকড় ও রোগ দমন

১) ক্ষতিকর পোকামাকড়

বাংলাদেশে মরিচের উৎপাদন কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ। এসব পোকা মাকড়ের মধ্যে রয়েছে চুষি পোকা, লাল মাকড়, সাদা মাছি, জাব পোকা এবং ফলছিদ্রকারী পোকা। এসব পোকামাকড়ের মধ্যে শুধুমাত্র চুষিপোকা ও মাকড়ের আক্রমণের কারণে মরিচের ফলন পরিমাণগতভাবে প্রায় ৭৫-৮০ % হ্রাস পায়। নিম্নে মরিচের কিছু পোকা-মাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হল।

ক) জাব পোকা

ক্ষতির নমুনা: পুর্নাঙ্গ ও বাচ্চা পোকা পাতা, ফুল কচি ফল ও ডগার রস চুষে খায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি ও ফুল, ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়। এ পোকা থেকে নি: সৃত মধুরসে কালো শুটি মোল্ড ছত্রাক জন্মায়। বাতাসে আর্দ্রতা বেশী ও মেঘলা আকাশ থাকলে পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

ব্যবস্থাপনা: আক্রমনের প্রাথমিক অবস্থায় হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা। লেডি বার্ড বিটলের পুর্নাঙ্গ ও কীড়া জাব পোকা খায় বিধায় এদের সংরক্ষণ ও সংখ্যা বাড়ানো গেলে জাবপোকা অতিদ্রুত দমন হয়। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীট নাশক ব্যবহার করতে হবে।

চিত্র : জাব পোকা

খ) মরিচের থ্রিপস

ক্ষতির নমুনা: এরা রস চুষে খায় বলে আক্রান্ত পাতা রুপালী রং ধারণ করে। আক্রান্ত পাতায় বাদামী দাগ বা ফোঁটা দেখা যায়। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায় ও ঢলে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা: সাদা রংয়ের আঠালো ফাঁদ ব্যবহার। ক্ষেতে মাকড়সার সংখ্যা বৃদ্ধি করে এ পোকা দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পারফেকথিয়ন/মেটাসিসটক্স এক চা চামচ ৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র : থ্রিপস পোকা

১০১৪

গ) মরিচের মাকড়

ক্ষতির নমুনাঃ পাতার নীচে থেকে রস চুষে খায় ফলে পাতার শিরার মধ্যকার এলাকা বাদামী রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং কচি পাতার নীচের দিকে বেঁকে পেয়ালা আকৃতির হয়ে যায় ও পাতা সরু হয়। ব্যাপক আক্রমণে পাতা ভেঙ্গে যায়। ফলন ব্যাপকভাবে কমে যায়।

ব্যবস্থাপনা: আক্রমণের শুরুতে হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে নিম তেল ৫ মিলি+৫ মিলি ট্রিকস্ মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র : মরিচের মাকড়

২) মরিচের রোগ ও দমন পদ্ধতি

ক) এনথ্রাকনোজ: এক প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়।

ক্ষতির নমুনা: চারা ও বয়স্ক গাছের পাতা, ডাল, ফুল ফল আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতা ঝরে যায় ও ডগা উপর হতে মরতে শুরু করে। আক্রান্ত গাছ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে, দুর্বল হয়ে যায় ও ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এ রোগের আক্রমণে গাছ বড় হয় না ও আক্রান্ত গাছ দ্রুত মরে যায়। ফলের উপর গোলাকার কাল দাগ পড়ে এবং দাগের চারিদিকে গাঢ় হলুদ রিং বা বলয় থাকে। এ দাগ বৃদ্ধি পেয়ে ফল পঁচিয়ে দেয় ও ঝরে পড়ে।

ব্যবস্থাপনা: সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আক্রান্ত গাছের পরিত্যাক্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে। অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে। ক্ষেতে রোগের আক্রমণ দেখা মাত্র টিল্ট-২৫০ ইসি (০.০৫%) ব্যাভিস্টিন (০.১%) বা নোইন (০.২%) ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

চিত্র : মরিচের এনথ্রাকনোজ রোগ

খ) **ড্যাম্পিং অফ/গোড়া পচা/মুল পচা:** চারা অবস্থায় ছত্রাক দ্বারা এই রোগ ঘটে থাকে।

চিত্র : মরিচের ড্যাম্পিং অফ/গোড়া পচা/মুল পচারোগ

ক্ষতির ধরণ: বীজ বপনের পর পরই বীজ পচে যেতে পারে অথবা চারা মাটি থেকে উঠার পরে চারা গাছ ফ্যাকাশে, লিকলিকে ও দুর্বল হয়। আক্রান্ত গাছ হলুদ রঙ ধারণ করে, গাছের গোড়ার পচন লাগে, শিকড় নষ্ট হয়ে যায়। পরে গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়।

ব্যবস্থাপনা: রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন-এমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

গ) লিফ কার্ল: এক প্রকার ভাইরাসের আক্রমণে এ রোগ হয়।

ক্ষতির নমুনা: যে কোন বয়সের গাছ আক্রান্ত হতে পারে তবে বয়স্ক গাছই বেশী আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়িয়ে যায় ও সাধারণ পাতা অপেক্ষা পুরু হয়। পাতা কুঁকড়িয়ে যায় বলে গাছের সাধারণ বৃদ্ধি ব্যহত হয় ও ফলন কমে যায়। গাছের পর্ব মধ্য ছোট হয় ও গাছ খাট আকারের হয়। ফুল ও ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।

চিত্র : মরিচের লিফ কার্ল

ব্যবস্থাপনা: আশপাশের সোলানেসি পরিবারের (বেগুন জাতীয়) অন্যান্য পোষক উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে। চারা অবস্থা থেকে পারফেকথিয়ন-৪০ ইসি বা টাফগার-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ১ লিটার পানিতে ১ মিলি স্প্রে করে বাহক পোকা দমন করতে হবে।

২০২৪

৪.৩.৩ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা: ফুল আসার পর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়। তবে মরিচের রং লাল হলে তুলে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। প্রতি হেক্টরে কাঁচা ১০-১১ টন ও শুকনো ১.৫-২.০ টন ফলন হয়।

ফসলের পরিপক্কতা নির্ধারণ: মরিচের রং লাল হলে তুলতে হবে।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: মরিচ সাধারণত অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত এবং শুকানো জায়গায় ২৮ সে. তাপমাত্রা ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১ থেকে ২ সপ্তাহ রাখলে মরিচের কোন ক্ষতি হয় না।

চিত্র : মরিচের পরিপক্কতার লক্ষণ

৪.৪ গোল আলু (Potato)

আলু বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফসল। উৎপাদনের দিক থেকে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই চতুর্থ স্থানে আছে আলু। বাংলাদেশে আলু একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল এবং দেশের সর্বত্রই এর চাষ হয়ে থাকে। অনুকূল আবহাওয়া ও বাজারজাতকরণের জন্য কিছু জেলায় এর চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। প্রক্রিয়াজাত আলু বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৪.৪.১ সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি: দক্ষিন আমেরিকা মহাদেশ আলুর আদি বাসস্থান। পেরু, বলিভিয়া, কলম্বিয়া এবং আশে পাশের অন্যান্য দেশের ইনকা নামক জাতি প্রায় আড়াই হাজার পূর্ব হতে আলুর চাষ করত বলে জানা গেছে।

২০২৪

ইংরেজি নাম: Potato

বৈজ্ঞানিক নাম: *Solanum tuberosum*

গোত্র: Solanaceae

পুষ্টিমান: ভক্ষণযোগ্য অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে ২.০ গ্রাম আমিষ, শ্বেতসার ১৯.৪ গ্রাম, স্নেহ ০.১ গ্রাম, থায়ামিন ০.১১ মিলিগ্রাম, রাইবোফ্লেবিন ০.০২ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৫ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ১৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৯ মিলিগ্রাম এবং ক্যালরী রয়েছে ৮৮ গ্রাম।

ব্যবহার: আলু একটি স্টার্চ বা শ্বেতসার প্রধান খাদ্য এবং ভাতের বিকল্প হিসেবে খাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে আলু সাধারণত সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। বিভিন্ন তরকারির সাথে খেতে খুবই মুখরোচক। পৃথিবীর অন্তত ৪০টি দেশে আলু মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য। আলু সিদ্ধ করে, পুড়িয়ে, ভাজি করে রুটির সাথে, খিচুড়ি ও ভাতের সাথে জনপ্রিয়। এছাড়া চপ, সিংগারা, পুরি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

জলবায়ু ও মাটি: আলু চাষের জন্য তাপমাত্রা ও আলোর প্রভাব খুবই প্রকট, দেখা গেছে ১৫ ডিগ্রি - ২০ ডিগ্রি সে. গড় তাপমাত্রা আলু চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ২০ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রার উপরে গেলে ফলন কমতে থাকে আবার ৩০ ডিগ্রি সে. এ আলু উৎপাদন ক্ষমতা লোপ পায়। আলু ফসল যে কোন মাটিতে হতে পারে। তবে বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম। আলুর মাটি সুনিষ্কাশনযুক্ত, গভীর ও কিছুটা অম্লাত্মক হওয়া চাই। pH ৫.৫-৬.০ এর মধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এতে আলুর জন্য ক্ষতিকর রোগ স্ক্যাভিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

উৎপাদন মৌসুম: বাংলাদেশে সাধারণত নভেম্বর মাসের আগে আলু লাগানো যায় না, কারণ তার আগে জমি তৈরি সম্ভব হয় না। নভেম্বরের পরে আলু লাগালে ফলন কমে যায়।

জাত নির্বাচন: বাংলাদেশে যেসব জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে তা হলো দেশি জাত এবং উচ্চফলনশীল উন্নত জাত। বর্তমানে আলু চাষের মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ জমিতে উন্নত জাতের আলু এবং ৩৫ ভাগ জমিতে দেশি জাতের আলুর চাষ হয়ে থাকে।

১) দেশি জাত: ফলন কম হলেও দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘদিন ঘরে রেখে খাওয়া যায় ও তুলনামূলকভাবে খেতে খুব সুস্বাদু। দেশি জাতের আলু ছোট ও ওজন ৫ থেকে ৪৮ গ্রাম। বর্তমানে বাজারমূল্যে উন্নত জাতের চেয়ে দেশি জাতের আলু বেশি দামে বিক্রি হয়। দেশি জাতসমূহের মধ্যে চল্লিশা, দোহাজারী লাল, লাল পাকরী, লালশীল, পাটনাই, শীলবিলাতী ও সূর্যমুখী।

২) উচ্চফলনশীল: কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এপর্যন্ত আলুর মোট ৯১টি জাত (যার মধ্যে বারি আলু হিসেবে ৮০টি) অবমুক্ত বা বের করেছে। জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে খাবার আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলু, রপ্তানিযোগ্য আলু, রোগ প্রতিরোধী, আগাম আলু ও সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করাযায় এমন আলুর জাত। এদের মধ্য থেকে প্রয়োজন বা চাহিদা মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

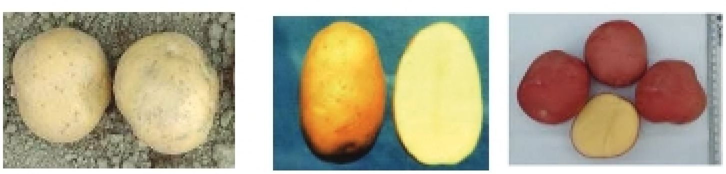

চিত্র : উচ্চফলনশীল আলু

২০২৪

উৎপাদন পদ্ধতি

৪.৪.২. ১ বীজ সংগ্রহ ও চারা উৎপাদন

আলু বীজ সংগ্রহ ও পরিচর্যা: কোল্ড স্টোরেজ থেকে বীজ আলু বের করার পর ৪৮ ঘণ্টা প্রি হিটিং রুমে রাখতে হবে। বীজ আলু বাড়ীতে আনার ২৪ ঘণ্টার মধে বস্তা খুলে ছড়িয়ে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্বাভাবিকভাবেবাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। কারণ বীজ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের করে বস্তা বন্ধ অবস্থায় রাখলে ঘেমে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র : বীজ আলু

বীজ শোধন: কোল্ড স্টোরেজে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু দাঁদ বা স্কাব এবং ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩% বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হয় (১ লিটার পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১০-১৫ মিনিট চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)। পলিথিন সিটের উপর আলু ছড়িয়ে স্প্রে করেও কাজটি করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আলুর সকল অংশ ভিজে যায়।

বীজের পরিমাণ: সাধারণত হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন বীজ আলু রোপণের জন্য প্রয়োজন ।

বীজ তৈরি: অঙ্কুর গজানোর পর ১ম কুঁড়িটি ভেঙ্গে নিতে হবে। কারণ ১ম কুঁড়ি ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্যান্য কুঁড়ি সমান ভাবে বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আলু ফসলের জন্য ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। কেটেও বীজ লাগানো যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কর্তিত অংশে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকে। বীজ লাগানোর ২-৩ দিন পূর্বে আলু কেটে ছায়াযুক্ত স্থানে আর্দ্র আবহাওয়ায় রেখে দিলে কাটা অংশের উপর একটা প্রলেপ পড়ে ফলে মাটি বাহিত রোগ জীবাণু সহজে বীজে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যভাবে পরিষ্কার ছাই মেখেও কাজটি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এক কেজি পরিষ্কার ছাই এর সাথে ১০০-২০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আলু পচন অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

৪.৪.২.২ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচন: উঁচু থেকে মাঝারী উঁচু জমি যেখানে সেচ ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে সেসকল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিটি অবশ্যই রৌদ্র উজ্জ্বল হতে হবে।

জমি তৈরি: মাটিতে জোঁ আসার পর লাঙ্গল বা যন্ত্র চালিত কর্ষণ যন্ত্র পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর দ্বারা গভীরভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে ৪টি চাষ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে বড় মাটির ঢেলা না থাকে এবং মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় থাকে।

৪.৪.৩ সার প্রয়োগ

৪.৪.৩.১ সারের পরিমাণ: দেশের বিভিন্ন স্থানের মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা কতৃক প্রকাশিত "সার সুপারিশ গাইড" অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। স্থানভেদে তা বিএআরসি এর সার সুপারিশ গাইডের সাথে মিল রেখে কম/বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	হেক্টর/কেজি	বিঘা/কেজি	শতক/কেজি
ইউরিয়া	৩২৫-৩৫০	৪৪.৭৮-৪৮.২৩	১.৩২-১.৪২
টিএসপি	২০০-২২০	২৭.৫৬-৩০.৩২	০.৮১-০.৮৯
এমওপি	২৫০-৩০০	৩৪.৪৩-৪১.৩২	১.০২-১.২২
জিপসাম	১০০-১২০কেজি	১৩.৭৮-১৬.৫৪	০.৪০-০.৪৯
জিংক সালফেট	৮-১০কেজি	১.১০-১.৩৮	০.০৩২-০.০৪০
বোরিক এসিড	৬-৯কেজি	০.৮৩-১.২৪	০.০২৪-০.০৩৭
গোবর	১০টন	১,৩৭৮.০০	৪১.০০

৪.৪.৩.২ সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট (প্রয়োজন বোধে) রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে৷ বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে৷ অম্লীয় বেলে মাটির জন্য ৮০-১০০ কেজি/হেক্টর ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য বোরন ৮-১০ কেজি/হেক্টর প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়৷

৪.৪.৪ চারা রোপণ

রোপণ সময়: বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর মাস) আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে এর আগে এবং পরেও আলু লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে কাংক্ষিত ফলন ও মান অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

রোপণ পদ্ধতি: সারি থেকে সারি দূরত্ব ৬০ সেমি। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব আস্ত আলু বীজের জন্য ২৫ সে.মি. এবং কাটা আলুর জন্য ১০-১৫ সে.মি.।

৪.৪.৫ অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা: আলু উৎপাদনে আগাছা পরিষ্কার, সেচ, সারের উপরি প্রয়োগ, মাটি আলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেওয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যক। সময়মতো সবগুলো কাজ করতে পারলে খরচ কমে আসে, ফলন বেশি হয়। চারা গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার হলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। দুই সারির মাঝে সার দিয়ে কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পর পর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে ভালো হয়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া: আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। জমিতে আলুর গাছ যখন ৫-৬ ইঞ্চি অর্থাৎ ১২-১৫ সেন্টিমিটার হয় তখন দুই সারির মাঝখানের মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে নরম ঝুরঝুরা করে নিতে হয়। এই সময় জমির আগাছা নিধনের কাজও হয়ে যায়।

নরম ঝুরঝুরা মাটি কোদাল দ্বারা টেনে সারিতে গাছের দুই দিকে দেওয়া হয়। এর তিন সপ্তাহ পর গোড়ায় আবার মাটি দিতে হয়। গাছের বৃদ্ধি বেশি হলে আর একবার অর্থাৎ তৃতীয়বারের মতো মাটি দেওয়া হয়। গাছের গোড়ায় এইভাবে মাটি দিলে গাছের আলু পরিণত হবার সুযোগ পায়। মাটি ঠিকমতো দেওয়া না হলে বর্ধিষ্ণু আলু মাটির বাইরে এসে সবুজ রং ধারণ করে। এ রকম আলু খাবার অনুপোযোগী এবং কখনো কখনো তা বিষাক্তও হতে পারে।

চিত্র : আলু গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া

মালচিং:'মালচ' কথার অর্থ মাটি ঢেকে দেয়া। আর এ পদ্ধতিটিকে বলে মালচিং। মূলত পুরোনো, শুকনো বা কাঁচা পাতা, বিচালি বা খড়, কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে মাটি ঢেকে দেওয়ার পদ্ধতিই হলো মালচিং। মালচিং নতুন কোন পদ্ধতি নয়। অনেক আগে থেকেই খরা পরিস্থিতি মোকাবেলায় গাছের বা চারাসহ সবজির গোড়া রসালো রাখতে মালচিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন গ্রামের কৃষকগণই। গ্রামের বেশিরভাগ কৃষকগণ স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে মালচিং করে থাকেন। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে স্থানীয় সম্পদ বা মালচিং উপকরণ কমে যাবার কারণে ও কৃষির আধুনিকীকরণ হওয়ায় বর্তমান দেশে প্লাস্টিক মালচিং-এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমান সময়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদে কৃষকগণ প্লাস্টিক মালচিং বেশি ব্যবহার করছেন। মালচিং এর ফলে ফসলের দ্রুত বৃদ্ধি হয়। তাছাড়া, ভালো ফলনের জন্য মাটি ঢেকে দিয়ে আবাদের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়। মালচিং ব্যবহারের ফলে পানির ব্যবহার কম লাগে।

আগাছা দমন: বীজ বপনের ৬০ দিন পর্যন্ত আলুর ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। আলুর জমিতে আগাছা দমন আলাদাভাবে করার প্রয়োজন পড়ে না। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া ও গোঁড়ার মাটি আলগা করে দেয়ার সময়ই আগাছা দমন হয়ে যায়।

সেচ ব্যবস্থাপনা: এদেশে অনেক চাষী বিশেষ করে যারা দেশী আলুর চাষ করেন তারা আলুর জমিতে সেচের পানি ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু অধিক ফলনশীল আলুর জাতে অধিক সার ব্যবহার করলে আলুর জমিতে পরিমাণ মতো পানি ব্যবহার করা আবশ্যক। আলুর জমিতে সেচ দেওয়া বেশ সুবিধাজনক। সারিতে গাছের গোড়ায় মাটি উঁচু করে দেওয়ার ফলে যে জুলি বা নালার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে দিলেই সারা ক্ষেত পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। বীজ রোপণের পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে সেচ দেওয়া উত্তম, তবে খেয়াল রাখতে হবে ক্ষেতে কোনভাবেই পানি না দাঁড়ায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানিতে নালা/ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত ডুবে যায়। স্টোলন বের হওয়ার সময় ২০-২৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলু রোপণের পর ৩০-৫০ দিনের সময়ে জমিতে কোন অবস্থায় রসের ঘাটতি এবং ৬০-৬৫ দিনের পর রসের আধিক্য হতে দেয়া যাবে না। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গুটি বের হওয়া পর্যন্ত এবং পরে আলু বৃদ্ধির সময় তৃতীয় বার সেচ দিতে হবে। জমি থেকে আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে মাটি ভেদে সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। এতে আলুর পূর্ণতা প্রাপ্তি হবে।

আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগ এবং সমন্বিত দমন ব্যস্থাপনা

আলু বীজ জমিতে বপন থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর রোগ দ্বারা আলু গাছ ও বীজ আলু আক্রান্ত হয়। আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগের মধ্যে আগাম ধবসা, নাবি ধ্বসা, ঢলে পড়া, দাঁদ, স্কাব বা ষ্টেম ক্যান্কার, আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ এবং বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগহলো অন্যতম। এসমস্ত রোগদমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কৃষক পর্যায়ে আলুর লাভজনক উৎপাদন ব্যাহত হয়। নিম্নে কয়েকটি রোগের লক্ষণ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থপনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. আলুর আগাম ধ্বসা রোগ (Early blight of potato)

ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়। এটিকে আলুর মড়ক রোগও বলে। আলুর টিউবার, পাতা ও কান্ড এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

লক্ষণ: আক্রান্ত গাছের পাতায় কিছু কিছু স্থানে বৃত্তাকার অথবা গরুর চোখের মনির মতো দেখতে দাগ সৃষ্টি হয়। দাগ গুলো কালো বা বাদামি রঙের হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের কান্ডতে ও এ ধরনের দাগ সৃষ্টি হয়। বয়স্ক পাতায় এই লক্ষণ প্রথমে দেখা যায়। রোগের ফলে আলুর আকৃতি ছোট হয়ে যায় ও ফলন কমে যায়।

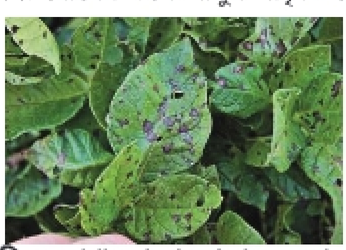

চিত্র : আগাম ধ্বসা রোগের লক্ষণ

প্রতিকার: সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ।সময়মত সেচ প্রদান। পাতায় দাগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

২. আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ (Late blight of potato)

এ রোগকে পটেটো ব্লাইট বা আলুর মড়কও বলে। ছত্রাক এ রোগের জন্য দায়ী। যেসব এলাকায় বাতাসে আর্দ্রতা বেশি এবং তাপমাত্রা ৪ থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৪০-৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) সেসব এলাকায় এ রোগ বেশি হয়। তবে গরম কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়ায় এ রোগের বিস্তার কমে যায়। এ রোগে আক্রান্ত আলু গাছ দুই সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়।

চিত্র : আলুর বিলম্বিত ধ্বসা রোগ

লক্ষণ: আক্রান্ত গাছের পাতায় বা কান্ডে কালো ও পানি শোষণকারী ফোস্কা সৃষ্টি হয়। এ ফোস্কাগুলোতে সাদা স্পোর দেখতে পাওয়া যায় যা বাতাস বা পানির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মহামারী আকার ধারণ করলে সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা, বোঁটা এবং শাখায় ক্ষত দেখা দেয়। গোল বা অনিয়মতি আকৃতির এ ক্ষতের রঙ হতে পারে ঘন সবুজ, বেগুনী ও কালো।

প্রতিকার: রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ৪ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ রোগের জীবাণু শরীরে পুরো দেয়াল তৈরি করে কয়েক মৌসুম পর্যন্ত মাটিতে টিকে থাকতে পারে। এ কারণে এ জীবাণু নির্মূল করা কঠিন। তাই এ ছত্রাক প্রতিরোধী জাত আবাদ করাই সবচেয়ে ভালো।

৪. আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ (Hollow heart of potato)

অতি পরিমানে সেচ, মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন সারের ব্যবহার হলে এবং তাপমাত্রা ঘনঘন পরিবর্তনের ফলে এ রোগ দেখা দেয়। এ রোগ আলুর টিউবারের কেন্দ্রে আঁকাবাঁকা অনিয়ত আকৃতির ফাঁপা অংশ সৃষ্টি করে। আলুর বীজ সঠিক সময়ের পুর্বে বপনের ফলে এ রোগ হয়।

চিত্র : আলুর অন্তর ফাঁপা রোগ

কারণ: কোনো জীবাণুর কারণে এ রোগ হয় না। মূলত আলুর কন্দ বড় হওয়ার সময় ঠিকমতো মাটিতে রস না পেলে বা অনিয়মিত রস পেলে অথবা আবহাওয়াগত কারণে আলুর ভেতরে এ সমস্যা তৈরি হতে পারে। আলু বড় হওয়ার সময় মাটিতে পানির অভাব হলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও স্ট্রেস তৈরি হয়। অতিরিক্ত পানি বা বেশি শুষ্কতার কারণেও এমন হতে পারে। পানির অভাবের পর হঠাৎ করে প্রচুর পানি পেলে হঠাৎ করে আলু দ্রুত বড় হতে শুরু করে। তখন কেন্দ্রস্থলে ফাঁকা রেখে শরীরে বাড়ে আলু।

প্রতিকার: সঠিক সময়ে ও দূরত্ব বজায় রেখে বীজ বপন। পরিমিত পরিমাণে সেচ প্রদান ও সার প্রয়োগ।

আলুর পোকামাকড়: আলুর পোকা মাকড়ের মধ্যে কাটুই পোকা, জাব পোকা, সুতলি পোকাই প্রধান।

১) আলুর কাটুই পোকা: কাটুই পোকার কীড়া চারা গাছ কেটে দেয় এবং কন্দ ছিদ্র করে আলু ফসলের ক্ষতি করে থাকে। পোকার কীড়া দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে।

চিত্র : আলুর কাটুই পোকা

প্রতিকার: কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি না হলে কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত। কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি হারে ডারসবান ২০ ইসি মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। আলু লাগানোর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে।

২) আলুর জাব পোকা: পূর্ণ বয়স্ক জাব পোকা ও বাচ্চা উভয় অবস্থায় ক্ষতি করে পোকা পাতা, কান্ড ও ডগা থেকে রস চুষে খায়। এই পোকা আলুর বিভিন্ন ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

চিত্র: আলুর জাব পোকা

প্রতিকার: আলু বীজ উৎপাদনের জন্য আলু ক্ষেতের জাব পোকা দমন করতে হবে। পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৩ থেকে ৪ মিলি নিমবিসিডিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বালাইনাশক হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন বা এসাটাফ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪.৬ ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

৪.৬.১ পরিপক্বতার লক্ষণ: যখন দেখা যাবে আলু গাছগুলো হলুদ হয়ে মরে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে। সাধারণত আলু বীজ লাগাবার ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যেই এ আলু তোলা যায়।

আলু উঠানো/ সংগ্রহ: শুষ্ক, উজ্জ্বল ও ভালো আবহাওয়াতে আলু উত্তোলন করতে হবে। এক সারির পর এক সারি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে উঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আলু উঠানোর পর প্রখর রৌদ্রে রাখা যাবে না। মাঠে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে কাটা, ফাটা, আংশিক পচা আলু বাতিল হিসাবে পৃথক করতে হবে যেন ভাল আলুর গাদার সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। মাঠে বস্তায় অথবা চট দ্বারা আবৃত ঝুড়িতে ভরে সতর্কতার সাথে অস্থায়ী শেডে পরিবহন করে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর বস্তা বা ঝুড়ি আছড়িয়ে ফেলে আলু ফেটে বা আলুর ছাল উঠিয়ে থেতলিয়ে ফেলা না হয়। কেননা আলু থেতলিয়ে গেলে সংরক্ষণ করার সময় পচে যায়।

আলু সংরক্ষণ: সর্টিং-গ্রেডিং করার পর আলু নির্দিষ্ট সাইজের বস্তায় (৮০/৫০কেজি) করে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ আলু অবশ্যই কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কিছু পরিমাণ খাবার আলু উন্নত পদ্ধতিতে জাত ভেদে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণ: গোল আলু সংরক্ষণের এটি একটি আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থায় খাবার ও বীজ এই দুই শ্রেণীর আলুই দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যায়। হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ ইট দ্বারা নির্মিত একটি দালান ঘর যাতে শীতলতা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এজন্য এই ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন এর দেয়াল ও ছাদে কোথায়ও কোনো ফাঁক না থাকে; তবে এমন নিয়ন্ত্রিত ফাঁক থাকে যার মাধ্যমে ভিতরের গরম আবহাওয়া এক্সজস্ট পাখার সাহায্যে বের করে দেওয়া যায়।

হিমাগারের তাপমাত্রা বীজ আলুর জন্য ৩.৩-৪.৪ ডিগ্রি সে. এবং খাবার আলুর জন্য ১২.৭-১৫.৫ সে. হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিমাগারের অভ্যন্তরে বাতাসের আদ্রতা ৮০%-৯০% হবে। আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারকে কয়েকটি কক্ষে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি কক্ষে উপর্যুপরি কয়েকটি মাচান (বাঁশের অথবা কাঠের) তৈরি করা হয় যাতে অধিক আলু গুদামজাত করা যায়।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণ: কৃষকরা সাধারণত হিমাগার অর্থাৎ কোল্ড স্টোরেজে আলু সংরক্ষণ করেন। আবার অনেক কৃষক বাড়ীতেই আলু সংরক্ষণ করেন। কিন্তু অনেক সময় সংরক্ষণ পদ্ধতি সঠিক না হওয়ায় আলু পচে

২০২৪

যায়। বাড়িতে আলু সংরক্ষণ করতে হলে আলু সংগ্রহের সময় থেকেই বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় যা নীচে দেওয়া হলো।

১)রোদ্রজ্জ্বল সকালবেলা আলু তুলতে হবে।

২) আলু পরিপক্ক হলে তোলার ৭-১০ দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে গাছ আলাদা করতে হবে।

৩) তোলার সময় কোদাল বা লাঙল দিয়ে সাবধানে আলু তুলতে হবে যাতে আঘাতে আলু কেটে বা থেঁতলে না যায়।

৪) চটের বস্তায় ভরে আলু বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে।

৫) বাড়িতে এনে আলু পরিষ্কার ও শুকনা জায়গায় রেখে আকার অনুযায়ী (বড়, মাঝারি ও ছোট) গ্রেডিং করতে হবে।

সংরক্ষণের আগের কাজ

১) কাটা, ছাল ওঠা, পোকা ধরা ও রোগে ধরা আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।

২) জমি থেকে আলু তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে ৭/৮ দিন ছায়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। একে কিউরিং বলে।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি

১) আলু সংরক্ষণের জন্য বাড়ীতে যে কোনো গাছের ছায়ায় একটি ছনের ঘর তৈরী করতে হবে।

২) মাটি থেকে ১০-১৫ সেন্টিমিটার (এক বিঘত) ওপরে একটি মাচা তৈরী করতে হবে।

৩) মাচা থেকে চাল পর্যন্ত বাঁশের বেড়া দিতে হবে। বাঁশের বেড়া এমনভাবে দিতে হবে যেন উপরের অংশের বেড়াতে যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁক থাকে যাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে।

৪) এভাবে তৈরী ঘরে ১৫০-২০০ মন আলু সংরক্ষণ করা যায়।

৫) সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করতে হবে। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পচা আলু দেখামাত্র ফেলে দিতে হবে।

বাড়িতে আলু সংরক্ষণের সুবিধা

১) বাড়ীতে আলু সংরক্ষণে খরচ কম। ছনের ঘর একবার তৈরী হলে সেখানে অনেক বছর আলু রাখা যায়।

২) কৃষক যে কোনো সময় আলু বিক্রি করতে পারেন। হিমাগারে গিয়ে আলু বের করার ঝামেলা থাকে না।

৩) হিমাগারে আলু নিয়ে যাওয়ার জন্য যাতায়ত খরচ হয় না।

চিত্র : বাড়িতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি

২০২৪

বাড়িতে আলু সংরক্ষণের অসুবিধা

১) হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর চেয়ে বাড়িতে সংরক্ষিত আলুর ওজন কমে যায়।

২) আলু ৬ মাসের বেশী সংরক্ষণ করা যায় না।

আলুর উৎপাদন ও সংরক্ষণ

১) দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫-২০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয়।

২) বাংলাদেশে মোট উৎপাদিত আলুর ৪৮ শতাংশ হিমাগারে সংরক্ষিত হয়।

৩) অবশিষ্ট ৫২ শতাংশ আলু কৃষকগণ বাড়িতে সংরক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু হিমাগারে এবং বাড়ীতে সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছরই আলু ফসলেই ৫০ কোটি টাকারও বেশী অপচয় হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

১) বীজতলায় চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হয়। এ সময় চারাতে ৫-৬টি পাতা গজায়।

২) শীতকালীন বেগুনের জাতকে রেটুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

৩) টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে।

৪) ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই টমেটো সংগ্রহ করতে হবে বাজারজাতকরণের জন্য।

৫) ফুল আসার পর ১৫-২০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়।

৬)বাংলাদেশে মরিচের উৎপাদন কম হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ।

৭) আলু গাছগুলো হলুদ হয়ে মরে যাচ্ছে তখনই বুঝতে হবে আলু তোলার উপযুক্ত সময় হয়েছে।

৮) আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পর গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তুমি সোলানেসী পরিবারের বিভিন্ন সবজীর পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকামাকড় ও রোগবালাই উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগের নাম, লক্ষণ, ফসলের নাম/কোন ফসলে ক্ষতি করে ও প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা উল্লেখ কর।

ক্রমিক নং	ছবি	পোকা/রোগের নাম	লক্ষণ	প্রতিকার/দমন ব্যবস্থা	কোন ফসলে ক্ষতি করে
০১					
০২					
০৩	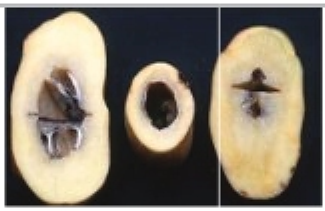				
০৪					
০৫					

২০১৪

০৬					
০৭					

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তোমার পাশের বাড়ির রহিম চাচা তার ৫ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে চায়। নিম্নের প্রশ্নের আলোকে সফলভাবে টমেটো চাষের পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি করো।

১) কোন জাতের টমেটো চাষ করবে?
২) যদি একটি আদর্শ বীজতলার পরিমাপ ৩ মিটার দীর্ঘ ও ১ মিটার প্রস্থ হয় তাহলে ৫ বিঘা জমিতে টমেটো চাষ করতে কতটি আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে?
২) অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী সারের পরিমাণ উল্লেখ করো।
৩) লিফ কার্ল ও ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য কি কি করতে হবে।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বেগুনের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
২. বেগুন চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
৩. ফুল আসার পর কত দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ তোলা হয়।
৪. আলু চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
৫. কোন অবস্থায় টমেটো জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?
৬. মরিচের উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৭. হিমাগারে বীজ আলু রাখার উপযোগি তাপমাত্রা কত?
৮. কোন ধরনের মাটি বেগুন পরিবারের সবজি চাষের জন্য উপযোগী?
৯. চারা তৈরির জন্য বীজতলার আকার কত হলে ভালো হয়?

১০. মাইকোপ্লাজমা দ্বারা হয় বেগুনের এমন একটি রোগের নাম বল

১১. টমোটোর ২টি ভরা মৌসুমী জাতের নাম লিখ

১২. আলু পরিপক্ক হলে তোলার কত দিন আগে আলু গাছের গোড়া কেটে ফেলে গাছ আলাদা করতে হবে?

১৩.কিউরিং কী?

১৪. গ্রেডিং কী?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতি ১০০ গ্রাম টমেটোতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?

২. বেগুন পরিবারের সবজি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা প্রয়োজন?

৩. বেগুনের চারা রোপণের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?

৪. রেটুন কী?

৫. মরিচের বিভিন্ন জাতের নাম লিখ

৬.মালচিং কি? মালচিং এর উপকারিতা লিখ।

৭. আলোর ফাঁদ কী?

৮. হলুদ ফাঁদ সম্পর্কে লিখ?

৯. বাড়ীতে আলু সংরক্ষণের সুবিধা কী?

১০.হলোহার্ট কি? কারণ ও প্রতিকারের উপায় লিখ

১১. আলু ও বেগুনের ব্যবহার লিখ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মরিচের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

২। টমেটা চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা করো।

৩। বেগুনের পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৪। টমেটোর চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। আলু চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা করো।

৬। বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ননা করো।

৭। মরিচের রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা করো।

৮। আলুর আগাম ধ্বসা রোগের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। বেগুন, মরিচ, টমেটো ও আলুর পরিপক্কতার লক্ষণ লিখ।

জব ৪.১: বেগুন/মরিচ/ টমেটোর/ বীজতলা এবং সুস্থ ও সবল চারা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১। বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে পারবে।

২। বীজতলার মাটি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। বীজতলায় বীজ বপন করতে পারবে।

৪। বীজতলার পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। সুস্থ ও সবল চারা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলার স্থান প্রস্তুত করা

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন সনাক্ত ও সংগ্রহ করা

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা

৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে বেগুন, টমেটো, মরিচ, অন্যতম। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। শুরুতেই বীজতলার স্থান নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া উচিত। বীজতলা এমন স্থানে তৈরী করতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়াবে না অর্থাৎ সুনিষ্কাশিত হতে হবে, সর্বদা আলো-বাতাস পায় অর্থাৎ ছায়ামুক্ত হতে হবে। দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলা যতদূর সম্ভব যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব সার, ৪। বীজ, ৫। বালি, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি/চাঁটাই, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। ইটের গুড়া, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। বেগুন/টমেটো/মরিচের/ বীজতলার জন্য অবশ্যই ছায়ামুক্ত উঁচু জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরীর জন্য ৩মিটার লম্বা ও ১মিটার চওড়া করে একটি আয়তকার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।

৩। এবার এর ৪ কোণায় ৪টি খুঁটি পুঁতে চারদিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।তারপর কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ইঞ্চি বা ১৫সেঃমিঃ গভীর করে মাটি খুড়ে তুলে ফেলতে হবে এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরে বীজতলাকে সাজাতে হবে।

ক) সর্বনিম্নস্তর: প্রায় ৭.৫ সে:মি: বা ৩ইঞ্চি পুরাতন সুরকি, ভাংগাইট, পোড়ামাটি ইত্যাদি।

খ) মধ্যস্তর: ৭.৫সে:মি: বা ৩ইঞ্চি দো-আঁশ মাটি ও বালুর মিশ্রণ।

গ) উচ্চস্তর: ৭.৫সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি বেলে-দোআঁশ মাটি, পঁচাগোবর ও কম্পোষ্ট সারের মিশ্রন।

৪। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য সাদা উজ্জ্বল পলিথিন দিয়ে বীজতলা ৩-৪ সপ্তাহ ভালো ভাবে বায়ুরোধ করে ঢেকে রাখতে হবে। সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে ভেতরের জীবাণু মারা যাবে।

৫।শীতকালের জন্য বীজতলা সামান্য (৪-৫সেঃমিঃ) উচু এবং বর্ষাকালে একটু বেশি (৮-১০সেঃমিঃ) উচু করে প্রস্তুত করতে হবে।

৬। বীজতলায় রাসায়নিক সার মোটে ও দেয়া যাবে না। তবে জৈবসার বীজতলায় ২-৩ কেজিহারে প্রয়োগ করা উত্তম। এর সাথে ২০-৩০ গ্রাম কার্বোফুরান দিতে হবে।

৭।বীজতলায় বপনের পুর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজশোধন করে নিতে হবে।

৮। বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিস্কার বালি বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজবপন করতে হয়।

৯। বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্রনালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

১০। বাঁশের ফালি দিয়ে বীজতলার উপর ধনুকের মতো বাকিয়ে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর সাদা পলিথিন দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হয়।

১১। চারাগাছে ৪-৬টি পাতা বের হলেই তা রোপনের উপযুক্ত হয়।

সতর্কতা

১। বীজতলার জন্য ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবে না।

২। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। বীজ বপনের সাথে সাথে বীজতলায় সেচ দেয়া যাবেনা।

জব ৪.২: বেগুন/টমেটো/ মরিচ/আলু উৎপাদন কৌশলের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

১। উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবে।

২। জমি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। মূল জমিতে চারা রোপণ করতে পারবে।

৪। ফসলের পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। পরিপক্কতার মানদণ্ড অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে পারবে। ২০২৪

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা ।

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা।

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা।

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা।

৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা ।

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

সোলানেসী পরিবারের সবজিসমূহ যেমন- বেগুন, মরিচ, টমেটো ও আলু আমাদের দেশের জনপ্রিয় সবজি। এই সবজি গুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সি ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান আছে। এই ধরনের সবজিসমূহ চাষের জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উপযোগী। সুনিস্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এটেল মাটি সমৃদ্ধ উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা এই ধরনের সবজি চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৬.৫ সোলানেসী পরিবারের সবজি চাষের জন্য উত্তম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। সুস্থ ও সবল চারা, ৫।মই, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। জৈব বালাইনাশক, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জমি নির্বাচন করতে হবে।

২। ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

৩।সারের পরিমান: টমেটো উৎপাদনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নরুপ সার প্রয়োগ করতে হবে

সারের নাম	সারের পরিমান/ হেক্টর
ইউরিয়া	৫০০-৬০০ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ কেজি
এমওপি	২০০-৩০০ কেজি
গোবর	৮-১২ টন

৪। **সার প্রয়োগ পদ্ধতি:** অর্ধেক গোবর সার ও সবটুকু টিএসপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট গোবর চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান দুই কিস্তিতে পার্শ্বকুশী ছাঁটাইয়ের পর চারা লাগানোর ৩য় সপ্তাহে ও ৫ম সপ্তাহে রিং পদ্ধতিতে চারার গোড়ায় প্রয়োগ করতে হয়। ঘাটতি থাকলে জিপসাম, জিংক সালফেট, বোরিক এসিড পাউডার এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সারও প্রয়োগ করতে হবে।

৫। চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪০ সেন্টিমিটার ।

৬। ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেড়ে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে।

৭। সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে।

৮। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৯। গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়।

১০। মরা পাতা ছাঁটাইসহ 'এ' আকৃতি বাঁশের খুটি দিয়ে ঠেকনা দেওয়া টমেটো গাছের জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি কাজ।

১১। পরিপক্কতার মাত্রা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতা

১।ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবে না।

২। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। অতিরিক্ত পরিপক্ক করে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা।

পঞ্চম অধ্যায়

ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজি চাষ
(Cultivation of Cruciferous Vegetable)

সবজির সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমান বিবেচনা করলে ক্রুসিফেরি পরিবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিবারের কয়েকটি সবজি পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যাপক ভাবে চাষাবাদ করা হয় এদের মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, চিনাকপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে সাধারণত শীতকালে ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজিগুলো যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপি বেশি পাওয়া যায়। এ পরিবারের সবজিগুলো ফাইবার বা আঁশ, ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ বলে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই অধ্যায়ে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপির চাষাবাদ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে-

১. ক্রুসিফেরি গোত্রের চাষযোগ্য সবজি সমূহের নাম ও পরিচিতি উল্লেখ করতে পারবে

২. ফুলকপি, বাধাকপি, ব্রোকলি, ওলকপির পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবে

৩. উপরোক্ত সবজিগুলোর উৎপত্তিস্থল, জলবায়ু, মাটি, বিভিন্ন জাত এবং চাষাবাদের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে

৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় বীজতলা ও জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা উৎপাদন, রোপণ ও আন্ত: পরিচর্যার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে

৫. ফসলের পরিপক্কতার লক্ষণ, ফসল সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষণ কৌশলের বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যাখ্যা দিতে পারবে

২০২৪

৫.১. ফুলকপির চাষ

ফুলকপি শীতের প্রধান জনপ্রিয় সবজি। খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার তরকারি, স্যুপ, বড়া হিসেবে খাওয়া যায়। তবে শীতের সবজি হলেও ফুলকপি এখন গ্রীষ্মকালেও উৎপাদিত হচ্ছে।

চিত্রঃ ফুলকপি

৫.১.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (মরক্কো, সাইপ্রাস, ইতালি) ফুলকপির উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইংরেজি নাম: Cauliflower

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea var botrytis*

গোত্র: Cruciferececae

পুষ্টিমান: ফুলকপিতে যথেষ্ট পরিমাণে সালফার, পটাশিয়াম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এ ছাড়াএর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে আছে পানি ৯০.৮ গ্রাম, আমিষ ২.৬ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, শ্বেতসার ৪.০ গ্রাম, খনিজ লবণ ১.৯ গ্রাম ইত্যাদি।

৫.১.২ জলবায়ু ও মাটি:

ফুলকপির সাথে জলবায়ু বিশেষভাবে তাপমাত্রার সম্পর্ক নিবিড় ও জটিল। ফসল উৎপাদনের সফলতা বা বিফলতা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ফুলকপি চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম। ফুলকপির জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু ভালো। তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম। ফুলকপি চাষের মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। মাটির অম্লতা ৬.০-৬.৫ ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।

৫.১.৩ ফুলকপির জাত

এ দেশে এখন ফুলকপির পঞ্চাশটিরও বেশি জাত পাওয়া যাচ্ছে। শীতকালেই আগাম, মধ্যম ও নাবী মৌসুমে বিভিন্ন জাতের ফুলকপি আবাদ করা যায়। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী জাতও আছে। ফুলকপির বিভিন্ন জাত আছে যেমন –

২০২৪

১. আগাম জাত- অগ্রাহনী, আর্লি পাটনাই, আর্লি স্নোবল জাত। এসব জাতের বীজ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বুনতে হয়।

২. মধ্যম আগাম জাত- পৌষালী, রাক্ষুসী, স্নোবল ওয়াই ইত্যাদি। ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হলো এসব জাতের বীজ বোনার উপযুক্ত সময়।

৩. নাবী জাত- মাঘী, বেনারসি, হোয়াইট মাউন্টেন জাত। এসব জাতের বীজ বোনার উপযুক্ত সময় হলো আশ্বিন-কার্তিক মাস।

এ জাতগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বারি ফুলকপি-১ (রোপা) ও বারি ফুলকপি-২ (অগ্রদূত) নামে আগাম জাতের ফুলকপির দুইটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবিত হয়।

৫.১.৪ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: ফুলকপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত। সমপরিমাণ বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

বীজের হার: এক শতক জমিতে রোপণের জন্য ২ থেকে ২.৫ গ্রাম বীজের চারার প্রয়োজন হয়। সে হিসাবে একর প্রতি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

চারা উৎপাদন: চারায় ৫-৬টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণত ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা হয়।

৫.১.৫ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ফুলকপি চাষের জন্য রৌদ্রময় স্থান নির্বাচন করতে হয়। গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১.০-১.২ কেজি	২৫০-৩০০ কেজি
টি এস পি	০.৬-০.৮ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.০ কেজি	২০০-২৫০ কেজি
বোরাক্স/সোহাগা	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৬০-৮০ কেজি	১৫-২০ টন

সার প্রয়োগ: জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর। তবে পুরো বোরাক্স বা বোরন সার জমি তৈরির সময় দিয়ে দিলেও অসুবিধে নেই।

চারা রোপণ

জাত ও রোপণের সময় অনুযায়ী চারা রোপণের দুরুত্ব নির্ণয় করতে হয়। আগাম জাতের গাছ সাধারণত আকারে ছোট হয়। এগুলো অপেক্ষাকৃত ঘন করে লাগাতে হয়। মূল জমিতে চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট। নাবি জাতের সারি ও চারার মধ্যে যথাক্রমে ৭৫ ও ৫০ সেমি ব্যাবধান রাখা যেতে পারে। চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে অথবা বেঁকে না যেতে পারে। কেননা এর ফলে মাটিতে চারার প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।

চিত্র: সুস্থ ও সবল চারা রোপণ

৫.১.৬ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

চিত্র: অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

২০২৪

বিশেষ পরিচর্যা

ফুলকপি গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। তবে ফুলকপির ফুল সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থায় চারদিক থেকে পাতা টেনে বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে। সূর্যের আলো সরাসরি ফুলে পড়লে ফুলের রং তথা ফুলকপির রং হলুদাভ হয়ে যাবে।

৫.১.৭ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিজনিত সমস্যা

মাটিতে গৌণ পুষ্টি উপাদান বোরন এবং মলিবডেনামের ঘাটতি থাকলে ফুলকপির গাছ সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।বোরনের অভাবে ফুলকপির গঠন ভালো হয় না। ফুলকপির রঙ বাদামি বর্ণের হয়, ফুলকপির ভেতরটা ফাঁপা হয় এবং ফুলকপি পচে যায়।

এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য তিন গ্রাম বোরাক্স (সোহাগা) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার চারা গাছে এক বার, চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর এক বার এবং ৬/৭ সপ্তাহ পর আরেকবার গাছে ভালোভাবে স্প্রে করে দিতে হবে।

মলিবডেনামের অভাবে ফুলকপির পাতা সরু হয়ে যায় ও বেঁকে যায়। কখনও কখনও পাতা কুঁকড়ে যায়। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সোডিয়াম মলিবডেট আধা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বোরাক্সের সঙ্গে স্প্রে করা যেতে পারে।

ব্লানচিং (Blanching)

ফুলকপির ফুল রোদে উন্মোচিত হলে তার বর্ণ হলুদাভ হয়ে যায়। এতে স্বাদ কমে না গেলেও আকর্ষণীয়তা অনেকাংশেই কমে যায়। ফলে ফুলকপির বাজার দরও কমে যায়। কেননা ক্রেতারা সবসময় আকর্ষণীয় ও ধবধবে সাদা ফুলকপি পছন্দ করেন। রোদ থেকে রক্ষা করার জন্য চারপাশের কয়েকটি পাতাকে টেনে এনে যখন ফুল ঢেকে দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই ব্লানচিং বলে। ফসল সংগ্রহের সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ছায়াবৃত থাকলেই কপির সাদা বর্ণ বজায় থাকে।

চিত্র: ফুলকপির ব্লানচিং

৫.১.৮ পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

ফুলকপির লেদা পোকা: পোকা গাছের কচি পাতা, ডগা ও পাতা খেয়ে নষ্ট করে।

প্রতিকার

১। পোকার ডিম ও লেদা হাত দারা বাছাই করতে হবে।

২। ফুলকপি চাষের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। পোকার আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা। যেমন- সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফুলকপির কাটুই পোকা: কাটুইপোকার কীড়া চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়।

প্রতিকার: জমিতে সন্ধ্যার পর বিষটোপ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ (১ কেজি চালের কুঁড়া বা গমের ভূসির সাথে ২০ গ্রাম সেভিন নামক কীটনাশক পানি বা চিটাগুড়ের সাথে ব্যবহার করতে হবে ।

চিত্র: ফুলকপির লেদা পোকা

চিত্র: ফুলকপির কাটুই পোকা

চিত্রঃ ফুলকপির জাবপোকা

চিত্র: ফুলকপির গোড়া পচা রোগ

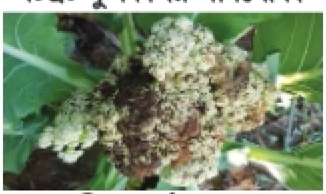

চিত্র: ফুলকপির কার্ড বা মাথা পচা রোগ

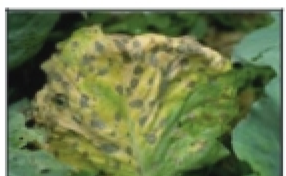

চিত্র: অল্টারনারিয়া স্পট বা পাতায় দাগ রোগ

২০২৫

ফুলকপির জাবপোকা: জাবপোকা গাছের পাতা ও কচি ডগার রস শুষে খায়।

প্রতিকার

১। ফুলকপি চাষের জমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। জৈব বালাইনাশক ব্যবহার। যেমন- নিম পাতার রস, আতা গাছের পাতার রস, সাবানের গুড়া পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যায়।

৩। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক দিতে হবে। যেমন-ইমিডাক্লোপ্রিড (টিডো /ইমিটাফ) ০.৫ মিলি/লিটার পানি অথবা সবিক্রন ১ মিলি/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফুলকপির গোড়া পচা রোগ

লক্ষণ

১। আক্রান্ত চারার গোড়ার চারদিকে পানিভেজা দাগ দেখা যায় ।

২। আক্রমণের দুইদিনের মধ্যে চারা গাছটি ঢলে পড়ে ও আক্রান্ত অংশে তুলার মতো সাদা মাইসেলিয়াম (ছত্রাক) দেখা যায় ও অনেক সময় সরিষার মত ছত্রাকের অনুবীজ পাওয়া যায়।

৩। শিকড় পচে যায়, চারা নেতিয়ে পড়ে গাছ মারা যায় ।

৪। স্যাতস্যাতে মাটি ও মাটির উপরিভাগ শক্ত হলে রোগের প্রকোপ বাড়ে ।

৫। রোগটি মাটি, আক্রান্ত চারা ও পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে ।

৬। চারা টান দিলে সহজে মাটিথেকে উঠে আসে।

প্রতিকার

১। পরিমিত সেচ ও পর্যাপ্ত জৈব সার প্রদান করা ও পানি নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা রাখা।

২। সরিষার খৈল প্রতি হেক্টরে ৩০০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

৩। প্রতি লিটার পানিতে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রোভরাল ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে মাটিসহ ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফুলকপির কার্ড বা মাথা পচা রোগ

লক্ষণ

১। ফুলকপির কার্ডে প্রথমে বাদামি রঙের গোলাকৃতি দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে একাধিক দাগ মিশে বড় দাগের সৃষ্টি করে।

২। ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে কার্ডে দ্রুত পচন ধরে নষ্ট হয়ে যায়।

৩। আক্রান্ত কার্ড বা মাথা থেকে খুব কম পুষ্পমঞ্জরি বের হয়। ফলে এটি খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

প্রতিকার

১। সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

২। বীজ বপনের আগে প্রোভ্যাক্স বা নোইন প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

৩। কার্বেন্ডাজিম ছত্রাকনাশক ০.২% হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, ওষুধ প্রয়োগের ৫ দিন পর পর্যন্ত ফসল তোলা যাবে না।

অল্টারনারিয়া স্পট বা পাতায় দাগ রোগ

লক্ষণ

অল্টারনারিয়া ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। চারা অবস্থায় এই রোগের আক্রমণ হলে চারা গাছ খাটো হয়ে যায় বা মরে যায়। চারা রোপণের পর গাছ আক্রান্ত হলে পাতায় প্রথমে আলপিনের মাথার মতো বিন্দু বিন্দু বাদামি রঙের দাগ পড়ে। পরবর্তীতে দাগগুলো বড় হতে হতে ৫ সেমি ব্যাস পর্যন্ত হলদে রং ধারণ করে পরে ধীরে ধীরে দাগসমূহ গোলাকার চাক চাক বাদামি রঙের দাগে পরিণত হয়।

প্রতিকার

১। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বপনের আগে কার্বেনডাজিম প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে দিতে বীজ শোধন করতে হবে।

৩। সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।

৪। রোগের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

৫.১.৯ কপি জাতীয় ফসল চাষে রোগ আক্রমণের পূর্বে করণীয়

১. একই জমিতে বার বার কপি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না;

২. দিনের বেশির ভাগ সময় ছায়া পড়ে এমন জমিতে কপি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না;

৩. পরিমিত সেচ ও পর্যাপ্ত জৈব সার প্রদান করা ও পানি নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখা;

৪. সরিষার খৈল ৩০০ কেজি/ হেঃ হারে জমিতে প্রয়োগ করা;

৫. বীজতলায় হেঃ প্রতি ২.০ টন ভার্মি কম্পোস্ট বা ট্রাইকো-কম্পোস্ট ব্যবহার করা;

৬. রোদ-তাপ, গরম পানি, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে মাটি শোধন করতে হবে;

৭. লাল মাটির ক্ষেত্রে শতাংশ প্রতি চার কেজি হারে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে (প্রতি তিন বছরে একবার);

৮. বীজ বপনের আগে বীজ শোধন করার জন্য বীজতলায় খড় বা ক্ষেতে শুকনো কাঠের গুড়া ৩ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে পোড়ানো;

৯. বপনের আগে প্রতি কেজি বীজে ২-৩ গ্রাম প্রোভ্যাক্স মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৫.১.১০ ফসল সংগ্রহ ও ফলন

রোপণের আড়াই থেকে তিন মাস পর ফুলকপি সংগ্রহ করতে হবে। সাদা রঙ ও আঁটো সাঁটো থাকতে থাকতেই ফুলকপি তুলে ফেলা উচিত। মাথা ঢিলা ও রঙ হলদে ভাব ধরলে দাম কমে যায়। একর প্রতি ফলন ১৫-২৫ টন, হেক্টরে ৩৫-৬০ টন।

চিত্র: পরিপক্ক ফুলকপি

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।
২। মাটির অম্লতা ৬.০-৬.৫ ফুলকপি চাষের জন্য উত্তম।
৩। সাদা রঙ ও আঁটো সাঁটো থাকতে থাকতেই ফুলকপি তুলে ফেলা উচিত।

৫.২. বাঁধাকপি চাষ

কপি গোত্রের সবজির মধ্যে বাঁধাকপি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর সবজি বাংলাদেশে উৎপাদিত বাঁধাকপির প্রায় সব জাতই বিদেশী ও হাইব্রিড বাঁধাকপি শীতকালীন সবজি হলেও এখন এর কিছু বারোমাসি জাত রয়েছে। "কেকে ক্রস" জাতের বাঁধাকপি গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। এই জাতের প্রতিটি বাঁধাকপির গড় ওজন প্রায় ৬০০-৭৫০ গ্রাম।

চিত্র: বাঁধাকপি

৫.২.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তি : ইউরোপ মহাদেশকে বাধাঁকপির উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
ইংরেজি নাম: Cabbage
বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea var capitata*
গোত্র: Crucifereceae
পুষ্টিমান: প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে ৯১.৯ গ্রাম পানি, ১.৮ গ্রাম আমিষ,০.১ গ্রাম চর্বি, ০.৬ গ্রাম খনিজ, ১.০ গ্রাম আঁশ, ৪.৬ গ্রাম শ্বেতসার রয়েছে। খনিজ লবনের মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম ৩৯ মিগ্রা, ম্যাগনেসিয়াম ১০ মিগ্রা, ফসফরাস ৪৪ মিগ্রা, লৌহ ০.৮ মিগ্রা, সোডিয়াম ১৪.১ মিগ্রা, কপার ০.০৮ মিগ্রা ও সালফার ৬৭ মিগ্রা।

৫.২.৩ জলবায়ু ও মাটি: বাঁধাকপির ভৌগলিক বিস্তার খুব বেশি। বিষুব রেখা থেকে শুরু করে হিমরেখা পর্যন্ত সর্বত্রই এর চাষ হয়। ফুল ধরার পূর্বে খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করা হয় বলে সব দেশেই বছরের কোন না কোন সময় এর চাষ করা যায়। সব ধরণের মাটিতেই বাঁধাকপি চাষ করা যায়। তবে দো-আঁশ বা পলি দো-আঁশ মাটি বাঁধাকপি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। অত্যধিক বেলে মাটি ও লাল মাটিতে বাঁধাকপি ভাল জন্মে

২০২৪

না। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির অম্লতা ৫.০-৬.৫ বাঁধাকপি চাষের জন্য উত্তম।

৫.২.৪ বাঁধাকপির জাত সমুহ

আমাদের দেশে বাঁধাকপি চাষের জন্য নানান ধরনের জাত রয়েছে। এ সকল জাতগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। আগাম জাত
২। মধ্যম জাত
৩। নাবী জাত।

আগাম জাত

আগাম জাতগুলো হলোঃ কে কে ক্রস, সুপার গ্রীন এফ-১, ইপসা বাধাকপি-১ জাত।

মধ্যম সময়ের উপযোগী জাত

মধ্যম সময়ের উপযোগী জাতগুলো হলো: এটলাস ৭০, কে ওয়াই ক্রস, প্রভাতী ইত্যাদি।

নাবী জাত

নাবী জাতগুলো হলো: লিও ৮০, সেভয়, ড্রাম হেড ইত্যাদি।

বীজ উৎপাদনের জাত

বীজ উৎপাদনের জাতগুলো হলো: বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী), বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত), ইপসা বাঁধাকপি-১ ইত্যাদি।

৫.২.৫ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: বাঁধাকপির চারা প্রথমে বীজতলায় উৎপাদন করতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার জন্য বালি, মাটি ও জৈবসার ভালাভাবে মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে নিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার পাশে ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিত।

বীজের পরিমান: জাত ভেদে শতক প্রতি ১.৫-২ গ্রাম বীজ লাগে।

বীজ বপন সময়: আগাম জাতের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র থেকে ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্যম জাত আশ্বিন-কার্তিক থেকে কার্তিক-আগ্রহায়ণ এবং নাবি জাতের জন্য অগ্রহায়ণ-মধ্য পৌষ থেকে পৌষ-মধ্য মাঘ।

৫.২.৬ জমি তৈরি ও চারা রোপণ

জমি তৈরি: বাঁধাকপি চাষ পদ্ধতি এর জন্য প্রধান কাজ হলো জমি তৈরি করা। জমি তৈরির জন্য গভীর ভাবে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। শেষ চাষের সাথে জমিতে প্রয়োজনীয় সার সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। জমি তৈরি হয়ে গেলে মাটি থেকে ১৫-২০ সে.মি. উঁচু ও এক মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করে নিতে হবে। বেড থেকে বেডের মাঝখানের দুরত্ব কমপক্ষে ৩০ সে. মি. রাখতে হবে এবং বেডের মাঝে নালা রাখতে হবে।

চারা রোপণ: চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপন করতে হবে। রোপণের জন্য সারি থেকে সারির দুরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪৫ সেন্টিমিটার দিলে ভাল হয়। প্রতি শতকে ১৫০টির মত বাঁধাকপির চারার প্রয়োজন হয়।চারা বিকেল বেলাতে জমিতে রোপণ করতে হয়।

৫.২.৭ সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১ কেজি	৩৫০ কেজি
টি এস পি	০.৮ কেজি	২৫০ কেজি
এমওপি	০.৬৫ কেজি	২৫০ কেজি
বোরাক্স/সোহাগা	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৫০-১০০ কেজি	৫-১০.০ টন

সম্পূর্ণ গোবর ও টি এস পি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এম ও পি সার ২ কিস্তিতে চারা রোপণের ২০ থেকে ২৫ দিন পর একবার এবং ৩০ -৪০ দিন পর আর একবার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার দেওয়ার পরপর হালকা সেচ দিতে হবে।

৫.২.৮ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনায়

সেচ: বাঁধাকপি গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হবে। এতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন পানি বেশি সময় ধরে জমে না থাকে।

আগাছা: সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।চারা অবস্থা থেকে বাঁধাকপির মাথা বা হেড গঠনের পূর্ব পর্যন্ত ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ: অতি বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.২.৯ পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা:

পোকামাকড়

কপির লেদা পোকা

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কপির কাটুই পোকা

আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

জাব পোকা

হলুদ রং এর আঠালো ফাদ ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক যেমন এডমায়ার ৭-১০ মিলিলিটার / ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

রোগবালাই

মোজাইক ভাইরাস রোগ

জমিতে সাদা মাছি দেখা গেলে (বাহক পোকা) ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার) ১০ মি.লি./ ২ মুখ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে।

বাঁধাকপির অল্টারনারিয়া জনিত পাতার দাগ রোগ

ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমনঃ রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পর ১৫ দিনের মধ্যে সবজি বিষাক্ত থাকবে তাই এ সময় ফসল তোলা যাবেনা।

গোড়া পচা রোগ/ ডেম্পিং অফ

কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রানাশক যেমনঃ এমকোজিম ৫০; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি/ ২ মুখ ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

সতর্কতা

বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়তে হবে এবং নির্দেশাবলি মেনে চলতে হবে। ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধাণ করতে হবে। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে ৭ থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করতে হবে।

৫.২.৭. ফসল সংগ্রহ, ফলন ও সংরক্ষন

চারা রোপণের ৬০-৯০ দিন পর বাঁধাকপি সংগ্রহ করা যায়। পরিপক্কতার সময় বাঁধাকপির হেড বা মাথা দৃঢ় ও কমপেক্ট হবে এবং হালকা সবুজ রং ধারন করবে। প্রতিটি বাঁধাকপি গড়ে ২.৫ কেজি হয়। ফলন এক শতকে ১৫০-১৮০ কেজি, হেক্টরে ৭৫-৮০ টন, প্রভাতী জাতের ফলন ১০০-১১০ টন/হেক্টর। ফসল তোলার পর ছায়ায় সংরক্ষণ করতে হবে। মাঝে মাঝে পানি ছিটিয়ে দিন। বেশি দিন সংরক্ষণ এর জন্য হিমাগারে রাখতে হবে।

চিত্র: পরিপক্ক বাঁধাকপি

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির পিএইচ ৫.০-৬.৫ বাঁধাকপি চাষের জন্য উত্তম।

২। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপন করতে হবে।

৩। বাঁধাকপির হেড দৃঢ় ও শক্ত এবং হালকা সবুজ রঙ ধারন করলে তুলে ফেলা উচিত।

৫.৩. ব্রোকলি চাষ

ব্রোকলি দেখতে ফুলকপির মতই, তবে রংটা সবুজ। এর বর্ণ সবুজ বলে অনেকেই একে সবুজ ফুলকপি বলে। চাইনিজ খাবারের ব্যবহৃত অন্যতম প্রধান উপকরণ এই সবজি। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের কাছে ব্রোকলি এখনো তেমন পরিচিত নয়। চমৎকার এই সবজিটি এখন বাংলাদেশেই চাষ হচ্ছে এবং এটি দেশের চাইনিজ রেস্টুরেন্টগুলোর চাহিদা মিটিয়ে এখন দেশের বাইরেও রপ্তানি হচ্ছে।পুষ্টির দিক দিয়েও ব্রোকলি অনেক সমৃদ্ধ। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, সি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে এবং এর গন্ধটাও আকর্ষণীয়। ব্রোকলি ফুলকপির মত অত বড় হয়না। নিয়মিত ব্রোকলি খেলে তারুন্যতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: ব্রোকলি

৫.৩.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তিস্থল: ব্রোকলির উৎপত্তি ইতালি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইংরেজি নাম: Broccoli

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea* var *italica*

গোত্র: Crueiferceae

৫.৩.২. পুষ্টিমান

ব্রোকলিতে যথেষ্ট পরমিাণে সালফার, পটাশয়িাম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এ ছাড়াএর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে আছে ৩২ কিলো ক্যালোরি খাদ্যশক্তি, পানি ৯০.৮ গ্রাম, আমিষ ৩.৩ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শ্বেতসার ৫.৫ গ্রাম, আয়রন ১.৬ গ্রাম, খনিজ লবণ ০.২১ গ্রাম ইত্যাদি।

৫.৩.৩. জলবায়ু ও মাটি

সাধারণভাবে যে ধরনের জলবায়ুতে ফুলকপির চাষ হয় সেখানে ব্রোকলিও ভাল জন্মে। তবে ব্রোকলির পরিবেশিক উপযোগিতার সীমা একটু বেশি বিস্তৃত। পানি জমে না এরূপ উঁচুজমি, উর্বর দোআঁশ মাটি হলে ফলন ভালো পাওয়া যায়। ব্রোকলির গাছ ১৫-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভাল জন্মে। ব্রোকলি এপ্রিল মাসের পরেও ভালো ফলন দিতে পারে।দেশের সব অঞ্চলেই ব্রোকলি চাষ করা যেতে পারে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

৫.৩.৪. ব্রোকলির জাত

সাধারণত আঁটসাঁটো মাথার ছোট আঁকারের গাড় সবুজ বা নীলাভ সবুজ রঙের ব্রোকলি জাতের চাহিদা বেশি। উল্লেখযোগ্য জাতগুলো হচ্ছে- প্রিমিয়াম ক্রপ, গ্রিনকমেট, ইতালিয়ান গ্রিন ইত্যাদি।এর সবগুলো জাতই বিদেশ থেকে আমদানি করা। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট বারি ব্রোকলি ১ নামে একটি জাত বের করেছে।

২০২৪

৫.৩.৫. বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: পাতা পঁচা সার বা গোবর সার ১ ভাগ, বালু ১ ভাগ ও মাটি ২ ভাগ মিশিয়ে ব্রোকলির বীজতলা তৈরি করতে হয়। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত ব্রোকলির চারা রোপণ করা যায়। কম বয়সের চারা দ্রুত বাড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে যখন বৃষ্টি কমে আসে তখন উঁচু জমি দেখে বীজতলা করা যায়। বীজতলায় ১ মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করতে হবে। বেডের মাটি ভাল করে কুপিয়ে ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করে প্রতি বর্গমিটারে ৪ থেকে ৫ কেজি গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে বেড সমান করে কয়েকদিন রেখে দিতে হবে।

বীজের হার: এক হেক্টর জমির চারার জন্য বীজতলায় ২৫০ থেকে ৪০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। আগাম মৌসুমে বৃষ্টি হলে বীজতলায় পলিথিনের ছাউনি দিয়ে বৃষ্টির সময় চারাকে রক্ষা করতে হবে। চারা রোপনের সময় হিসাব করে চারা উৎপাদন করতে হবে।

চারা উৎপাদন: চারায় ৫-৬টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণত ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা হয়।

৫.৩.৬. জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ব্রোকলি ঠান্ডা আবহাওয়ার ফসল বলে বাংলাদেশে শুধু রবি মৌসুমে এর চাষ হয়। ব্রোকলির চাষ অবিকল ফুলকপির মতোই। সারাদিন রোদ পায় এমন জমি ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। লাঙ্গল বা টিলার দিয়ে মাটি ওলট পালট করে কয়েকদিন রোদে ফেলে রাখতে হবে। সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য বেডে চারা রোপণ করাই ভালো। সেচ দেয়া এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা অত্যন্ত জরুরি।

চাষ দেয়ার সময় শতকে ২৫ থেকে ৪০ কেজি পচা গোবর বা খামারজাত সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটির সব ঘাস, শিকড়, আগাছা, আবর্জনা, পরিষ্কার করে ঢেলা ভেঙে ফেলে সমান করতে হবে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় অবশ্যই পানি দিতে হবে।চারা রোপনের পূর্বে গোড়ার দিকে দু-একটি বড় পাতা কেটে বাদ দিলে চারা কম মরবে।চারার মাথা থেকে নতুন পাতা ছাড়া শুরু হলেই বুঝতে হবে চারা মাটিতে লেগে গেছে এবং নতুন শিকড় ছেড়ে মাটি থেকে খাবার ও পানি গ্রহণ শুরু করেছে।

সার প্রয়োগ

ব্রোকলির জন্য অন্যান্য সার খুবই উপকারী। ইউরিয়া সারের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে ফলন ও বাড়ে। জমি তৈরির সময় ও পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	২.৫ কেজি	২৫০ কেজি
টি এস পি	১.৫ কেজি	১৫০ কেজি

এমওপি	২ কেজি	২০০ কেজি
বোরাক্স	১০ গ্রাম	১০.০ কেজি
গোবর	১৫০ কেজি	১৫ টন

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর। তবে পুরো বোরাক্স বা বোরন সার জমি তৈরির সময় দিয়ে দিলেও অসুবিধে নেই। আর সে সময় দিতে না পারলে পরবর্তীতে ১ম ও ২য় কিস্তিতে সার দেওয়ার সময় প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০-১৫ গ্রাম বোরিক পাউডার গুলে পাতায় স্প্রে করে দেওয়া যায়। তবে সকালে শিশির ভেজা পাতায় যেন দানা সার না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫.৩.৭. চারা রোপণ

চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব দেয়া লাগে ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট। চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে অথবা বেঁকে না যাতে পারে। কেননা এতে মাটিতে চারার প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।

৫.৩.৮. অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

সার দেয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। জমি শুকনো দেখলে সেচ দিতে হবে। সার দেয়ার ঠিক আগে আগাছা নিড়ানো ভালো। এতে সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশতে পারে এবং সারের অপচয় কম হয়। গাছের পাতা পরিপূর্ণভাবে ছড়ানোর পুর্ব পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ব্রোকলি একটি অগভীর মূলী ফসল। তাই গাছের গোড়ার কাছাকাছি মাটি ৫ সেন্টিমিটারের বেশি গভীর করে নিড়ানো যাবেনা। যদি বেড বা জমির মাটি শক্ত হয়ে চটা বেঁধে যায় তবে অবশ্যই নিড়ানি বা কোদাল দিয়ে তা ভেঙে দিতে হবে।

৫.৩.৯. পোকা-মাকড় ও রোগ বালাই দমন ব্যবস্থাপনা

ব্রোকলি চাষের সময় জমিতে পোকার আক্রমণ হতে পারে। পোকা দমনের জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেশে ব্রোকলির সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা হল মাথা খেকো লেদা পোকা। এছাড়াও আরও অন্যান্য পোকার মধ্যে রয়েছে লেদাপোকা, বিছাপোকা, ঘোড়া পোকা ইত্যাদি। ১০১৪

এছাড়া ব্রোকলির বিভিন্ন ধরণের রোগের মধ্যে আছে পাতায় দাগ ও কালো পচারোগ প্রধান সমস্যা। এছাড়া চারা ধ্বসা, মোজাইক, ইত্যাদি রোগ দ্বারা আক্রমণ হয়ে থাকে।

চিত্র: ব্রোকলির জমিতে অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

৫.৩.১০. ফসল সংগ্রহ ও ফলন

সাধারণত ব্রোকলির কেন্দ্রীয় মাথা বা ফুলগুচ্ছটিই তোলা হয়। ফুল ফোটার আগে, যখন শক্ত কুঁড়ি বন্ধ থাকে তখন ব্রোকলি সংগ্রহ করা হয়। তোলার সময় সঠিকভাবে বুঝে ব্রোকলি সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উপযুক্ত সময়ে তোলা না হলে ফুল ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি ফুলগুচ্ছটির ফুল ফুটতে শুরু করে। জাত অনুযায়ী মাথার ব্যাস ১৫ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার হতে পারে। ব্রোকলির গড় ফলণ প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন।

চিত্র: পরিপক্ক ব্রোকলি

পাঠ সংক্ষেপ

১। ব্রোকলি গাছ ১৫- ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভাল জন্মে।

২। তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং মাটির অম্লতা ৫.০-৬.৫ ব্রোকলি চাষের জন্য উত্তম।

৩। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন বা ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা সুস্থ ও সবল চারা মুল জমিতে রোপণ করতে হবে।

৪। ব্রোকলি গাঢ় সবুজ রং ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে।

৫.৪. ওলকপি চাষ

কপি গোত্রের মধ্যে এক অন্যতম সবজি হল ওলকপি। তবে এটি বাংলাদেশে একটি গৌন সবজি। ফুলকপি কিংবা বাঁধাকপির মত ওলকপি এতটা জনপ্রিয় নয়। ওলকপি কান্ড জাতীয় সবজি এবং বেশ পুষ্টিকর।

২০২৪

অন্যান্য কপির তুলনায় খুব কম সময়ে বেশ ফলন পাওয়া যায় এবং সাধারণ অবস্থায় বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের দেশে সাধারনত দুই ধরণের ওলকপি দেখা যায়। তাঁর একটি হল হালকা বা সাদাটে সবুজ এবং অন্যটি হল বেগুনি সবুজ। অনেকেই ভুল করে ওলকপিকে শালগম বলে থাকে কিন্তু শালগম কিছুটা লালচে রঙের মূল জাতীয় সবজি যা মাটির নিচে হয় (চিত্র)।

চিত্র: ওলকপি

চিত্র: শালগম

৫.৪.১. সবজির পরিচিতি

উৎপত্তিস্থল: দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়া ওলকপির উৎপত্তিস্থল।

ইংরেজি নাম: Kohlrabi

বৈজ্ঞানিক নাম: *Brassica oleracea gongylodes*

গোত্র: Crueiferceae

পুষ্টিমান: পুষ্টিমান হিসেবে ১০০ গ্রাম ওলকপির মাঝে ৬.২ গ্রাম শর্করা, ২.৬ গ্রাম চিনি, ৩.৬ গ্রাম আঁশ, ০.১ গ্রাম চর্বি এবং ১.৭ গ্রাম প্রোটিন রয়েছে।

উৎপাদন মৌসুম: আমাদের দেশে শীতকালে ওলকপির চাষ করা হয়ে থাকে।

৫.৪.২ জলবায়ু ও মাটি:

ওলকপি চাষের জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া দরকার। তাপমাত্রা ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলকপি চাষের জন্য উত্তম।তবে দৈহিক বৃদ্বির জন্য ১৫-২০° সে তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। চাষের জন্য সুনিকাশযুক্ত উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমির উর্বর দোআঁশ ও এঁটেল মাটি সবচেয়ে ভালো। মাটির অম্লতা ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ওলকপির জন্য ভাল হয়।

৫.৪.৩ জাত নির্বাচন

আমাদের দেশে বেশ কয়েকধরনের ওলকপির চাষ করা হয়। ওলকপির হালকা সবুজ রঙের জাত আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা এবং বেগুনি রঙের জাত আর্লি পার্পল ভিয়েনা উল্লেখযোগ্য।

চিত্র: আর্লি পার্পল ভিয়েনা জাত

চিত্র: আর্লি হোয়াইট ভিয়েনা জাত

৫.৪.৪ বীজতলা তৈরি ও চারা উৎপাদন

বীজতলা তৈরি: ওলকপির চারা বীজতলায় উৎপাদন করে জমিতে লাগানো হয়। বীজতলার আকার ১ মিটার চওড়া ও লম্বায় ৩ মিটার হওয়া উচিৎ। সমপরিমান বালি, মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে বীজতলা তৈরি করতে হবে।

চারা উৎপাদন: ওলকপির বীজ ভাদ্র-কার্তিক মাস পর্যন্ত বপন করা যায়। বীজতলায় বীজ বপনের পর পরিমানমত জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বা সারি করে বুনতে হবে। চারায় ৫ থেকে ৬ টি পাতা হলেই তা রোপণের উপযুক্ত হয়।

চিত্রঃ ওলকপির চারা

৫.৪.৫ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: ওলকপির জমি ৪-৫ টি চাষ দিয়ে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে করতে হবে। চাষকৃত জমি মই দিয়ে লেভেলিং করে চারা রোপনের জন্য তেরি করতে হবে।

সার প্রয়োগ: ওলকপি চাষ করার সময় জমিতে সঠিক নিয়মে সার দিতে হবে। জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ওলকপি চাষে জমিতে শতকপ্রতি ৬০ থেকে ৮০ কেজি গোবর সার, ৮০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি

১০১৪

ইউরিয়া সার এবং ৪০০ গ্রাম থেকে ৬০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম এমওপি সার, ৭৫০ গ্রাম জিপসাম সার ও ২০গ্রাম জিংক সালফেট বা দস্তা সার দিতে হবে।

চিত্র: জমিতে ওলকপির চারা রোপণ

চারা রোপণ: সাধারনত ৩০ থেকে ৩৫ দিন বয়সের চারা মূল জমিতে রোপণ করা হয়।চারা রোপণের সময় সারি থেকে সারি ৩০ সে: মি: এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২২ সে: মি: করে লাগাতে হবে। চারা রোপণের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন শিকড় মুচড়ে বা বেঁকে না যায়। এতে চারার মাটিতে প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হয় ও বৃদ্ধি কমে যায়।

৫.৪.৬ অন্তঃবর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা ও নিড়ানি: গাছ বড় না হওয়া পর্যন্ত জমির আগাছা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

মালচিং ও গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া: প্রয়োজন অনুসারে জমিতে মালচিং করতে হবে। মালচ হিসেবে খড়কুটা, কচুরিপানা ও পলিথিন ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে যাতে গাছ ঢলে না পড়ে।

পোকামাকড় ও রোগদমন

ওলকপির টোবাকো ক্যাটারপিলার/লেদা পোকা

লক্ষণ

ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

ব্যাবস্থাপনা

১। কীড়াসহ গাছ থেকে পাতা ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলতে হবে।

১০১৪

২। ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়। ৩। চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে আলোর ফাঁদ দিতে হবে।

৪। আক্রমণ বেশি হলে স্পর্শ বিষ যেমন সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানির সাথে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতা

কীটনাশক প্রয়োগের ২ সপ্তাহের মধ্যে খাওয়ার জন্য কোন সবজি সংগ্রহ করা যাবে না।

করণীয়

১। আগাম বীজ বপন করা। ২। সুষম সার ব্যবহার করা।

ওলকপির স্ক্যাব রোগ

লক্ষণ

১। এ রোগের আক্রমণে ওলকপির গায়ে এবড়ো থেবড়ো দাগ পড়ে এবং ওলকপির গায়ে গর্তের সৃষ্টি হয়।

ব্যবস্থাপনা

১। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

২। জমিতে অতিরিক্ত ইউরিয়া ব্যবহার না করা।

৩। জমিতে শতাংশ প্রতি ১৮০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করা।

ওলকপির ইয়োলো মোজাইক রোগ

লক্ষণ

১। এ রোগ হলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। অধিক আক্রমণে গাছে মরে যায়।

ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা।

২। ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবানুমুক্ত রাখা।

৩। আক্রান্ত গাছ আপসারণ করা।

সাবধানতা

১। একই জমিতে বার বার ওলকপির চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

করনীয়

১। আগাম বীজ বপন করা।

২। সুষম সার ব্যবহার করা।

ওলকপির পাতার রিং দাগ রোগ

লক্ষণ: এ রোগ হলে পাতায় ছোট ছোট দাগ পড়ে। দাগগুলো পানি ভেজা বলয় দ্বারা আবৃত থাকে । অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যায়।

চিত্র: ওলকপির পাতার রিং দাগ রোগ

ব্যবস্থাপনা

১। ক্ষেত পরিস্কার/পরিচ্ছন্ন রাখা ।

২। ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখা।

৩। রিডোমিল গোল্ড ১ মিলি. /লি হারে পানিতে শিশিয়ে স্প্রে করা।

সাবধানতাঃ আক্রান্ত জমিতে পুনরায় ওলকপির চাষ করা যাবেনা ।

করণীয়

১। আগাম বীজ বপন করা।

২। সুষম সার ব্যবহার করা ।

৫.৪.৭ সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থাপনা

ওলকপি চাষে প্রচুর পানি লাগে। সারির মাঝের মাটিতে উপরি সার দিয়ে সেই মাটি আলগা করে গাছের গোঁড়ায় টেনে দিলে নালা তৈরি হবে। সেই নালায় সেচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৪.৮ ফসল সংগ্রহ, ফলন ও বাজারজাতকরন

ফসল সংগ্রহ: ওলকপি সঠিক সময়ে গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। ওলকপি কচি থাকতে তোলা উচিৎ। তা না হলে আঁশ হয়ে যায়, স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় এবং বাজারমূল্য কমে যায়।

ফলন: হাইব্রিড জাতের ওলকপিতে হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ৬০ টন ওলকপি পাওয়া যায়।

বাজারজাতকরন: উৎপাদতি ওলকপিগুলো বাজারজাতকরনের জন্য বিশেষ কৌশল নিতে হবে। স্থানীয় বাজারে খুচরাভাবে যত বেশি বিক্রি করা যাবে দাম তত বেশি পাওয়া যাবে, পাইকারিতে বিক্রি করলে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন মধ্যস্বত্বভোগী বেশি মুনাফা না করতে পারে। যতটা সম্ভব দ্রুত বাজারজাতকরনের ব্যাবস্থা করতে হবে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। তাপমাত্রা ৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ওলকপি চাষের জন্য উত্তম।

২। মাটির অম্লতা ৬.০ থেকে ৭.৫ হলে ওলকপির জন্য ভাল হয়।

৩। ওলকপি কচি থাকতে তোলা উচিৎ না হলে আঁশ হয়ে যায় ও স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

এসো নিজে করি

নিচের ছবিগুলো দেখে সবজির নাম লিখ এবং কখন জমি থেকে সংগ্রহ করতে হবে তার পরিপক্কতার মাত্রা উল্লেখ কর।

সবজির নাম	ছবি	পরিপক্কতার মাত্রা
	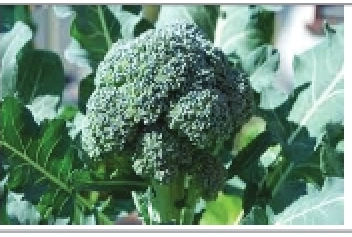	

২০১৪

অনুসন্ধান মূলক প্রশ্ন

তোমার পাশের বাড়ির রহিম চাচা তার ১ বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করতে চায়। এক বিঘা জমি চাষ করতে ৫০০০ চারা দরকার হয়। যদি একটি আদর্শ বীজতলায় (৩ মিটার দীর্ঘ ও ১ মিটার প্রস্থ) ১০০০ চারা উৎপাদন করা যাই তাহলে এক বিঘা জমিতে ব্রোকলি চাষ করতে কতটি আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে?

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফুলকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?
২. ফুলকপি চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
৩. কোন ধরনের মাটি ফুলকপি চাষের জন্য উপযোগী?
৪. ফুলকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
৫. কোন অবস্থায় ফুলকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?
৬. বাঁধাকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?
৭. বাঁধাকপির চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
৮. কোন ধরনের মাটি বাঁধাকপি চাষের জন্য উপযোগী?
৯. বাঁধাকপির চারা তৈরির সীড বেডের আকার কত হলে ভালো হয়?
১০. কোন অবস্থায় বাঁধাকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?
১১. ব্রোকলির উৎপত্তিস্থল কোথায়?
১২. ব্রোকলির চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?

১৩. কোন ধরনের মাটি ব্রোকলি চাষের জন্য উপযোগী?
১৪. ব্রোকলির চারা তৈরির সীড বেডের আকার কত হলে ভালো হয়?
১৫. কোন অবস্থায় ব্রোকলি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?
১৬. ওলকপির উৎপত্তিস্থল কোথায়?
১৭. ওলকপি চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
১৮. কোন ধরনের মাটি ওলকপি চাষের জন্য উপযোগী?
১৯. ওলকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
২০. কোন অবস্থায় ওলকপি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতি ১০০ গ্রাম ফুলকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
২. ফুলকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
৩. ফুলকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
৪. ফুলকপির ব্লানচিং কি এবং কিভাবে দুর করা যায়?
৫. ফুলকপির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।
৬. ফুলকপিতে বোরনের অভাবে কি ক্ষতি হয়?
৭. প্রতি ১০০ গ্রাম বাঁধাকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
৮. বাঁধাকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
৯. বাঁধাকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
১০. বাঁধাকপি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
১১. বাঁধাকপির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।
১২. প্রতি ১০০ গ্রাম ব্রোকলিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
১৩. ব্রোকলি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
১৪. ব্রোকলির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
১৫. ব্রোকলি চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
১৬. ব্রোকলির বিভিন্ন জাতের নাম লিখ।
১৭. প্রতি ১০০ গ্রাম ওলকপিতে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
১৮. ওলকপি চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
১৯. ওলকপির চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
২০. ওলকপি ও শালগম চেনার উপায় কি?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

২০১৪

১। ফুলকপির চারা উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। ফুলকপির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

৩। ফুলকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪। কপি জাতীয় ফসল চাষে রোগ আক্রমনের পূর্বে করনীয় কি কি?

৫। বাঁধাকপির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬। বাঁধাকপির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

৭। বাঁধাকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। ব্রোকলির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৯। ব্রোকলির চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

১০। ব্রোকলির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

১১। ওলকপির চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১২। ওলকপি চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।

১৩। ওলকপির পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

জব ৫.১: ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির বীজতলা এবং সুস্থ ও সবল চারা তৈরির দক্ষতা অর্জন

শিখন ফল

১। বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে পারবে।

২। বীজতলার মাটি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। বীজতলায় বীজ বপন করতে পারবে।

৪। বীজতলার পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। সুস্থ ও সবল চারা তৈরি করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী বীজতলার স্থান প্রস্তুত করা

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিস্কার করা

৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি

২০২৪

৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রোকোলি অন্যতম। বর্তমানে আগাম চাষের জন্য চারা উৎপাদন বেশ প্রসার লাভ করেছে। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং একাধিক বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে।শুরুতেই বীজতলার স্থান নির্ধারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু হওয়া উচিত যেন বৃষ্টির বা বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা যায়। ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে বীজতলা করা প্রয়োজন। পানির উৎসের কাছাকাছি বাড়ি, খামার বা অফিসের কাছাকাছি হলে ভালো হয়। বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন করতে হলে বীজতলা যতদূর সম্ভব ক্রেতাদের কাছাকাছি এবং ভালো যোগাযোগ সম্পন্ন স্থানে স্থাপন করা উচিত।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব সার, ৪। বীজ, ৫। বালি, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি/চাঁটাই, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। ইটের গুড়া, ১৩। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির বীজতলার জন্য অবশ্যই অবশ্যই ছায়া মুক্ত উচু যায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২। বীজতলা তৈরীর জন্য ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া করে একটি আয়তকার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।

৩। এবার এর ৪ কোণায় ৪টি খুঁটি পুঁতে চার দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তারপর কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সে: মি: গভীর করে মাটি খুড়ে তুলে ফেলতে হবে এবংনিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরে বীজতলাকে সাজাতে হবেঃ

ক) সর্বনিম্ন স্তর: প্রায় ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি পুরাতন সুরকি , ভাংগা ইট, পোড়া মাটি ইত্যাদি।

খ) মধ্য স্তর: ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি দোঁ-য়াশ মাটি ও বালুর মিশ্রণ।

গ) উচ্চ স্তর: ৭.৫ সে:মি: বা ৩ ইঞ্চি বেলে-দোঁয়াশ মাটি , পঁচা গোবর ও কম্পোষ্ট সারের মিশ্রন।

৪। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য সাদা উজ্জ্বল পলিথিন দিয়ে বীজতলা ৩-৪ সপ্তাহ ভালোভাবে বায়ু রোধ করে ঢেকে রাখতে হবে। সূর্যের প্রচন্ড উত্তাপে ভেতরের জীবাণু মারা যাবে।

৫। শীতকালের জন্য বীজতলা সামান্য (৪-৫ সেঃমিঃ) উচু এবং বর্ষাকালে একটু বেশি (৮-১০ সেঃমিঃ) উচু করে প্রস্তুত করতে হবে।

৬। বীজতলায় রাসায়নিক সার মোটেও দেয়া যাবে না। তবে জৈব সার বীজতলায় ২-৩ কেজি হারে প্রয়োগ করা উত্তম। এর সাথে ২০-৩০ গ্রাম কার্বোফুরান দিতে হবে।

৭। বীজতলায় বপনের পুর্বে প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৮। বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালি বা মিহি মাটি বীজের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়।

৮। বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি.) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৯। বাঁশের ফালি দিয়ে বীজতলার উপর ধনুকের মতো বাকিয়ে ফ্রেম তৈরী করে তার উপর সাদা পলিথিন দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে রাখতে হয়।

চিত্র: সাদা পলিথিনে ঢাকা বীজতলা

১০। চারা গাছে ৫-৬ টি পাতা বের হলেই তা রোপনের উপযুক্ত হয়। ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০ দিন বয়সের সুস্থ ও সবল চারা নির্বাচন করতে হবে।

সতর্কতা

১। বীজতলার জন্য ছায়াযুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবেনা।

২। বীজতলায় রাসায়নিক সার ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। বীজ বপনের সাথে সাথে বীজতলায় সেচ দেয়া যাবেনা।

জব ৫.২: ফুলকপি/বাঁধাকপি/ওলকপি/ব্রোকলির উৎপাদন কৌশলের দক্ষতা অর্জন

শিখন ফল

১। উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে পারবে।

২। জমি প্রস্তুত করতে পারবে।

৩। মূল জমিতে চারা লাগাতে পারবে।

৪। ফসলের পরিচর্যা করতে পারবে।

৫। পরিপক্কতার মানদণ্ড অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে পারবে।

পারদর্শীতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী ফসলের জমি প্রস্তুত করা

২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরন শনাক্ত ও সংগ্রহ করা

৩। হ্যান্ড গ্লাবস ও গামবুট পরিধান করা

৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যাবহৃত মালামাল পরিষ্কার করা

৫। অব্যাবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষন করা

৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (পিপিই)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেশিফিকেশন	সংখ্যা
১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ টি
২	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১ টি
৩	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ট	০১ জোড়া
৪	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ টি
৫	গামবুট	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজিসমূহ যেমনঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ও ব্রোকলি আমাদের দেশে শীতের জনপ্রিয় সবজি। তবে শীতের সবজি হলেও এখন গ্রীষ্মকালেও উৎপাদিত হচ্ছে। এই সবজিগুলুতে যথেষ্ট পরিমাণে সালফার, পটাশিয়াম ও ফসফরাস খনিজ উপাদান আছে। এই ধরনের সবজিসমূহ চাষের জন্য ঠান্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু সবচেয়ে উপযোগী। সুনিস্কাশিত উর্বর দোয়াশ ও এঁটেল মাটি সমৃদ্ধ উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জায়গা এই ধরনের সবজি চাষের জন্য উত্তম। মাটিতে যত জৈব পদার্থ থাকবে ফলন ততই ভালো হবে। অম্লমান বা পিএইচ ৬.০-৬.৫ ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজি চাষের জন্য উত্তম।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। মেজারিং টেপ, ৩। জৈব ও রাসায়নিক সার, ৪। সুস্থ ও সবল চারা, ৫।মই, ৬। নিড়ানি, ৭। খুরপি, ৮। বাঁশের খুটি, ৯। রশি, ১০। টুকরি, ১১। ঝাঁঝরি, ১২। জৈব বালাইনাশক, ১৩। পলিথিন, ১৪। খাতা ও কলম

কাজের ধারা

১। উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না এবং সারা দিন রোদ পায় এরূপ জমি নির্বাচন করতে হবে।

২। ৪-৫ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

৩। সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়মঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতকে	সারের পরিমাণ/প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া	১.০-১.২ কেজি	২৫০-৩০০ কেজি
টি এস পি	০.৬-০.৮ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	০.৮-১.০ কেজি	২০০-২৫০ কেজি
বোরাক্স/সোহাগা	২৮-৪০ গ্রাম	৭.০-১০.০ কেজি
গোবর	৬০-৮০ কেজি	১৫-২০ টন

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার, পুরো টিএসপি, অর্ধেক এমওপি এবং বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর সার চারা রোপণের ১ সপ্তাহ আগে মাদায় দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হবে। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি ও বোরন সার ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তির সার দিতে হবে চারা রোপণের ৮-১০ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি সার দিতে হবে চারা রোপণের ৩০ দিন পর এবং শেষ কিস্তির সময় সার দিতে হবে ৫০ দিন পর।

৪। চারা রোপণের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেন্টিমিটার বা ২ ফুট এবং প্রতি সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব দিতে হবে ৪৫ সেন্টিমিটার বা দেড় ফুট।

৫। রোপণের প্রথম কয়েক দিন প্রখর রোদে যাতে চারা ঝিমিয়ে না যায় তার জন্য কাগজ বা কলার খোল দিয়ে ছায়া দিতে হবে।

৬। সার দেওয়ার পরপরই সেচ দিতে হবে। এছাড়া জমি শুকিয়ে গেলে সেচ দিতে হবে। জমিতে পানি বেশি সময় ধরে যেন জমে না থাকে সেটাও খেয়াল করতে হবে।

৭। সার দেওয়ার আগে মাটির আস্তর ভেঙ্গে দিয়ে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৮। গাছের সারির মাঝে সার দেয়ার পর সারির মাঝখানের মাটি তুলে দুপাশ থেকে গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হয়।

৯। ফুলকপির ক্ষেত্রে ফুল সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থায় চারদিক থেকে পাতা টেনে বেঁধে ফুল ঢেকে দিতে হবে।

১০। পরিপক্কতার মাত্রা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

সতর্কতা

১। ছায়া যুক্ত ও নিচু জায়গা নির্বাচন করা যাবেনা।

২। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাবহার না করা উত্তম।

৩। অতিরিক্ত পরিপক্ক করে ফসল সংগ্রহ করা যাবেনা।

ফ্রুট এ্যান্ড ভেজিটেবল কালটিভেশন- ১

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়
ফল চাষ
(Cultivation of Fruits)

আমাদের দেশে নানা ধরনের ফল জন্মে থাকে। প্রধান প্রধান ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কুল, লেবু , বাতাবী লেবু, মাল্টা, তরমুজ, ফুটি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া নানা বৈচিত্রের ফল যেমন- বেল, কদবেল, আমড়া, আমলকি, লটকন, সফেদা, কামরাঙা, আতা, শরিফা, তাল, জলপাই, তেঁতুল অরবরই, চালতা, ঢেওয়া, করমচা, আনারস ইত্যাদি ফল ছিটিয়ে রয়েছে গ্রাম-গ্রামান্তরে। বর্তমানে দেশীয় ফলের সাথে বিদেশি ফল যেমন- স্ট্রবেরি, রাম্বুটান, ড্রাগনফল, এভোকাডো প্রভৃতির চাষে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথাপিছু দৈনিক ২০০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। অথচ আমাদের দেশে ফলের প্রাপ্যতা ৮৫ গ্রাম/প্রতিদিন/প্রতিজন। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ৬০ ভাগ, কিন্তু হেমন্ত ও বর্ষাকালে ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ২১ ভাগ। আবার বাংলাদেশে নির্দিষ্ট কিছু ফলের চাহিদা এতই বেশি যা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আমদানী করা ফলের ৮৫% হলো আপেল, কমলা, মাল্টা ও আঙ্গুরের দখলে। বর্তমানে বাংলাদেশে সীমিত পরিমানে কমলা ও মাল্টার চাষ হচ্ছে। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতোএদেশে ফলের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। এর অন্যতম কারণ অবৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিকল্পনাহীনভাবে ফলের চাষাবাদ। কিছু কৌশল এবং সাধারণ নিয়মনীতি মেনে পরিকল্পিতভাবে ফল চাষ করলে অধিক ফলন নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৪.০২ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফল চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৫১.৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাহিদা ১ কোটি ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন) ।হেক্টরপ্রতি ফলন প্রায় ১২.৮ মেট্রিক টন (সূত্র: বিবিএস ২০২১ ও কৃষি তথ্য সার্ভিস ২০২২)।

এই অধ্যায় শেষে-

- সবজি চাষের উপযোগী জমি ও মাটি নির্বাচন এবং জমি প্রস্তুত করতে পারবে
- সবজি চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন সারের নাম, গুণাগুণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি করতে পারবে

- সবজি ফসলে পানি সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা ও ফসল পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
- সঠিক উপায়ে সবজি সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা করতে পারবে

১.১ ফল চাষের গুরুত্ব

বিশ বছর আগেও শুধু আম আর কাঁঠালই ছিল আমাদের দেশের প্রধান ফল। অথচ এখন দেশে চাষ হচ্ছে ৭২ প্রজাতির ফল, আগে ছিল ৫৬ প্রজাতির ফল। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর হিসেবে টানা ১৮ বছর ধরে ১১.৫% হারে ফল উৎপাদন বাড়ছে বাংলাদেশে। বর্তমানে বিশ্বের ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের রেকর্ড বাংলাদেশের। একই সংগে গুরুত্বপূর্ণ চারটি ফলের মোট উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। ফল উৎপাদনের সর্বোচ্চ হারের রেকর্ডও বাংলাদেশের। বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, আম উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম, পেঁপে উৎপাদনে ১৪তম এবং মৌসুমী ফল উৎপাদনে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে আমাদের সুজলা-সুফলা এই সোনার বাংলা। যেখানে ২০০৮-০৯ সালে বাংলাদেশে মোট ফল উৎপাদন ছিল ১ কোটি মেট্রিক টন, বর্তমানে উৎপাদন হলো ১ কোটি ২২ লাখ মেট্রিক টন অর্থাৎ ফল উৎপাদন ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলই বল। ফল খেতে আমরা সবাই পছন্দ করি। ফল এদেশের একটি জনপ্রিয় সুস্বাদু, পুষ্টিকর, মুখরোচক ও তৃপ্তিদায়ক। ফল হলো পুষ্টির ভান্ডার। উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টি বিবেচনায় বাংলাদেশের ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ অপুষ্টি সমস্যায় জর্জরিত। এদেশের জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ফল ফসলের চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। ফলদ বৃক্ষ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান (ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস ইত্যাদি) ও বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও আমিষ, শর্করা, চর্বি ও পানি এর সহজ উৎস হল ফল। এর ভেষজগুণও অনেক। তাজা ফলে বিদ্যমান জৈব এসিড ও এনজাইম হজমে সহায়তা করে। তাজা ফল কাচা-পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া হয় বলে এর কোন পুষ্টি উপাদানই নষ্ট হয় না। ক্ষুধা বর্ধন ও রোগ নিরাময়ে পেঁপে, আমলকি ও বেদানা বেশ উপকারী। ফল থেকে জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, স্কোয়াশ, চাটনী ইত্যাদি নানা ধরনের মুখরোচক খাদ্য তৈরি হয়। এছাড়াও জ্বালানী চাহিদা পূরণ ও আসবাবপত্র তৈরি করে নগদ অর্থ লাভের সুযোগ রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে ফল চাষ অন্য ফসলের তুলনায় বেশ লাভজনক। একবার পরিকল্পিতভাবে ফল বাগান স্থাপন করা হলে পরবর্তীতে খুব একটা পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। একটু যত্ন নিলে বছরের পর বছর আশাপ্রদ ফল লাভ করা যায়।

বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির মধ্যে ফলের আওতায় ১- ২% জমি রয়েছে। আমাদের খাদ্য, পুষ্টি ও ভিটামিনের চাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধে ফলের ভূমিকা অপরিসীম। জানুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ১৯ ভাগ, মে থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ৬০ ভাগ এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ২১ ভাগ। শীতকালে ফল প্রাপ্তির পরিমান খুব কম বিধায়, এই সময়ে ফল পাওয়ার সুযোগের অভাবে আমাদের বিশেষ করে

২০২৪

দেশের গ্রামীন মা ও শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ লক্ষ্য করা যায়। বছরব্যাপী পুষ্টির নিশ্চয়তার জন্য সারা বছর সুষমভাবে ফল উৎপাদন হওয়া দরকার। কাজেই, খাদ্য, পুষ্টি, ফলের চাহিদা পূরণ, বৃক্ষ সম্পদ বৃদ্ধি, সর্বোপরি পরিবেশ ও আর্থিক উন্নয়নের জন্য বসতবাড়ি এলাকায় বা বাগান আকার যার যতটুকু সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা আছে সেখানে ফল গাছ লাগানো আমাদের প্রত্যেকের একান্ত দায়িত্ব।

১.২ ফল বাগানের পরিকল্পনা

অধিকাংশ ফল গাছ বহুবর্ষী বিধায় এতে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী এবং আয় পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হয়। তাই গোড়াতেই কোন ভুল হলে তার জন্য ফলচাষীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমাদের দেশে সাধারণত: বাড়ির আশেপাশের ফাঁকা জায়গায় পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য ফলের গাছ রোপণ করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ফলচাষ অন্যান্য মাঠশস্য চাষ অপেক্ষা অনেক লাভজনক বিধায় ক্রমান্বয়ে বানিজ্যিক ভিত্তিতে ফল বাগান স্থাপন কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফলের প্রাপ্যতা বেশি, কিন্তু বছরের অন্য সময়ে ফলের প্রাপ্যতা অনেক কম। তাই বছরব্যাপী ফলের প্রয়োজনীয় প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, বানিজ্যিক ফল বাগান করার সময় আগাম, মধ্যম ও নাবী জাতের বিষয়গুলো বিবেচনা করা, ফল সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ফলের বাগান করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন।

১.২.১ জাত নির্বাচন

যে এলাকায় বাগান স্থাপন করা হবে সেই এলাকার উপযোগী ফলের জাত বেছে নিতে হবে। জাত নির্বাচন সঠিক না হলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।

১.২.২ চারা-কলম নির্বাচন

সঠিক চারা-কলম নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চারা নির্বাচন সঠিক না হলে বাগান থেকে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাবে না। চারার বয়স, রোগ বালাইয়ের আক্রমণ, সতেজতা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ এগুলো গাছের ফলন ক্ষমতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ভালো চারা-কলমের নিম্নলিখিত

গুণাগুণ থাকবে-

* চারা-কলমটি হবে ভালো জাত ও অনুমোদিত উৎসের সায়ন বা বীজ থেকে উৎপন্ন
* চারা-কলমটির দৈর্ঘ্য শিকড়ের দৈর্ঘ্যের ৪ গুণের বেশি হবে না
* চারা-কলমের বয়স এক বা দেড় বছরের বেশি হবে না
* চারা-কলমে ফুল-মুকুল বা ফল থাকবে না
* চারাটি রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত হবে
* কলমের চারাটি হবে ২-৩টি সুস্থ-সবল শাখাযুক্ত
* জোড় কলমের চারার আদিজোড় এবং উপজোড়ের মধ্যে সংগতি থাকতে হবে এবং সঠিকভাবে জোড়া লাগতে হবে।

১.২.৩ ফল বাগানের স্থান/জমি নির্বাচন

বানিজ্যিকভাবে ফল বাগান করতে হলে যে সকল বিষয় বিবেচনা করে ফল বাগানের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে তা নিম্নরুপ-

- এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- যোগাযোগ ব্যবস্থা
- বাজারজাতকরণের সুযোগ সুবিধা
- সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এবং বর্ষার পানি দাঁড়ায় না

একটি বানিজ্যিক ফলবাগান প্রতিষ্ঠায় স্থান নির্বাচনের জন্য সাধারণত: নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়ে থাকে-

ক) জলবায়ু

বিভিন্ন ধরনের জলবায়ুতে বিভিন্ন রকমের ফল জন্মে। উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলের অধিকাংশ ফলই আমাদের দেশে জন্মে। কিন্তু শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল আমাদের দেশে জন্মে না। যেমন- আপেল। কিন্তু আম চাষের উপযোগী জলবায়ু বর্তমান। আবার দেশেরই সব এলাকায় আম ভাল হয় না। যেসব এলাকায় বাৎসরিক বৃষ্টিপাত তুলনামূলকভাবে কম এবং জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক, সেসব এলাকায় আম ভাল হয়।

খ) মাটি

সাধারণত: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে অধিকাংশ ফল জন্মে। তবে কিছু কিছু ফল বিশেষ ধরনের মাটিতে ভাল হয়। যেমন- আনারস ও কাঁঠাল অম্লীয় এটেল দোঁআশ মাটিতে ভাল হয়। এজন্য মধুপুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রমের পাহাড়ী এলাকায় আনারস এবং কাঁঠাল ভাল হয়। আবার উপকূলীয় এলাকার লোনা মাটিতে নারিকেল ভাল হয় এবং তরমুজের জন্য চর এলাকার বালু মাটি উত্তম। এজন্য সবধরনের ফলের বাগান করতে হলে মাটির অম্লমান (pH) ৬-৭ এবং সহজে সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করা যায় এরুপ মাটি নির্বাচন করতে হবে।

গ) শ্রমিকের সহজলভ্যতা

যেসব এলাকায় সহজে চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক পাওয়া যায় এমন স্থানে ফলের বাগান করা উচিত। কারণ এতে ফলের উৎপাদন খরচ কম হয়।

১.২.২ বাগানের নকশা

প্রাথমিকভাবে চারা রোপণসহ বাগান প্রতিষ্ঠার আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থাদির একটি স্থায়ী প্রতিরুপ হলো ফলবাগোনের নকশা। **বাগানের নকশার মধ্যে থাকে-**

১। ফলগাছের রোপণ দূরত্ব ও পদ্ধতি।

২। বাগানের কোন অংশে কি ধরনের ফল গাছ রোপণ করতে হবে।

৩। ফলবাগান সুচারুভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাস্তা, অফিস, গুদাম, যন্ত্রপাতির ঘর প্রভৃতি স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ এবং তার নকশা।

১০৩৪

৪। সেচ ও নিকাশ পরিকল্পনা অর্থাৎ কোন স্থানে গভীর নলকূপ বসালে পানির ব্যবস্থাপনা সহজে করা যায় সর্বোপরি বাগানের নকশা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যেন তা বাস্তবে রূপদান করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয়, মাটির উর্বরতা অক্ষুন্ন থাকবে এবং প্রত্যেকটি গাছ একটি অপরটি থেকে এমন দূরত্ব বজায় রাখে যাতে তারা সুষমভাবে আলো, বাতাস ও পুষ্টি উপাদান পেয়ে বাড়তে পারে ও স্বাভাবিক ফল ধারণ করে।

বাগানের যেসব নকশা প্রচলিত আছে তা নিম্নরুপ-

ক) রোপণ প্রণালী

১। আয়তাকার প্রণালী (Rectangular system)

যে প্রণালীতে রোপণ করলে দুটি সারির প্রতি চারিটি গাছ একটি আয়তক্ষেত্র সৃষ্টি করে তাকেই আয়তাকার প্রণালী বলে। এই প্রণালীতে সারি থেকে সারির দূরত্ব সারিতে গাছের পারস্পরিক দূরত্ব অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। এই প্রণালীতে সাধারণত দু'সারির মধ্যবর্তী স্থানের উপর দিয়ে চাষ, পানি সেচ ও অন্যান্য আন্ত:পরিচর্যা ইত্যাদি কার্য পরিচালনা করা হয়। যেমন- তরমুজ, ফুটি/বাংগি এই পদ্ধতিতে জমিতে রোপণ করা হয়। যেকোন ফলের কলম রোপণের আগেই জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে নিতে হবে।

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = সারির সংখ্যা X প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

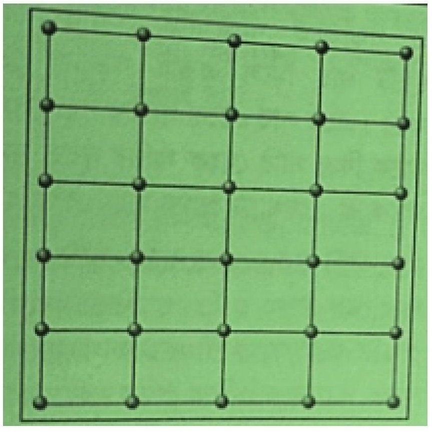

চিত্র: আয়তাকার নকশা

এর লে-আউট করা বেশ সহজ। সাধারণত: কোন ফল গাছ এই পদ্ধতিতে লাগানো হয় না।

২। বর্গাকার প্রণালী (Square system)

এক্ষেত্রে প্রতি দুই সারির চারটি গাছ একত্রে মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে। এখানে গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান হয়। এই প্রণালীতে প্রতিটি গাছের চারপাশে সমান জায়গা থাকে, ফলে গাছের পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এটি

ফলগাছ লাগানোর একটি সহজ ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি। সাধারণত: পেঁপে, কলা, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতির বাগান এই পদ্ধতিতে করা যায়।

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা = সারির সংখ্যা X প্রতি সারিতে গাছের সংখ্যা

৩। কুইনকাংস (Quincanx system)

এই প্রণালী বর্গাকার প্রণালীর বিশেষ রুপ। এই পদ্ধতিতে আম, কাঁঠল, লিচু প্রভৃতি বড় গাছকে বর্গাকার রোপণ করা হয়। প্রতি বরেগর কেন্দ্রস্থল একটি করে ছোট আকারের গাছ লাগানো হয়। পেয়ারা, আতা, লেবু, শরিফা ইত্যাদি এরুপ কেন্দ্রে স্থাপনের উপযোগী। এই কেন্দ্রের গাছটিকে পূরক (Filler) বলা হয়। যেহেতু অনেক দূরে বড় গাছসমূহ লাগানো হয় এবং এতে এই জায়গা দখল করতে ১২/১৪ বছর সময় লাগে। সুতরাং ঐ সময়ের জন্য বর্গের কেন্দ্রগুলোতে ছোট আকারের গাছগুলো লাগালে জমির যেমন সদ্ব্যবহার হবে, তেমনি বাগান হতে শীঘ্রই অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া সম্ভব।

গাছের সংখ্যা= সারিতে মূল গাছের সংখ্যা X সারির সংখ্যা

পূরক গাছের সংখ্যা= (সারিতে মূল গাছের সংখ্যা-১) X (সারির সংখ্যা- ১)

৪। ত্রিভুজাকার পদ্ধতি (Triangular system)

এ পদ্ধতিতে গাছ লাগালে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ তৈরি হয় অর্থাৎ যদি ১ম, ৩য় ও ৫ম সারিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে গাছ লাগানো হয় তবে ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ একান্তরক্রমিক সারিতে প্রথমোক্ত সারিসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে গাছ লাগাতে হয়। এ পদ্ধতিতে রোপিত গাছ তিনদিক থেকেই সারিবদ্ধ দেখায়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত আম, লিচু, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।
গাছের সংখ্যা= (প্রথম সারিতে গাছের সংখ্যা X মোট সারির সংখ্যা) – একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

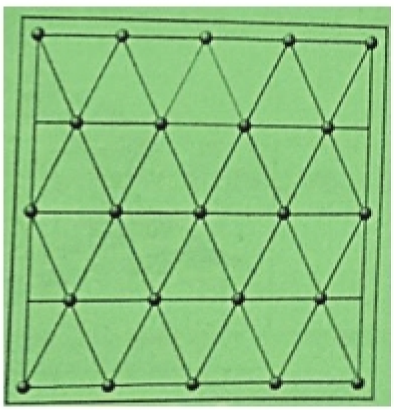

চিত্র: ত্রিভুজাকার নকশা

ষড়ভুজী পদ্ধতি (Hexagonal system) : এ পদ্ধতি একটি সমবাহু ত্রিকোনী পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ এখানে পাশাপাশি দুই সারির তিনটি গাছ মিলে একটি সমবাহু ত্রিভূজ তৈরি হয় এবং পাশাপাশি তিন সারির ছয়টি গাছ মিলে একটি ষড়ভুজ তৈরি হয় যার কেন্দ্রেও একটি গাছ থাকে। প্রতিটি গাছ স্থান, আলো, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদি সব দিক হতে সমান সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। একই দূরত্বে গাছ লাগালে সারি থেকে সারির দূরত্ব কমে যায়। ফলে নির্দিষ্ট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা এতে শতকরা ১৫টি গাছ বেশি

সঙ্কুলান হয়। এজন্য এটিকে বাণিজ্যিক ফল বাগানে বেশি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত আম, লিচু, পেয়ারা, কমলা, মাল্টা ইত্যাদি লাগানো হয়ে থাকে।

জমিতে মোট গাছের সংখ্যা= (মোট সারির সংখ্যা x প্রধান সারিতে গাছের সংখ্যা) - একান্তর ক্রমিক সারির সংখ্যা

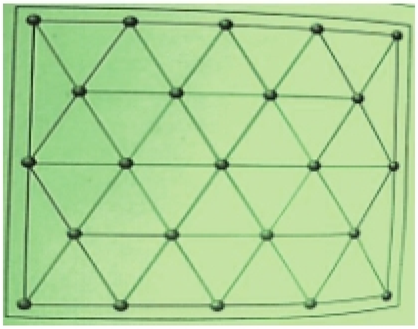

চিত্র: ষড়ভুজাকার নকশা

কন্টুর পদ্ধতি (Contour system): সাধারণত ঢালসম্পন্ন পাহাড়ি এলাকায় যেখানে জমির ঢাল ৩% এর বেশি হয় সেখানে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ঢালু, বন্ধুরতা ও উচ্চতা অনুসারে ভূমি থেকে পাহাড়ের ঢালে মোটামুটি সমান উচ্চতায় সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানোর পদ্ধতিকে কন্টুর পদ্ধতি বলা হয়। সেখানে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে এবং সেচ দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সাধারণত রোপিত গাছের পারস্পরিক দূরত্ব কখনও সমান থাকে না। ১০% এর বেশি ঢাল থাকলে সিঁড়ি বাঁধ পদ্ধতি (Terrace planting) ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে গাছ রোপণের সুবিধা হলো এসব এলাকায় অন্য কোন উপায়ে গাছ লাগানো যায় না, মাটি ক্ষয় রোধ পায়, মাটির সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

চিত্র: কন্টুর নকশা

খ) চারা রোপণের সময়: মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস বেশির ভাগ ফলদ বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে সেচ সুবিধা থাকলে টবে বা পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা-কলম বছরের যে কোনো সময় রোপণ করা চলে। শীতকাল বা খরার সময় গাছ লাগালে এর প্রতি অধিক যত্নশীল হতে হবে। নতুবা রোপিত চারা-কলমের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গ) রোপণ দূরত্ব: জাতভেদে একই প্রজাতির ফলে রোপণ দূরত্ব ভিন্ন হতে পারে। নিম্নের সারণীতে কয়েকটি উন্নত জাতের ফলের রোপণ দূরত্ব এবং উপযোগী এলাকা উল্লেখ করা হলো-

২০২৪

সারণি: বিভিন্ন উন্নত ফল জাতের রোপণ দূরত্ব

জাত	রোপণ দূরত্ব
বারি আম	১০ মি.X ১০ মি.
বারি লিচু	৮ মি.X ৮ মি.
বারি কুল	৫ মি.X ৫ মি. বারি
পেয়ারা-২	৫ মি.X ৫ মি.
বারি নারিকেল-১,২	৬ মি. X ৬ মি.
বারি কমলা-১	৩ মি. X ৩ মি.
বারি কমলা-২	২.৫ মি. X ৩ মি.
বারি লেবু-১	৩ মি. X ৩ মি.
বারি লেবু -২, ৩	২.৫ মি. X ২.৫ মি.
বারি বাতাবিলেবু-৩,	৪-৬ মি. X ৬ মি.
বারি মাল্টা-১	৪ মি. X ৪ মি.
বারি আমড়া-১	৪ মি.X ৪ মি.
বারি আমড়া-২	৭ মি. X ৭ মি.
বারি কাঁঠাল-১, ২	১০ মি. X ১০ মি.
বারি সফেদা-১, ২,	৩-৭ মি.X ৭ মি.
বারি জামরুল-১,২	৫ মি.X ৫ মি.
বারি সফেদা-১, ২,	৩-৭ মি.X ৭ মি.
বারিজামরুল-১,২	৫ মি.X ৫ মি.
বারি আঁশফল-২	৫ মি X ৫ মি.
বারি তেঁতুল-১	৮ মি.X ৮ মি.
বারি জলপাই-১	৮ মি.X ৮ মি.
বারি লটকন-১	৭ মি.X ৭ মি.

১.৩ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

১.৩.১ জমি তৈরি

গভীরভাবে চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। আগাছা বিশেষ করে বহুবর্ষজীবী আগাছার মধ্যে উলু ও দুর্বা গোড়া ও শেকড়সহ অপসারণ এবং জমি সমান করতে হবে।

১.৩.২ পিট বা গর্ত তৈরি

গর্ত তৈরির ধাপ

১) গর্ত তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যেমন- কোদাল, বেলচা, খুন্তি ইত্যাদি আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। জাতভেদে সকল ধরনের ফল গাছ রোপণের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম।

২) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে। মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৩) জমি তৈরি সম্পন্ন হলে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে নিচে উল্লেখিত আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে-

গাছের আকৃতি	চারা বসানোর গর্তের মাপ (ঘণ সেমি)
১। বড় গাছ (আম, জাম, লিচু)	৯০ সেমি X ৯০ সেমি X ৯০ সেমি
২। মাঝারি গাছ (পেয়ারা, আতা, ডালিম, লেবু)	৬০ সেমি X ৬০ সেমি X ৬০ সেমি
৩। ছোট গাছ (কলা, পেঁপে)	৫০ সেমি X ৫০ সেমি X ৫০ সেমি
৪। খুব ছোট গাছ (আনারস, স্ট্রবেরী)	১৫ সেমি X ১৫ সেমি X ১৫ সেমি

মাটি শক্ত ও কাদা মাটিতে বড় আকারের গর্ত খুবই উপযোগী।

৪) গর্ত খননকালে গর্তের উপরের তিন ভাগের দুই ভাগ মাটি একদিকে এবং নিচের বাকী তিন ভাগের এক ভাগ মাটি অন্যপার্শ্বে রাখতে হবে। গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকিয়ে নেয়া ভাল। গর্তের ভিতর পাতা পুড়িয়ে রোগ জীবাণু বা পোকার কীড়া নষ্ট করা যায়। কয়েক দিন সূর্যের আলো গর্তে পড়লেও রোগজীবাণু মারা যায়।

৫। জীবাণু ও পোকার কীড়া নষ্ট করার পর গর্তের উপরের মাটির সাথে প্রয়োজনীয় সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর। উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

১.৩.৩ সার প্রয়োগ

ফসল উৎপাদনে সারের বিকল্প নেই। কেননা উদ্ভিদের খাদ্যই হচ্ছে সার। গাছের পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার, ফুল, ফলধারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মাটিকে সুস্থ এবং উর্বর রাখতে হলে সুষম ও পরিমিত উপায়ে সার ব্যবহার করতে হবে। কারণ অপরিমিত উপায়ে সার ব্যবহার করলে একদিকে যেমন উৎপাদন কম হয় অন্যদিকে খরচ বাড়ে। এ ছাড়া মাটির স্বাস্থ্য, উর্বরতা ও পরিবেশ নষ্ট হয়। অন্যান্য গাছের চেয়ে ফল গাছ মাটি হতে বেশি খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে। সব গাছের সমান পরিমান খাবার লাগে না। আবার, গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন পরিমান পুষ্টি উপাদান প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর ফল গাছের সারের মাত্রা নির্ভর করে-

১। ফল গাছের ধরন

২। গাছের আকার ও বয়স

৭। উৎপাদন মৌসুম

৮। মাটির প্রকৃতি ও উর্বরা শক্তি

৩। ফলের জাত
৪। গাছের বৃদ্ধির স্বভাব
৫। গাছের বৃদ্ধির পর্যায়
৬। আবহাওয়া
৯। সার ব্যবহার পদ্ধতি
১০। চাষাবাদ পদ্ধতি
১১। সেচ ব্যবস্থাপনা
১২ জমির ফসল বিন্যাস

চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তের উপরের মাটির সংগে গোবর সার ও রাসানিক সার নিচে উল্লেখিত পরিমান মিশাতে হবে:

গাছের আকৃতি	গোবর সার	খৈল	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	ছাই	ডলোচুন
বড় আকৃতির গাছ (আম, কাঁঠাল, লিচু)	২০ কেজি	২ কেজি	১৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	২ কেজি	১৫০ গ্রাম
মাঝারী আকৃতির গাছ (পেয়ারা, বাতাবী লেবু, জলপাই)	১৫ কেজি	১.৫ কেজি	১০০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৪ কেজি	১০০ গ্রাম
ছোট গাছ (কাগজি লেবু, ডালিম, শরিফা)	১০ কেজি	১ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৩ কেজি	১০০ গ্রাম

১.৪ চারা রোপণ ও পরিচর্যা

১.৪.১ চারা রোপণ

গর্ত তৈরির ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাটি কুপিয়ে আলগা করে লে-আউট করার সময় দু'প্রান্তে পুঁতে রাখা খুঁটি বরাবর ফিতা ধরে গর্তের মাঝ বরাবর ১ম চারা এবং নির্ধারিত দূরত্বে অন্যান্য চারা লাগাতে হবে। চারা লাগানোর সময় খুব সাবধানে এর গোড়ার টব-পলিব্যাগ-খড় অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙে না যায়। চারা এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে এর গোড়া একদম সোজা থাকে এবং মাটির বলটি গর্তের উপরের পৃষ্ঠ থেকে সামান্য নিচে থাকে। এর পর হাত দ্বারা আলতোভাবে মাটি পিষে দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলে না যায় এবং এর গোড়া যাতে বাতাসে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য চারা লাগানোর পরপরই খুঁটি দিতে হবে। খুঁটিটি সোজা করে পুঁতে এর সঙ্গে শক্ত করে পাটের সুতলি চারার গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি দূরে বেঁধে চারাটি এমনভাবে বাঁধতে হবে । গরু ছাগলের উপদ্রবের আশংকা থাকলে, সম্পূর্ণ বাগানে অথবা প্রত্যেক গাছে বেড়া দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। লাগানোর পরপরই প্রয়োজনে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রতিটি চারায় পানি সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের পর এক সপ্তাহ প্রতিদিন এবং এর পরবর্তী এক মাস ২-৩ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের পর যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৪.২. রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

ক) সার প্রয়োগ: সার ব্যবহারে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, ফলের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার অসময়ে সার ব্যবহার গাছের ফল ধার বাধাগ্রস্থ করে। গাছ বড় হওয়ার সাথে সাথে সারের পরিমান বাড়াতে হবে। গাছের একেবারে গোড়ায় সার দেয়া উচিত নয়। ছোট গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ৫০ সেমি এবং বড় গাছের বেলায় ১ মিটার দূরে সার ব্যবহার করা উচিত। গাছের ডালপালা বিস্তৃতির সঙ্গে শিকড়ের বিস্তৃতির সম্পর্ক থাকে। অতএব ডালপালা যতদূর বিস্তৃত ততদূর সার দিতে হবে। মাটির উপর সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের গোড়ার চারদিকে বৃত্তাকার ছোট নালা তৈরি করে সে নালায় সার দেয়া যেতে পারে। সার দেয়ার পর নালা মাটি দিয়ে পূরণ করে দিতে হবে। সার দেয়ার পর জমিতে পানি দেয়া উচিত। তাহলে সরবরাহকৃত সার হতে গাছ খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে। নিচে রোপণের সময় হতে বিভিন্ন বয়সে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমান উল্লেখ করা হলো-

সারের নাম	বাৎসরিক বৃদ্ধির হার	১০ বছরের অধিক বয়সের গাছ
পচা গোবর	১০ কেজি	১০০ কেজি
ইউরিয়া	১০০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম
টিএসপি	১০০ গ্রাম	২ কেজি
এমওপি	৫০ গ্রাম	৬০০ গ্রাম

প্রতি বছর গ্রীষ্মের প্রারম্ভে (বৈশাখ মাসে) ও বর্ষার শেষে (ভাদ্র মাসে) উক্ত সার ২ ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে।

নারিকেল, সুপারি, পেঁপে, কলা প্রভৃতি আঁশ জাতীয় গাছে পটাশ বা ছাই জাতীয় সারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি।

খ) শুন্যস্থান পুরণ

জমিতে চারা রোপণের পর অনেক সময় বিভিন্ন কারণে ফল গাছের চারা মারা যায় এবং শুন্য স্থানের সৃষ্টি করে। এতে একদিকে যেমন বাগানের সৌন্দর্যহানি হয়, অন্যদিকে জমির অপচয় হয়। এবং গাছের সংখ্যা কমে গিয়ে বাগানের ফলন কমে যায়। তাই শূন্যস্থানে একই জাতের ও সমবয়সের চারা রোপণ করা উচিত।

গ) গাছের মুকুল/ফল ভাঙন: কলমের গাছ রোপণের পরবর্তী বছর থেকেই মুকুল আসতে শুরু করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সীমিত হারে ফলও হয়। তাতে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু গাছের বয়স ২-৪ বছর না হওয়া পর্যন্ত মুকুল অথবা কচি ফল ভেঙে দিতে হবে। তবে জাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য দু'একটি ফল রাখা যেতে পারে।

ঘ) ডাল ছাঁটাইকরণ (Training & Pruning): কলমের গাছ রোপণের পর এর গোড়ার দিক অর্থাৎ আদিজোড় (Rootstock) থেকে নতুন ডাল বের হতে থাকে। এসব ডাল ভেঙে দিতে হবে। এছাড়া গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকে বৃক্ষভেদে ০.৫-১.৫ মিটার কান্ড রেখে নিচের সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। অনেক সময় বীজের চারায় ডালপালা না হয়ে প্রধান কান্ড ওপরের দিকে বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত উচ্চতায় গাছের ডগা কেটে দিতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল

ডালপালা কেটে দিতে হবে। এছাড়া গাছ বেশি ঝোপালো হলে অতিরিক্ত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। কুল গাছের ফল সংগ্রহের পর ডালপালা কেটে ফেলতে হয়। এতে ফলের মান ও ফলন উভয়েই বাড়ে। তেমনি ভাবে আঙুর, লেবু, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল গাছে নিয়মিত ও পরিমিত ছাটাই করা প্রয়োজন। অনেক সময় যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও গাছ ফলবতী না গলে শিকড় ছাঁটাই করে এ সমস্যা দূর করা যায়। গাছ যে পরিমান জায়গায় বিস্তৃতি লাভ করে সেই জায়গা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা লাঙ্গল দিয়ে গভীরভাবে চাষ করে শিকড় ছাটাই করা হয়।

ট্রেনিং (Training): চারা হতে গাছের সুন্দর, সুস্থ ও শক্ত কাঠামো তৈরি করার জন্য যে ছাঁটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে।

প্রুনিং (Pruning): মাতৃগাছসমূহে ফল ধরানো, চোখ কলম করানোর যোগ্য ডাল পাওয়ার জন্য, গাছের আকার আকৃতি, বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন, নিয়মিত ফল ধারণ ও ফলের মান উন্নতকরণের জন্য ডালপালা, শিকড়, পাতা কোন কোন ক্ষেত্রে ফলও ছাঁটাই করা হয় তাকে প্রুনিং বলে।

ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে পার্থক্য:

ট্রেনিং	প্রুনিং
১। সাধারণত: গাছ ফল ধারণের স্তরে পৌঁছার পূর্বে যে ছাঁটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে।	১। গাছ ফলবর্তী হওয়ার পর যে ছাঁটাই করা হয় তাকে প্রুনিং বলে।
২। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র শাখা-প্রশাখা ও পাতা ছাঁটাই করা হয়।	২। এ পদ্ধতিতে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, ফুল, মুকুল, শিকড় ইত্যাদি অপসারণ করা হয়।
৩। গাছকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রদানের উদ্দেশ্যে ছাঁটাই করা হয়।	৩। গাছের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ছাঁটাই করা হয়।
৪। গাছকে সুন্দর গড়ন ও বাগানের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে ট্রেনিং করা হয়।	৪। পুষ্পধারণ, ফলায়ন ও ফলের গুণগত মান উন্নত করার উদ্দেশ্যে প্রুনিং করা হয়।
৫। সবধরনের প্রুনিং ট্রেনিং নয়।	৫। সবধরনের ট্রেনিং-ই প্রুনিং।

ঙ) আগাছা দমন: আগাছা ফল গাছের সাথে পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতা করে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস ও ফলন কমিয়ে দেয় এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়িয়ে দেয়। তাই ফল বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বাগানে চাষ দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। গাছের কাছাকাছি যেখানে চাষ দেয়া সম্ভব হয়না সেখানে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা দমন করতে হবে। এরপরও আগাছার উপদ্রব পরিলক্ষিত হলে বর্ষা মৌসুমে হাসুয়া বা বুশ কাটার দ্বারা কেটে এবং শীত মৌসুমে চাষ ও কোদাল দ্বারা পুনরায় আগাছা দমন করতে হবে। আগাছানাশক যেমন রাউন্ড-আপ, পির্লাক্ষন প্রয়োগ করেও বাণিজ্যক বাগানে আগাছা দমন করা যায়।

চ) সার প্রয়োগ : বাড়ন্ত গাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুই মাস অন্তর সমান কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। অনুমোদিত মাত্রায় গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে সার ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। ফলন্ত গাছে সাধারণত বছরে দুইবার সার প্রয়োগ করতে হয়। বর্ষার শুরুতে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দু'এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর মাটিতে রস এলে ১ম কিস্তি এবং বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে বৃষ্টির পরিমাণ

কমে এলে ২য় কিস্তির সার প্রয়োগ করতে হয়। দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে তার থেকে সামান্য ভেতরে নালা তৈরি করে নালায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। অথবা গাছের গোড়ার ১.০-১.৫ মিটার বাদ দিয়ে দুপুর বেলায় যে পর্যন্ত ছায়া পড়ে সেই এলাকায় সার ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। সারের অপচয় রোধ রকার জন্য বর্ষা মৌসুমে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করা উত্তম। পেয়ারা, কুল, লেবু জাতীয় ফল প্রভৃতি গাছের নতুন ডালে ফুল ও ফল হয়। এসব ক্ষেত্রে শীতের শেষে মাঘ-ফাগুন মাসে আরও এক কিস্তি সার প্রয়োগ করা উত্তম।

চ) বাউনি বা মাচা দেয়া

লতানোর প্রকৃতির ফল যেমন- আঙ্গুর ও প্যাশন ফল গাছ ভালোভাবে বেড়ে উঠার জন্য বাঁশ, কঞ্চি, পাটকাঠি বা সম্ভব হলে তার দিয়ে মাচা করে দিতে হয়। সময়মত বাউনি না দিলে এসব গাছের বৃদ্ধি ঠিকমত হয় না বিধায় ফলনও কমে যায়।

ছ) মালচিং (Mulching)

মালচিং মাটিতে রস সংরক্ষণ এবং আগাছা দমনের জন্য বেশ উপকারী। খড়, গাছের পাতা, কালো প্লাস্টিক ইত্যাদি মালচিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- আনারসের ক্ষেত্রে কালো প্লাস্টিক মালচ আগাছা দমন ও মাটির রস সংরক্ষণে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জ) পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ফল গাছে পানির প্রয়োজনীয়তা, পানি প্রাপ্যতা, পানির গুণাগুণ, মাটির প্রকার, জমির অবস্থান, চাষাবাদের ধরন ইত্যাদির ভিত্তিতে সেচ পানি প্রয়োগ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

প্রয়োজনীয় সময় গাছে কৃত্রিম উপায়ে সেচের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং অতিবৃষ্টি বা অন্যান্য কারণে গাছের গোড়া থেকে পানি অপসারণের ব্যবস্থা করা অত্যান- জরুরি। ïুতরাং পানি ব্যবস্থাপনা বলতে সেচ ও নিষ্কাশন উভয়কেই বুঝায়। ফল গাছের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পানির অপর নাম জীবন কথাটি সকল জীবের ন্যায় গাছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পানির অভাবে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয় এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। তাই শুষ্ক মৌসুমে ফলগাছে সেচের ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরি। আবার কিছু ফলগাছ যেমন পেঁপে, কলা, তরমুজ, আনারস, কাঁঠাল, ইত্যাদি জলাবদ্ধতায় অত্যন্ত সংবেদনশীল, এমনকি বেশি দিন জলাবদ্ধতা থাকলে মারাও যেতে পারে। এসব ফলগাছের জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। ফলগাছে কখন সেচ দিতে হবে তা নির্ভর করে গাছের বৃদ্ধি, আবহাওয়া এবং মাটির অবস্থা ইত্যাদিও উপর।

সেচ পদ্ধতি (Methods of irrigation)

শীত ও গ্রীষ্ম মৌসুমে বিশেষ করে ফল ধারনের পর এবং ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় ২-৩টি সেচ প্রয়োগ করা আবশ্যক। রিং বা বেসিন বা থালা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে পানি সাশ্রয় হবে। দুপুর বেলায় গাছের যে পরিমান জায়গায় ছায় পড়ে থালাটি ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে। স্বল্প মেয়াদি ফল যেমন- কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল বাগানে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা যায়। বাংলাদেশে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে ফল বাগানে একবার সেচ প্রদান করতে পারলে ভালো। পাহাড়ী অঞ্চলে ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া উত্তম। বর্ষা মৌসুমে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা অতীব জরুরি।

১) ওভারহেড বা বর্ষণ সেচ বা ফোয়ারা সেচ (Overhead/Sprinkler irrigation)

এ পদ্ধতিতে সেচ পানি পাম্প করে উচ্চ চাপে পাইপ ও নজেলেরর ভিতর প্রবাহিতকরা হয়। ফলে পানি বৃষ্টির ফোঁটার মত ফসল তথা জমির উপর ছড়িয়ে পড়ে। এ পদ্ধতিতে খাড়া ঢালু, উঁচু নিচু, ঢেউ খেলানো ইত্যাদি ধরনের জমি সমতল না করেই সেচ দেওয়া যায় এবং পানিতে দ্রবণীয় সার, বালাইনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদি সেচ পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়। যে কোন ফলবাগানের এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যায় তবে সাধারণত ছোট আকারের গাছের জন্যই বেশি কার্যকরী। এ পদ্ধতির একটা বড় অসুবিধা হল যে বাতাসের বেগ বেশি হলে সেচকৃত পানির সমবন্টন হয় না। বর্ষণ সেচ আবার দুই প্রকার যথাঃ (ক) ঘুর্ণায়মান নজল পদ্ধতি ও (খ) ছিদ্রযুক্ত নজল পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে সেচ নলের মাথায় একটা ঘূর্ণায়মান নজল বাসানো থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় পর ঘুরে ঘুরে পানি সিঞ্চন হতে থাকে। আনারসের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে ভাল। ছিদ্রযুক্ত নজল পদ্ধতিতে একটানা বৃষ্টি পাতের মতো পানি উপর থেকে গাছে পড়ে। আনারস, কাগজীলেবু এবং অন্যান্য গাছসমূহে ফোয়ারা সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

চিত্র: বর্ষণ বা ফোয়ারা পদ্ধতিতে সেচ

২) ভু-পৃষ্ঠে সেচ (Surface irrigation)

এ পদ্ধতিতে জমির উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করা হয়। তুলনামূলকভাবে সহজ ও সস্তা বলে এ পদ্ধতিটি আমাদের দেশে বেশি জনপ্রিয়। তবে এ পদ্ধতিতে সেচের পানির সমবন্টন হয় না। উঁচু-নিচু জমিতে এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া অসুবিধাজনক, এতে পানির অপচয়ও বেশি হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এ পদ্ধাতিতে সেচকৃত পানির মাত্র ২০% গাছ ব্যবহার করতে পারে বাকি ৮০% অপচয় হয়। ভু-পৃষ্ঠে সেচ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমনঃ

ক) প্লাবন পদ্ধতি (Flood Methods)

সাধারণত সমতল জমিতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতি আবার নানা ধরনের, যেমনঃ

১) মুক্ত প্লাবন (Flood Irrigation)

এ পদ্ধতিতে জমির একপাশ থেকে পানি প্রবেশ করানো হয় এবং সম্পূর্ণ জমি প্লাবিত হলে অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়া হয়। যেসব স্থানে পানির উৎস পর্যাপ্ত ও সহজলভ্য সেখানে এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া চলে।

২) সীমান্ত প্লাবন (Border Irrigation)

এটা মুক্ত প্লাবন পদ্ধতির মতই তবে এক্ষেত্রে জমিতে সমান্তরাল ভাবে আইল তৈরি করে পানি উঁচু থেকে নিচের দিকে চালনা করা হয়। দুটি আইলের মধ্যবর্তী জমিকে “বডার স্ট্রিপ” বলে। এই স্ট্রিপ ১০-১৫ মিটার ২০২৪

চওড়া এবং ১০০-৪০০ মিটার লম্বা হয়ে থাকে। ঘনভাবে লাগানো ফসলের বেলায় এ পদ্ধতি অধিক প্রযোজ্য।

৩) নিয়ন্ত্রিত প্লাবন (Control Irrigation)

এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমিতে আইল তৈরি করে কয়েকটি খন্ডে ভাগ করা হয়। অতঃপর প্রতিখন্ডকে ঢালু অনুযায়ী প্লাবিত করা হয়।

৪) বেসিন প্লাবন (Basin Irrigation)

যে সব ফলগাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে এবং অধিক দূরত্বে লাগানো হয় সে সব ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার/আয়তাকার বেসিন তৈরি করা হয়। দুই সারি গাছের মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান নালা কেটে সেই নালার সাথে উক্ত বেসিন সমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালা দ্বারা যুক্ত করা হয়। আমের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ক্ষেত ভিজাতে হয় না বলে সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

চিত্র: বেসিন বা থালা পদ্ধতিতে সেচ

৫) রিং প্লাবন (Ring Irrigation)

দুপুর বেলা একটি গাছ যে জায়গা জুড়ে ছায়া প্রদান করে ছিক সেই সীমানায় নালা তৈরি করে সেচ প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত ফলগাছের বেলায় বেশি ব্যবহার করা হয়।

খ) নালা পদ্ধতি (Furrow method)

যেসব ফলগাছ গোড়ায় দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না, সেসব ফল গাছের জন্য এ পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী। সারি করে গাছ লাগানো হলে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারির দূরত্ব যদি খুব বেশি না হয় তবে দুই সারির মাঝে প্রয়োজনমত গভীর বা অগভীর নালা তৈরি করে নালায় পানি সরবরাহ করলে তা সহজেই গাছের শেকড়াঞ্চলে পৌছতে পারে।

গ) ড্রিপ বা বিন্দু সেচ পদ্ধতি (Drip irrigation method)

এই পদ্ধতিতে ছিদ্রযুক্ত নলের সাহায্যে গাছের গোড়ায় ফোটায় ফোটায় সেচ দেয়া হয় এতে পানির কোন অপচয় হয় না। এখানে সেচের জন্য পানি যাওয়া দুরুহ সেই ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। শুধুমাত্র গাছের গোঁড়ায় পানি যাওয়ার কারণে গাছের চারিদিকে আগাছা কম হবে। কারণ মুল গাছটিই কেবল পানি পাবে

ফলে অন্য গাছ বা আগাছা পানি না পেয়ে বাড়তে পারবে না। ছাদ বা বসতবাড়ির ফল বাগানে অনক সময় গাছের গোড়ায় পানি দ্রুত শুকিয়ে যায়। বার বার পানি দিতে হয়। এতে সময়, শ্রম এবং খরচ বেড়ে যায়। অন্যদিকে সুষম সেচের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ব্যহত হওয়ায় তা থেকে কাংখিত ফলন পাওয়া যায় না। এজন্য ফল বাগানে ড্রিপ ইরিগেশন বা ড্রপ সেচ খুবই কার্যকরী এবং বিশ্বব্যাপী সমাদৃত একটি সেচ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে এক সাথে সেচ এবং সারও (লিকুইড আকারে) প্রদান করা যায়। এতে গাছের বৃদ্ধি, উন্নয়ন ও ফলন ভাল হয়। বাণিজ্যিক বা বড় বাগানে ড্রিপ সেট ইনস্টল করে নিতে হয়।

ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেমটি দুইভাবে স্থাপন করা যায়। সাধারন পাম্পে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে। আবার সোলার পাম্প স্থাপন করে বিদ্যুত ছাড়াও কাজ করা যায়। সোলার ড্রিপ ইরিগেশন পদ্ধতির মাধ্যমে একই সাথে সাশ্রয় হয় পানি, সার এবং শ্রম।এই সিস্টমে কৃষির বহুমুখি খরচ থেকে কৃষক বাচতে পারে। এ পদ্ধতি ফল বাগান ও গ্রীন হাউজের জন্য বিশেষ উপযোগী।

চিত্র: ছাদ বাগানে ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ

চিত্র: ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ

ড্রিপ ইরিগেশনের যন্ত্রপাতি

- রিজার্ভ পানির ট্যাংকি একটি
- সাধারন পাম্প বা সোলার পাম্প
- ৬ মিলি/ ৮ মিলি/ ১০ মিলি ড্রিপ ইরিগেশন পাইপ
- অটো কন্ট্রোলার একটি (যদি সেচ পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় করতে চান)
- ফিটিং ও ড্রিপ নজেল, স্প্রিংকলার ইত্যাদি প্রয়োজন মত।
- ৫/৬ ফুট উচ্চতায় পানির ট্যাংক স্থাপন করলে বিদ্যুত বা পাম্প কোনটারই প্রয়োজন হয়। তবে সেক্ষেত্রে ট্যাংকে ম্যানুয়ালি পানি উঠাতে হবে।

ড্রিপ ইরিগেশন সিসটেমের বৈশিষ্ট ও সুবিধা সমুহ

- দুপ্রাপ্য পানি সম্পদের মিতব্যয়ী ব্যাবহার। ড্রিপ ইরিগেশন পদ্বতিতে চাষ করলে ৭০% সেচের পানি সাশ্রয় হয়
- উচ্চ উৎপাদনশীলতা
- সাবসারফেস ড্রিপ ইরিগেশন শিডিউলিং
- সহজ স্থাপনা কৌশল

২০২৪

- যে কোন ফসল যথা ধান, তরিতরকারী, ইক্ষু, ফলসহ অন্যান্য ফসল
- প্রায় ৫/৬ ফুট উচ্চতায় পানির ট্যাংক স্থাপনার ফলে গ্রেভিটি সিসটেমের কারণে পাম্প বা পাওয়ারের প্রয়োজন হয় না।
- ড্রিপ ইরিগেশনের ক্ষেত্রে আগাছা জন্মানোর প্রবনতা কম থাকে
- ড্রিপ ইরিগেশনে ৫০% সার কম লাগে, কারন ড্রিপ ইরিগেশনে প্রয়োজনীয় সার রিজার্ভ ট্যাংকিতে দিলে প্রতিটি
- গাছের গোড়ায় চলে যায় যার কারনে সার অপচয় হয় না
- চাইলেই এটা প্রয়োজন মত বাড়িয়ে নেয়া যায়

কতিপয় ফল গাছের জন্য উপযোগী সেচ পদ্ধতি

সেচ পদ্ধতি	ফল গাছের নাম
বেসিন	কাঁঠাল, আম, জাম, পেয়ারা, লিচু এবং অধিকাংশ বৃক্ষজাতীয় ফল।
নালা	আনারস, কলা, পেঁপে, তরমুজ, ফুটি, স্ট্রবেরী।
মুক্ত প্লাবন	কাঁঠাল, আম, জাম, পেয়ারা, লিচু, কলা, এলাচী লেবু।
ড্রিপ বা বিন্দু সেচ	সকল প্রকার ফলগাছ।
বর্ষণ বা স্প্রিংকলার	স্ট্রবেরী, আনারস, কাগজী ও এলাচী লেবু।

ঝ) সাথী ফসল চাষ (Intercropping)

গাছ লাগানোর প্রথম ১০-২০ বছর ফল বাগানের ফাঁকে ফাঁকে শাকসবজি, রবিশস্য অথবা ডালজাতীয় ফসল আবাদের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এতে বাগানের জমি উর্বর থাকে এবং ফল গাছের জন্য ভাল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ার ১ মিটারের মধ্যে কোন ফসল না থাকে।

ঞ) ফল পাতলাকরণ

বয়স্ক গাছে খুব বেশি ফল রাখলে ফলের আকার ছোট হয়, ডাল ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ফল ভর্তি গাছের অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল ফল প্রথম অবস্থায় পেড়ে কমিয়ে ফেলা উচিত।

ট) ফল গাছের বৃদ্ধি হরমোনের ব্যবহার

উদ্ভিদদেহে স্বাভাবিক হরমোন উৎপন্ন হলেও বর্তমানে কৃত্রিম হরমোন ও তৈরি হচ্ছে । এই সব কৃত্রিম হরমোনের মধ্যে ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড (IBA), ন্যাপথালিন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (NAA), ডাই-ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (2, 4-D) প্রভৃতি প্রধান । কৃত্রিম হরমোনগুলি কম পরিমাণে বেশি কার্যকরী হওয়ায় আজকাল কৃষিকার্যে এর ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে ।

কৃত্রিম হরমোনের ব্যবহার

১। **বীজহীন ফল উৎপাদন:** নিষেকের আগেই অর্থাৎ পরাগযোগ ও নিষেক ছাড়া ডিম্বাশয়ে কৃত্রিম অক্সিন [IBA, IAA] প্রয়োগ করে বীজবিহীন এবং আয়তনে বড় ফল উৎপাদন করা হয়। এই পদ্ধতিকে পার্থেনোকার্পি বলে। এইসব ফলের মধ্যে পেঁপে, পেয়ারা, খেজুর, আঙ্গুর, টম্যাটো, কলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

২। **শাখা কলমে মূল সৃষ্টি:** শাখা কলমের দ্বারা বংশ বিস্তারের সময় নানান কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করে কলমে তাড়াতাড়ি মূল সৃষ্টি করা হয় । গোলাপ, জবা, বেল ইত্যাদি ফুলগাছ এবং আম, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের গাছের শাখা কলম তৈরি করার সময় IBA ও NAA বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় ।

৩। **আগাছা নির্মূল:** ধান, গম, যব ইত্যাদির খেতে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ অর্থাৎ আগাছা নির্মূল করার জন্য 2, 4-D, MCAA (মিথাইল ক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড) প্রভৃতি কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করা হয় । কারণ কৃষিকার্যে আগাছাগুলি হল বাঞ্ছিত উদ্ভিদের প্রধান শত্রু ।

৪। **ক্ষতস্থান পূরণ:** চা, পাতাবাহার, আপেল, নাশপাতি, ইত্যাদি গাছের ডাল ছাঁটার পর বেশি ঘনত্বের কৃত্রিম অক্সিন অর্থাৎ IAA (১%) দ্রবণ ছিটিয়ে

৫। **উদ্ভিদের অপরিণত অঙ্গের মোচন রোধ:** কৃত্রিম হরমোনের (2, 4-D, NAA) দ্রবণ ছিটিয়ে উদ্ভিদের নানান অপরিণত অঙ্গের (যেমন: পাতা, মুকুল, ফুল, ফল ইত্যাদি) অকালমোচন রোধ করা হয় ।

৬। **অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত করা:** কৃত্রিম জিব্বেরেলিন প্রয়োগের দ্বারা বীজের সুপ্ত অবস্থা ভঙ্গ করে দ্রুত অঙ্কুরোদ্গম ঘটানো হয় ।

৭। **মুকুলোদ্গম বিলম্বিত করা:** অ্যাবসাইসিক অ্যাসিড (Abscisic Acid) প্রয়োগ করে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির মুকুলোদ্গম বিলম্বিত করা হয় ।

৮। **ফল ধরতে সহায়তা করা:** আনারস, লেবু, আপেল, ইত্যাদি গাছের কৃত্রিম হরমোন ছিটিয়ে গাছের ফল ধারণ ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করা হয় ।

৯। **ফলের বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা:** IBA বা 2, 4-D নামক কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রজাতির ফলের আয়তন বৃদ্ধি ও পরিপক্কতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় ।

ঠ) রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন

সাধারণত গড়ে প্রতিবছর শতকরা ১০-১৫ ভাগ ফল বালাই দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। ফলদ গাছের প্রতিষ্ঠাকালে বিভিন্ন ধরনের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এই বালাইজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য কৃষকদের নিকট লাগসই দমন কলা-কৌশল পৌঁছানো একান্ত প্রয়োজন। এজন্য নিয়মিত বাগান পরিদর্শন এবং প্রতিটি গাছ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে রোগবালাই দমনের ব্যবস্থা নিলে বাণিজ্যিকভাবে বাগান স্থাপন লাভজনক হবে। একটি মাত্র দমন পদ্ধতির দ্বারা সকল প্রকার পোকা সফলভাবে দমন করা বাস্তবে সম্ভব হয় না। প্রয়োজনে একাধিক দমন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসরণ করা হয়। রোগ ও পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল (**আইপিএম পদ্ধতি) অনুসরণ করে ক্ষতিকারক পোকামাকড়/ রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। যেমন-**

১. সুস্থ, সবল চারা/কলম রোপণ।

২। ফল বাগানে প্রাথমিক অবস্থায় পোকা সংখ্যায় কম থাকে বিধায় পোকা বা ডিম সংগ্রহ করে মেরে ফেলাই ভালো।

২০১৪

২. আক্রান্ত পাতা বা ডাল পালার অংশ ছেঁটে বা কেটে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

৩. ঠিকমতো চাষ দিয়ে ওলট-পালট করে ১০-১৫ দিন রোদ খাওয়ানো হলে অনেক পোকা ও রোগের জীবাণু ধ্বংস হয়।

৪. রাতে বিচরণকারী পোকা আলোর ফাঁদ পেতে মেরে ফেলা একটা উত্তম উপায়।

৫. বাগানের আশপাশে ঝোঁপ-জঙ্গল থাকলে সেখানে রোগ ও পোকার বংশ বৃদ্ধির আড্ডা হয়। কাজেই, এসব অংশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে রোগ পোকার উপদ্রব কমবে।

৬. সুযোগ থাকলে বাগান ২-৪ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখলেও অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস করা যায়।

৭. অন্তর্বর্তী (ইন্টার ক্রপ) ফসল আবাদে বাগানে একই জাতীয় ফসল বার বার চাষ না করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ করে ফসল চক্র পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ফসলের পোকা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৮. ফসল সংগ্রহ শেষে খড় কুটো রেখে আগুন ধরিয়ে দিলে অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস হয়। একই ভাবে মশাল জ্বালিয়ে ফল বৃক্ষের গোড়া ও মোটা ডালের অংশে তাপ দিলে অনেক পোকা ও রোগ জীবাণু ধ্বংস হবে।

৯. সেক্স ফেরমন ফাঁদ একবার ব্যবহার করে ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত পুরুষ পোকা (মথ) ধ্বংস করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পরিবেশ সহায়ক আধুনিক এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

১০. আম, পেয়ারা, কলা ও অন্যান্য ফলে ব্যাগিং করা, আম ও পেয়ারায় সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা অথবা পোকা ও রোগ দমনকারী জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

১১. ফল আবাদে সীমিত আকারে প্রয়োজনে কীটনাশক/ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে। কেমিক্যাল ব্যবহারে খেয়াল রাখতে হবে যেন উহা মানুষ/পশুপাখির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। রোগ পোকার উপদ্রব বেশি বাড়লে তা দমনে সঠিক মাত্রায়, সঠিক রোগবালাই নাশক ব্যবহার করে আক্রমণের ব্যাপকতা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি ২ গ্রাম/লিটার বা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ডায়জিনন ৬০ ইসি বা ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি ইত্যাদি ২ মিলি/লিটার অথবা এডমায়ার ২০০ এসএল ০.২৫ বা কার্বোসালফান (মার্শাল) ৪০ ডব্লিউ এসসি ২ মিলি/লিটার হারে কীটনাশক স্প্রে করে বিভিন্ন ধরনের পোকা দমন করে ফল ফসল রক্ষা করা যায়। মাকড়দমনে ওমাইট বা ভার্টিমেক প্রয়োগ করা হয়। ছত্রাক দমনে রিডোমিল গোল্ড (২গ্রাম/লিটার) বা টিল্ট (০.৫ মিলি/লিটার) স্প্রে করা যায়। বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ণ) ফল সংগ্রহ

অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করলে গুণগতমান বজায় থাকে না এবং চাষীরা ফলের সঠিক মূল্য পায় না। । গাছ থেকে ফল সংগ্রহের সময় সাবধান হওয়া দরকার। মোচড় দিয়ে, ডাল ভেঙ্গে অথবা গাছে বা ডালে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক না। এতে গাছের ক্ষতি হয়, সংগ্রহীত ফলের মান কমে যায়। আমাদের দেশে সাধারণত মই, ঝুড়ি, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দ্বারা গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়। গাছ থেকে সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফল আঘাত না লাগে বা থেতলিয়ে না যায়। যে সব ফল সংগ্রহকারীর নাগালের বাইরে থাকে সেগুলো উঁচু মই বা প্লাটফরম মই ব্যবহার করে সংগ্রহ করা উচিত। হাত দ্বারা ফল সংগ্রহের সময় বোটাসহ ফল পাড়া উচিত।

২০১৪

ত) ফলের বাজার ব্যাস্থাপনা: ফলের উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় বা বিভিন্ন বাগান থেকে বাজারে ফল আনার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, সংগৃহিত ফলসমূহ বিক্রির পূর্ব পর্যন্ত তার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো, সংরক্ষণ বা মজুদের যথাযথ সুবিধা গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়া দরকার।

পাঠ সংক্ষেপ

- বর্তমানে দেশীয় ফলের সাথে বিদেশি ফল যেমন- স্ট্রবেরি, রাম্বুটান, ড্রাগনফল, এভোকাডো প্রভৃতির চাষে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।
- বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কাঁঠাল উৎপাদনে ২য়, আম উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম, পেঁপে উৎপাদনে ১৪তম এবং মৌসুমী ফল উৎপাদনে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় উঠে এসেছে আমাদের সুজলা-সুফলা এই সোনার বাংলা।
- বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির মধ্যে ফলের আওতায় ১- ২% জমি রয়েছে।
- জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ১৯ ভাগ, মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ৬০ ভাগ এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ফলের প্রাপ্যতা শতকরা ২১ ভাগ।
- সাধারণত: দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটিতে অধিকাংশ ফল জন্মে। তবে আনারস ও কাঁঠাল অম্লীয় এটেল দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়।
- নির্দিষ্ট জমিতে বর্গাকার পদ্ধতি অপেক্ষা ষড়ভূজী পদ্ধতিতে শতকরা ১৫টি গাছ বেশি সঙ্কুলান হয়।
- মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস বেশির ভাগ ফলদ বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত সময়।
- নারিকেল, সুপারি, পেঁপে, কলা প্রভৃতি আঁশ জাতীয় গাছে পটাশ বা ছাই জাতীয় সারের চাহিদা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি।
- গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকে বৃক্ষভেদে ০.৫-১.৫ মিটার কান্ড রেখে নিচের সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে।

এসো নিজে করি

একটি আম বাগান করার জন্য ১০ মিটার দূরে দূরে সারি ও ১০ মিটার দূরে দূরে চারা/কলম রোপণ করা হলে ১ হেক্টর জমিতে মোট কতটি চারার প্রয়োজন হবে?

১ হেক্টর=১০,০০০ বর্গমিটার

$$\text{আম বাগানে মোট গাছের সংখ্যা} = \frac{\text{১০,০০০ বর্গ মিটার}}{\text{১০ মিটার x ১০ মিটার}} = \frac{\text{১০,০০০ বর্গ মিটার}}{\text{১০০ বর্গ মিটার}} = \text{১০০ টি}$$

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতোমধ্যে তুমি ফল বাগানে কিভাবে সেচ প্রদান করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা ফল বাগানে সেচ প্রদান করে করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কী পদ্ধতিতে কোথা থেকে সেচ প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বর্তমানে কত প্রজাতির ফল চাষ হচ্ছে?
২। রোপণ উপযোগী চারা/কলমের বয়স কত হওয়া উচিত?
৩। বর্গাকার প্রণালীতে কি ধরনের ফল রোপণ করা হয়?
৪। আম ও পেয়ারার রোপণ দূরত্ব কত?
৫। আঁশ জাতীয় ফল গাছ কি সার পছন্দ করে?
৬। ফল বাগানে শূন্যস্থানে কি রকম চারা লাগানো হয়?
৭। প্রুনিং কখন করতে হয়?
৮। ফল বাগানে ব্যবহার হয় এমন ২টি সেচ পদ্ধতি লিখ।
৯। ২টি কৃত্রিম হরমোনের নাম লিখ।
১০। বালাই দ্বারা প্রতি বছর শতকরা কত ভাগ ফল নষ্ট হয়?
১১। ১টি করে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশকের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। ভালো চারা/কলমের গুণাগুণ কি কি?
২। ফল বাগান স্থাপনে স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লিখ।
৩। ফল বাগানের নকশা কাহাকে বলে। নকশার মধ্যে কি কি বিষয়সমূহ থাকে?

৪। বর্গাকার প্রণালী বর্ণনা কর।
৫। কন্টুর পদ্ধতি কি?
৬। ট্রেনিং ও প্রুনিং এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৭। ফল বাগানে ব্যবহৃত সেচ পদ্ধতিসমূহের নাম লিখ।
৮। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৯। ৫টি কৃত্রিম হরমোনের নাম লিখ।
১০। পোকা ও রোগ দমনে ১টি করে বালাইনাশকের নাম ও প্রয়োগমাত্রা উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ফলের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২। ফল গাছ লাগানোর নকশাগুলো বর্ণনা কর।
৩। চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
৪। ফল গাছের চারা রোপণপরবর্তী পরিচর্যার ধাপগুলো বর্ণনা কর।
৫। ফল বাগানের সেচ ব্যবস্থাপনা বর্ণনা কর।

জব ২.১: ফল চাষের জন্য বাগানের বর্গাকার পদ্ধতিতে নকশা তৈরি অনুশীলন

শিখনফল

- ফল চাষে বিভিন্ন ধরনের নকশা সম্পর্কে বলতে পারবে।
- বর্গাকার পদ্ধতিতে নকশা তৈরি ও গাছের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাবস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী

লাভজনকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত বা পরিকল্পিত ফল বাগান স্থাপন করতে হলে বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। বাগান তৈরির আগে প্রথমে কাগজে নকশা তৈরি করে ভুলত্রুটি দেখে নিতে হবে। জমির সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অপচয় রোধে প্রত্যেকটি কাজের জন্য জমি চিহ্নিত করে ফল গাছের রোপণ পদ্ধতি অনুযায়ী রোপণ দূরত্ব ঠিক করে, সেচ পদ্ধতি, পরিচর্যা ইত্যাদি বিষয় বাগানের নকশায় উল্লেখ করতে হবে। বাগানের নকশায় মাটির উর্বরতা ও অবস্থান দেখে সর্বাধিক সংখ্যক গাছ লাগানো যায় এবং প্রতিটি গাছ নির্ধারিত দূরত্বে সুন্দরভাবে আলো বাতাস পেয়ে বড় হতে পারে। ফল বাগানের বিভিন্ন ধরনের নকশার মধ্যে বর্গাকার পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং মাঠে সহজে নকশা প্রণয়ন করা যায়। এ পদ্ধতিতে পাশাপাশি দু'সারির গাছগুলোকে এমনভাবে রোপণ করা হয়, যাতে সারি হতে সারি এবং গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরস্পর সমান থাকে। অর্থাৎ পাশাপাশি দুসারির ৪টি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি করে। বর্গক্ষেত্রের চারকোনার স্থানগুলোতে গাছ রোপণ করা হয়। আম, কাঁঠাল, লিচু, সফেদা, জাম, জামরুল, পেয়ারা, পেঁপে প্রভৃতি ফল গাছের চারা এ পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। এ ধরনের নকশার জন্য সমতল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি সমতল না হলে চাষ দিয়ে সমান করে নিতে হবে। জমির আইল আঁকাবাকা বা জমি অনিয়মিত আকারের হলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় গাছ হতে গাছের দূরত্ব পরিবর্তন করা প্রয়োজন হতে পারে।

গাছের সংখ্যা= সারির সংখ্যা X সারিতে গাছের সংখ্যা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সাদা কাগজ, ২। পেন্সিল, রাবার, শাপনার, ৩। ত্রিকোণী (সেট ও মিটার স্কেল), ৪। শক্ত খুঁটি বা কাঠি, ৫। মাপার ফিতা, রশি বা সূতলী, ৬। ফল গাছ রোপণের জন্য চিহ্নিত স্থানে স্থাপনের জন্য চিকন কাঠি। ৭। ক্যালকুলেটর।

কাজের ধারা

১) জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ নিতে হবে।

২। এরপর কাগজে জমির নকশা মোতাবেক মাপ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩। কাগজে জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মোতাবেক লাইন টানতে হবে। এভাবে দুইদিকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ লাইন টানলে একটি আরেকটির উপর লম্ব তৈরি হবে। এভাবে জমির নকশা অনুযায়ী কাগজে জমির চারিদিকের বাউন্ডারী বা সীমানা লাইন টানতে হবে।

৪। এরপর বাউন্ডারী রেখা জমির ভিতর দিকে সারি থেকে সারির দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব বাদ দিয়ে গাছ লাগানোর রেখা (মূল রেখা ও মুক্ত রেখা) টানতে হবে।

৫। এভাবে মূল রেখা টানার পর ঐ রেখার একপ্রান্ত হতে গাছ হতে গাছের যে দূরত্ব হবে তার দূরত্বের অর্ধেক দূরত্ব বাদ দিয়ে প্রথম গাছ লাগানোর চিহ্ন দিতে হবে। এরপর গাছ হতে গাছের যে দূরত্ব হবে তা পর পর চিহ্নিত করতে হবে।

৬। মূল রেখা টানার পর এর সমান্তরাল করে সারি হতেত সারির দূরত্ব চিহ্নিত করে লাইন টানতে হবে।

৭। জমির কিনারা হতে মূলরেখা (সারি হতে সারির দূরত্বের অর্ধেক বাদ দিয়ে) টানার পর ঐ সারিতে গাছ হতে গাছের দূরত্ব নিয়ম মোতাবেক চিহ্নিত করতে হবে। এ সকল চিহ্ন হতে লম্ব টানা হলে (মুক্ত রেখার) অন্যান্য সমান্তরাল রেখার উপর যেখানে অতিক্রম করবে সেখানে চিহ্ন দিতে হবে।

৮। মূল রেখার সমান্তরাল রেখার উপর লম্বাভাবে অতিক্রম করা স্থানগুলো চিহ্নিত করে যোগ করলে এক একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি হবে।

৯। এভাবে কাগজের নকশা অনুযায়ী জমির সীমানা হতে একদিকে গাছ লাগানোর জন্য সরল লাইন তৈরি করতে হবে। এই লাইনের সাথে অন্য লাইনের লম্ব তৈরির জন্য রশি নিয়ে ৩:৪:৫ অনুপাতে চিহ্নিত করতে হবে। এরপর দুই দিকে রশির লাইন প্রসারিত করলে একটি ৯০° কোন তৈরি হবে। এই প্রসারিত লাইন জমির শেষ পর্যন্ত নিতে হবে। এখন দুইদিকের প্রসারিত লাইনে (গাছ হতে গাছ এবং সারি হতে সারি) গাছ লাগানোর দূরত্বে প্ল্যান্টিং বোর্ড বা খুঁটি পুতে চারা রোপণের স্থানগুলো চিহ্নিত করা যাবে।

১০। রশির দুই দিকের লাইনের প্রতিটি চিহ্ন হতে পরস্পর লম্ব রেখা বরাবর রশি নিয়ে জমির অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে হবে।

১১। এভাবে উভয়দিকের পরস্পর লাইনের উপর হতে নেয়া রশির সংযুক্তি স্থানগুলোতে কাঠি পুতে চিহ্নিত করতে হবে। এই চিহ্নিত স্থানগুলো গ্রাফ পেপারে অংতি বর্গক্ষেত্রের মত দেখাবে।

১২। এভাবে সারা জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে মাঠে গাছ লাগানোর স্থান চিহ্নিত করা যাবে।

বর্গাকার পদ্ধতিতে জমিতে গাছের সংখ্যা নির্ণয়-

এ পদ্ধতিতে গাছ হতে গাছ এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান থাকে।

১ হেক্টর=১০,০০০ বর্গমিটার

$$\text{১ হেক্টর জমিতে মোট গাছের সংখ্যা} = \frac{\text{১০,০০০ বর্গ মিটার}}{\text{সারি হতে সারির দূরত্ব (মিটার) x গাছ হতে গাছের দূরত্ব (মিটার)}}$$

২০২৪

কাজের সতর্কতা

১। বর্গের কোণগুলো সমকোন বা ৯০° হবে।
২। চিহ্নের অবস্থান ঠিক রাখতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি বর্গাকার পদ্ধতিতে ফল গাছের নকশা তৈরি ও গাছের সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ২.১: ফল বাগানে গর্ত তৈরি, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি

শিখনফল

- ফল চাষে গাছের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি ও জীবাণুমুক্ত করতে পারবে।
- গর্তে প্রয়োগের জন্য জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।
- গর্তের মাটির সাথে সার সঠিক পরিমান ও পদ্ধতিতে মিশিয়ে চারা রোপণের উপযোগী করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১। প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২। জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩। যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪। কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫। অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬। কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

লাভজনকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত বা পরিকল্পিত ফল বাগান স্থাপন করতে হলে জমি ভালোভাবে চাষের পর বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণের স্থানে গর্ত করা উচিত। অত:পর খননকৃত গর্তে সার প্রয়োগ করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি

১। কোদাল, ২। খন্তা ও শাবল, ৩। পচা গোবর ও রাসায়নিক সার, ৪। ঝুড়ি, ৫। মাপযন্ত্র বা ট্যাপ, ৬। ঝরণা, ৭। বাঁশের কাঠি, ৮। দড়ি, ৯। বাঁশের খাচা।

কাজের ধারা

১) জাতভেদে সকল ধরনের ফল গাছ রোপণের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম।

২) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে। মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৩) চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে।

৪) জমি তৈরি সম্পন্ন হলে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে নিচে উল্লেখিত আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে-

গাছের আকৃতি	চারা বসানোর গর্তের মাপ (ঘণ সেমি)
বড় গাছ (আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তেতুল)	৯০ সেমি X ৯০ সেমি X ৯০ সেমি
মাঝারি গাছ (পেয়ারা, কুল, আতা, ডালিম, লেবু)	৬০ সেমি X ৬০ সেমি X ৬০ সেমি
ছোট গাছ (ডালিম, কলা, পেঁপে)	৫০ সেমি X ৫০ সেমি X ৫০ সেমি
খুব ছোট গাছ (আনারস, স্ট্রবেরী)	১৫ সেমি X ১৫ সেমি X ১৫ সেমি

২০২৪

মাটি শক্ত ও কাদা মাটিতে বড় আকারের গর্ত খুবই উপযোগী। বেলে দো-আঁশ বা হালকা ধরনের মাটির জন্য গর্তের আকার কিছু ছোট হলেও চলে।

৪) গর্ত খননকালে গর্তের উপরের তিন ভাগের দুই ভাগ মাটি একদিকে এবং নিচের বাকী তিন ভাগের এক ভাগ মাটি অন্যপার্শ্বে রাখতে হবে। গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকিয়ে নেয়া ভাল। গর্তের ভিতর পাতা পুড়িয়ে রোগ জীবাণু বা পোকার কীড়া নষ্ট করা যায়। কয়েক দিন সূর্যের আলো গর্তে পড়লেও রোগজীবাণু মারা যায়।

৫) এক সপ্তাহ পরে গর্তের উপরের মাটির সংগে পচা গোবর ও রাসানিক সার নিচে উল্লেখিত পরিমান মিশাতে হবে

গাছের আকৃতি	গোবর সার	খৈল	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	ছাই	ডলোচুন
বড় আকৃতির গাছ (আম, কাঁঠাল, লিচু)	২০ কেজি	২ কেজি	১৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	২ কেজি	১৫০ গ্রাম
মাঝারী আকৃতির গাছ (পেয়ারা, বাতাবী লেবু, জলপাই)	১৫ কেজি	১.৫ কেজি	১০০ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৭৫ গ্রাম	৪ কেজি	১০০ গ্রাম
ছোট গাছ (কাগজি লেবু, ডালিম, শরিফা)	১০ কেজি	১ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	৩ কেজি	১০০ গ্রাম

জীবাণু ও পোকার কীড়া নষ্ট করার পর গর্তের উপরের মাটির সাথে উপরে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর। উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

৬) সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ গর্তে চারা রোপণের উপযোগী হয়। চারা পট বা পলিথিন ব্যাগ থেকে সাবধানে বের করতে হবে।

৭) এখন চারার গোড়ার বলের পরিমান মাটি গর্ত হতে সরিয়ে রাখতে হবে। এরপর পলিথিন ব্যাগটি চাকু দ্বারা লম্বালম্বিভাবে কেটে দিতে হবে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মাটির বলটি পলিথিন ব্যাগ কাটার সময় অথবা পট থেকে বের করার সময় ভেঙ্গে না যায়।

৮) এখন চারাটি সোজা করে গর্তে বসাতে হবে। গর্তে বসানোর সময় দেখতে হবে যেন বেশি নিচে বা উপরে লাগানো না হয়। আগে যে পরিমান নিচে পুঁতা ছিল ঠিক তা বজায় রাখতে হবে। গর্তে চারা বসানোর পর গর্ত

হতে সরিয়ে নেয়া মাটি দিয়ে বলটি ভালো করে চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর তাতে ঝাঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে।

৯) চারা লাগানোর পর উত্তর -পশ্চিম কোনা বরাবর গাছের সহায়ক খুঁটি দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে চারা বাতাসে হেলে গাছের ক্ষতি হবে।

১০) চারা রোপণের পর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের প্রথম কয়েকদিন কেবল পাতায় পানি দিয়ে চারাকে সতেজ রাখতে হবে এবং কয়েকদিন হালকা ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়। বাঁশের খাচা দিয়ে চারাটি গরু ছাগলের আক্রমণ হতে রক্ষারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। হালকা মাটিতে গর্ত খননের সময় সাবধানে খনন করতে হবে যেন গর্তে পাড় ভেঙ্গে না যায়।

২। খননকৃত গর্ত ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যেন রোগজীবাণু মারা যায় এবং বিষাক্ত পদার্থ দূরীভুত হয়।

৩। পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা উচিত।

৪। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

৫। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

৬। সার ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

২০২৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফল গাছের বংশবিস্তার
(Propagation of Fruit Plants)

সব গাছ চায় ওদের বংশধর বেঁচে থাকুক দুনিয়ায়। তাই বীজকে সুস্বাদু ফলের ভেতরে রেখে দেয়। যাতে সেই ফল মানুষ বা পশুপাখী খাওয়ার জন্য নিয়ে যায়। ফল খাওয়ার পর বীজ ফেলে দেয়া হয় অনাদরে। আর সেই বীজ থেকে সময় সুযোগ মত নতুন বাচ্চা গাছ জন্ম নেয়। আমাদের অনেকের বাড়িতেই ফল গাছ আছে যেমন: কাঁঠাল, নারিকেল, পেয়ারা, বরই, আম ইত্যাদি। আবার কোথাও বেড়াতে গেলেও এরকম ফল গাছ দেখতে পাই। তবে খেতে মিষ্টি বা আকর্ষণীয় কোন ফল দেখলে মনে হয় আমাদের বাড়িতে যদি এমন একটি গাছ থাকতো। এই অধ্যায়ে খুব সহজেই আমরা কিভাবে আমাদের কাংখিত ফল গাছের জন্ম দিতে পারবো তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। একটি গাছ বা একাধিক গাছ হতে নতুন কোন চারা পাওয়াকে গাছের বংশবিস্তার বলা যেতে পারে। আমরা গাছের বীজ বা অন্যান্য অংগ থেকে নতুন গাছের চারা বা কলম পেতে পারি।

এই অধ্যায় শেষে-

- বংশবিস্তারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখা করতে পারবে
- বিভিন্ন বংশবিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবে
- চারা উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করতে পারবে
- কাটিং, গ্রাফটিং, বাডিং ও লেয়ারিং করতেপারবে

কোনো একটি উদ্ভিদ প্রজাতির টিকে থাকা ও সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সংক্ষেপে ঐ উদ্ভিদের বংশবিস্তার বলা যায়। ফল গাছ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বংশবিস্তার করে থাকে। কোন কোন ফল গাছ শুধুমাত্র বীজের মাধ্যমে আবার কোন কোন ফল গাছ বীজ ও অঙ্গজ উভয় পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে থাকে। কিছু কিছু ফল গাছে অঙ্গজ চারা উৎপাদন প্রায় অসম্ভব কিংবা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল, যেমন- নারিকেল। এসব ক্ষেত্রে চারা উৎপাদনের জন্য বীজ ব্যবহার করাই শ্রেয়। আবার যেসব ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে প্রযোজ্য সেখানে অঙ্গজ বংশবিস্তারের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করাই ভাল। ফল গাছ রোপনের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাল, উন্নতমান ও মাতৃগুন সম্পন্ন ফল পাওয়া। এ কারণে, ফল গাছ রোপনের ক্ষেত্রে যৌন পদ্ধতির তুলনায় অযৌন পদ্ধতির চারা বা কলম গুরুত্বপূর্ন।

২.১ বংশবিস্তারের শ্রেণিবিভাগ

২.১.১ গাছের বংশবিস্তার: সাধারণভাবে একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের জন্ম হওয়ার পদ্ধতিকে গাছের বংশবিস্তার বলে। অন্য কথায়, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ যৌন বা অংগজ কোষ থেকে নুতন স্বতন্ত্র গাছ সৃষ্টি করে তাকে বংশবিস্তার বলে।

২.১.২ বংশবিস্তারের শ্রেণিবিভাগ: বংশবিস্তার দুই প্রকার

১। যৌন বংশবিস্তার এবং ২। অযৌন বংশবিস্তার

১। যৌন বংশ বিস্তার: বীজ দ্বারা গাছের যে বংশবিস্তার হয়ে থাকে তাকে যৌন বংশবিস্তার বলা হয়। ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ হয়। বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদের জন্ম হয়। ফুল ⟶ ফল ⟶ বীজ ⟶ নতুন গাছ ।

২। অযৌন বংশ বিস্তার: প্রকৃত বীজ ব্যতীত গাছের অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে যখন বংশবিস্তার করা হয় তখন তাকে উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবিস্তার বলে। এক্ষেত্রে গাছের মূল, কান্ড, শাখা, পাতা প্রভৃতি অঙ্গ দিয়ে চারা উৎপাদন করা হয়।

২.১.৩ যৌন ও অযৌন বংশবিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধা

যৌন পদ্ধতির সুবিধা

১) যে সব ফল গাছ সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করতে পারেনা, সেসব ফল গাছের বংশবিস্তারের জন্য যৌন পদ্ধতি একমাত্র উপায়। যেমন: তাল, নারিকেল প্রভৃতি। তবে বর্তমানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

২) বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারণত অধিক কষ্টসহিষ্ণু হয় ও বেশী দিন বাঁচে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়-বৃষ্টি, খরা বা যে কোন প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

৩) এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট গাছ অধিকতর মজবুত কান্ড ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট এবং সুগঠিত-বিস্তৃত শিকড় বিশিষ্ট হয়। গাছের প্রধান মূল মাটির বেশ অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে যা গাছকে যান্ত্রিক সহায়তা প্রদান করে।

৪) সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির আর কোন বিকল্প নেই।

২০২৪

৫) যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তারের জন্য তেমন কোন কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার দরকার হয় না।

৬) অপেক্ষাকৃত সহজ ও সস্তায় এবং কম পরিশ্রমে চারা পাওয়া যায়।

৭) বংশবিস্তারক দ্রব্য বা বীজ সহজে দূরবর্তী স্থানে নেয়া যায়।

৮) আদিজোড় (rootstock) হিসেবে ব্যবহার করার জন্য যৌন পদ্ধতির মাধ্যমে চারাগাছ জন্মানো যায়।

৯) বহুভ্রূণবিশিষ্ট বীজের একাধিক চারা মাতৃগুণ সম্পন্ন হওয়ায় বাগান তৈরীর কাজে এগুলোকে অধিক ব্যবহার করা যায়।

যৌন পদ্ধতির অসুবিধা

১) বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে কখনো মাতৃগাছের গুণাগুন অক্ষুন্ন বা বজায় থাকে না। এজন্য মিষ্টি আমের আটি থেকে উৎপন্ন গাছে যে আম হয় তা সাধারণত টক হতে দেখা যায়।

২) গাছ লম্বা, উঁচু ও বড় হওয়ায় ফল সংগ্রহ কষ্টকর হয়।

৩) এ প্রক্রিয়ায় জন্মানো গাছে ফুল-ফল আসতে দেরী হয়।

৪) গাছ বড় আকারের হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কম সংখ্যক গাছ লাগানো যায়।

৫) কিছু কিছু ফলের যৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করা যায় না। অংগজ বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে এদের বংশবিস্তার ঘটে। যেমন আনারস, কলা।

৬) আঙ্গিক বৃদ্ধি বেশী হওয়ায় ঝড়-বৃষ্টিতে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা থাকে।

অযৌন বা অঙ্গজ বংশবিস্তারের সুবিধা

১. কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাছ আছে যেমন- কলা, আনারস, আংগুর, ডুমুর, গোলাপ, গার্ডেনিয়া প্রভৃতি গাছ সজীব ও প্রকৃত বীজ উৎপাদন করতে পারে না। তাই এসব গাছের বংশকে টিকিয়ে রাখার জন্য অযৌন পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে হবে।

২. বীজ থেকে উৎপাদিত গাছের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই মাতৃগুন সম্পন্ন গাছ পেতে হলে অযৌন পদ্ধতিতে নতুন গাছ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়।

৩. অনেক গাছের বীজ খুব আস্তে আস্তে গজায় অথবা বীজের সজীবতা দ্রুত নস্ট হয়, সেক্ষেত্রে অযৌন বংশবিস্তার ছাড়া বিকল্প উপায় নাই।

৪. মাতৃ গুণাগুণ সমৃদ্ধ ফল পাওয়া যায়।

৫. অযৌন পদ্ধতিতে জন্মানো গাছ ছোট আকৃতির হয়। এজন্য এসব গাছের ফল সংগ্রহ ও পরিচর্যা সহজ হয়। অপর দিকে অল্প জায়গায় বেশি গাছা লাগানো যায়।

৬. এ পদ্ধতিতে নতুন গাছ তৈরিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সময় কম লাগে। অনেকটা সহজ উপায়ে ও কম খরচে বংশবিস্তার করা যায় (কচু, মিষ্টি আলু, আলু) ।

৭. একই গাছে একাধিক জাতের ফুল (গোলাপ) এবং ফল (আম) প্রাপ্তির সুবিধা পাওয়া যায়।

অযৌন বংশবিস্তারের অসুবিধা

১. এ পদ্ধতিতে কোন নুতন জাত উদ্ভাবন করা যায় না।

২. এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তারে খরচ ও শ্রম বেশী লাগে।

৩. এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে যথেস্ট কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা দরকার হয়।

৪. এ কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিক পাওয়া কষ্টসাধ্য।

৫. অংগজ উপায়ে বংশ বৃদ্ধিকারী গাছসমূহ সাধারণতঃ কম দিন বাঁচে।

৬. এ পদ্ধতি যে সব গাছের বংশবিস্তার ঘটানো হয়, সে সব গাছের শিকড় কম বিস্তারশীল হয় বিধায় ঝড় ঝাপটায় ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

৭. অংগজ অংশসমূহ পরিবহনে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

৮.স্টক বা সায়ন ডাল রোগাক্রান্ত হলে সম্পুর্ণ গাছটিতে রোগ দেখা দেয়। কলমের গাছে কিছু রোগ, যেমন- লেবুর ক্যাংকার

সহজে কলমের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

২.২ যৌন উপায়ে বংশবিস্তার পদ্ধতি

বীজ উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বীজ থেকে পলিব্যাগে ও বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হয়। বেশির ভাগ ফলের ক্ষেত্রে এ সকল চারা আদিজোড় হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক ফলের বীজ থেকে চারা তৈরি করা হয়।

২.২.১ পলিব্যাগে চারা উৎপাদন

যে নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা উৎপাদন করা হয় তাকে পলিব্যাগ নার্সারি বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ফল ও বনজ গাছের চারা উৎপাদনের জন্য সরাসরি বীজ অথবা অঙ্কুরিত বীজ পলিব্যাগে বপন করা যায়। পলিব্যাগ নার্সারিতে চারা উৎপাদনের অনেক সুবিধা থাকায় বেশিরভাগ ফলজ ও বনজ চারাই পলিব্যাগে উৎপাদন করা হয়। পলিব্যাগ নার্সারিতে চারা উৎপাদন করার প্রধান সুবিধাগুলো হলো-

- যে কোন মাপের এবং ঘনত্বের তৈরি করা যায়।
- মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।
- হালকা ও সহজে পরিবহনযোগ্য।
- পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার পরিচর্যা করা সহজ এবং চারা মৃত্যুহার কম।
- পলিব্যাগের চারা পরিবহন করা সহজ এবং পরিবহনে চারার কোন ক্ষতি হয় না।
- পলিব্যাগের চারা রোপণ করা সহজ ও মৃত্যুহার কম।

পলিব্যাগে চারা উৎপাদন

চারা উৎপাদন: এটি চারা উৎপাদনের একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রদ্ধতি। পূর্বে শুধুমাত্র বেডে চারা উৎপাদন করা হতো এবং সেসব চারা মাটির বলসহ বা উপড়ে তুলে নিয়ে লাগানোর জন্য নেয়া হতো। এভাবে চারা তোলার ফলে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং পরবর্তীতে রোপিত চারা অনেক ক্ষেত্রে মারা যায়। বর্তমানে বীজতলায় সরাসরি চারা উৎপাদনের চেয়ে নার্সারীতে পলিব্যাগে উত্তোলনই বেশি জনপ্রিয়। পেঁপে, পেয়ারা ও বনজ উদ্ভিদের বীজ থেকে চারা তৈরির জন্য কালো পলিব্যাগ ব্যবহার করা ভাল। বিভিন্ন ফসলের চারা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়। সাধারণত ১৫ সেঃমিঃ লম্বা ও ১০ সেঃমিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট পলিব্যাগে শতকরা ৫০ ভাগ উর্বর বেলে দোআঁশ মাটি ও শতকরা ৫০ ভাগ গোবর বা কম্পোষ্ট দিয়ে ভরে দিতে হবে। প্রয়োজনে ছোট বা আরও বড় পলিব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। চালুনী দ্বারা চেলে সেই গুঁড়া মাটি দ্বারা পলিব্যাগ ভর্তি করে উপরিভাগ দুই হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ২/৩ বার ঝাঁকুনী দিতে হবে। তারপর পুনরায় মাটি ঢেলে ব্যাগটি ভর্তি করতে হবে।

নার্সারীতে পলিব্যাগ স্থাপন: নার্সারীর যে অংশে পলিব্যাগ রাখা হবে সে জায়গাটি ভালভাবে সমান করে নিতে হবে। নার্সারীর যে কোন এক পাশ হতে পলিব্যাগ স্থাপন শুরু করতে হবে। ব্যাগ গুলো সোজাভাবে একটি আরেকটির সাথে আটঁসাটঁ করে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন পলিব্যাগ বাঁকা বা কাত করে সাজানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ বাঁকা পলিব্যাগে চারা বাঁকা ও দূর্বল হবে। পলিব্যাগে অর্ধেক মাটি ভরার পর ব্যাগটিকে ২-৩ বার ঝেঁকে নিতে হবে যাতে ব্যাগের মাটি ঠিকমত বসে যায় এবং তার মাঝখানে বীজ বপন করে পলিব্যাগ সাজিয়ে রাখতে হবে। পলিব্যাগের মাটি বেশি শুকিয়ে গেলে মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিতে হবে। গাছের ধরণ অনুযায়ী বীজ গজানোর মাস খানেক পর থেকে পলিব্যাগের চারা বিক্রয় শুরু করা যেতে পারে। পানি সেচের ফলে পলিব্যাগে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে যেতে না পারে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পলিব্যাগের তলা থেকে ৩ সেঃমিঃ উপরে পলিব্যাগের চতুর্দিকে বেশ কয়েকটি ছিদ্র করে দিতে হবে। পলিব্যাগের ছিদ্র দিয়ে শিকড় বের হয়ে এলে তা কেটে দিতে হবে।

পলিব্যাগে চারা স্থানান্তরকরণ

একটি পলিব্যাগে একাধিক চারা থাকা ঠিক নয়। এতে চারার বৃদ্ধি কম হয়। তাই একাধিক চারা থাকলে একটি সুস্থ্য সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। পলিব্যাগ থেকে চারা তোলার পূর্বে বা পলিব্যাগে চারা স্থানান্তর করার পূর্বে পলিব্যাগে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের সেচ দিতে হবে। তারপর সতর্কতার সাথে পলিব্যাগ থেকে চারা বের করে নিয়ে তা রোপণ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার গোড়া বা শিকড় থেকে যেন সব মাটি পড়ে না যায়। অনেক সময় পলিব্যাগসহ চারা রোপণ করা হয়। এক্ষেত্রে রোপণের সময় ব্লেড বা ধারালো চাকু দিয়ে পলিব্যাগের নিচে ও চারিদিকে কেটে দিতে হবে যেন এসব কর্তিত স্থানের ভিতর দিয়ে শিকড় বের হয়ে তা মাটিতে প্রবেশ করতে পারে। তবে রোপণের পূর্বে ব্লেড বা ধারালো চাকু দ্বারা পলিব্যাগ কেটে সরিয়ে ফেলে চারা নির্ধারিত স্থানে রোপণ করাই ভাল। অবিক্রিত চারা দীর্ঘদিন পলিব্যাগে রেখে দিলে ক্ষীণ ও দূর্বল হয়ে যেতে পারে। তাই প্রথম পলিব্যাগ থেকে চারা তুলে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের পলিব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে এবং অংকুরোদগমের পর চার পাতা বিশিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত চারা গাছ স্থানান্তর করা উচিত নয়। যতদূর সম্ভব শিকড়ের কম ক্ষতি করে বা শিকড়কে কম সময় অনাবৃত রেখে তাড়াতাড়ি চারা রোপণ করা ভাল। চারার শিকড় অধিক লম্বা হলে ৬/৭ সেঃমিঃ পর্যন্ত রেখে বাকি অংশ

কেটে দিতে হবে এবং বেশি পাতা থাকলে কিছু পাতা ছাটাই করা ভাল। পলিব্যাগে রোপণের পর শিকড়ের চারদিকের মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হবে। রোপণের পর ঝাঝরির সাহায্যে পানি সিঞ্চন করতে হবে তাহলে চারা তাড়াতাড়ি মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। চারা তোলা ও স্থানান্তরের কাজ পড়ন্ত বিকেলে মেঘলা দিনে করা উত্তম।

শিকড় ছাঁটাই ও চারা পরিবহন

চারার শিকড় পলিব্যাগ ভেদ করে বেরিয়ে গেলে সময়মত তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হবে। তা না করলে চারা পরিবহনে অসুবিধা হয় এমনকি এসব চারা স্থানান্তর করার সময় মারাও যেতে পারে। অত্যান্ত সতর্কতার সাথে চারা পরিবহন করা প্রয়োজন। পাতা, কান্ড বা শিকড় আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা শুকিয়ে গেলে রোপণের পর চারা মারা যেতে পারে। না মারা গেলেও এসব চারা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক সময় লেগে যায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই বীজতলা থেকে চারা সংগ্রহ করে অতি দ্রুত পরিবহন করা উচিত। পলিব্যাগে চারা পরিবহনে অসুবিধা কম হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন পলিব্যাগের মাটি না পড়ে যায়।

২.২.২ বীজতলায় চারা উৎপাদন

বীজতলা বলতে আমরা এমন একটি জায়গাকে বুঝি যেখানে বীজ বপন করে বিশেষ যত্নের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়।

আদর্শ বীজতলা তৈরী

- নির্দিষ্ট মাপমতো একটি বীজতলার চারকোণে চারটি খুটি পুঁতে দড়ি দিয়ে যুক্ত করে রেখা টানতে হবে।
- ৩ মিটার লম্বা ও ১ মিটার চওড়া করে একটি আয়তকার ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে।
- এবার এর ৪ কোণায় ৪টি খুঁটি পুঁতে চার দিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।
- তারপর কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সেঃ মিঃ গভীর করে মাটি খুড়ে তুলে ফেলে নিম্নবর্ণিত তিনটি স্তরে বীজতলাকে সাজাতে হবে।

  ক) সর্বনিম্ন স্তরঃপ্রায় ৭.৫ সে: মি: বা ৩ ইঞ্চি পুরাতন সুরকি, ভাংগা ইট, পোড়া মাটি ইত্যাদি।

  খ) মধ্য স্তরঃ৭.৫ সে: মি: বা ৩ ইঞ্চি দোঁ-য়াশ মাটি ও বালুর মিশ্রণ।

  গ) উচ্চ স্তরঃ৭.৫ সে: মি: বা ৩ ইঞ্চি বেলে-দোঁয়াশ মাটি, পঁচা গোবর ও কম্পোষ্ট সারের মিশ্রন।
- তবে চারার সংখ্যা অনুযায়ী বীজতলার দৈর্ঘ্য কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে।
- গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজতলার উচ্চতার তারতম্য থাকে।
- গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা সাধারণতঃ ১৫ সেঃমিঃ উঁচু হওয়া দরকার এবংশীতকালীন বীজতলার ক্ষেত্রে ৭ – ৮ সেঃমিঃ উচ্চতাই যথেষ্ট।
- পানি নিকাশের সুবিধার জন্য গ্রীষ্মকালীন সময়ে বীজতলা অপেক্ষাকৃত উঁচু রাখার প্রয়োজন পড়ে।
- বীজতলা যাতে অতিবর্ষায় ভেংগে না যায় এ জন্য ছিদ্র যুক্ত ইট বা বাঁশের চটা দিয়ে বীজতলার উপরিভাগের চার ধার বেঁধে দিতে হবে। বীজতলার মধ্যভাগ দু কিনারা হতে একটু উঁচু হওয়া দরকার। এতে বৃষ্টির পানি বা অতিরিক্ত পানি সহজেই গড়িয়ে বের হয়ে যেতে পারবে।

বীজতলা জীবানুমুক্তকরণ

বীজতলায় বীজ বপনের পর চারা গজালে অনেক সময় দেখা যায় চারা গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হয় এবং অনেক চারা মারা যায়। আবার অনেক সময় চারার শিকড় ক্রিমিতে আক্রান্ত হয়, গিটের সৃষ্টি করে। এ সকল ক্রিমি আক্রান্ত চারা মাঠে রোপনে আক্রমনের ব্যাপকতা বাড়লে ক্ষেতে গাছ ঢলে (wilting) পড়ে। বীজ বপনের পূর্বে যথাযথ ভাবে বীজতলা শোধনের মাধ্যমে আমরা এ ক্ষতির হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে পারি।

বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলার উপরের স্তর ভালভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরী করতে হবে। এতে মাটির ভিতরে সহজেই বাতাস ও পানি চলাচল করতে পারবে। চারা গুলোর শিকড় সহজেই মাটিতে প্রবেশ করে খাদ্য ও রস গ্রহণ করতে পারবে। এরপর বীজতলার উপরের স্তর সমান করে বীজবপন করতে হবে। বীজ বপনের সময় সমস্ত বীজতলা জুড়ে সমানভাবে বীজ ছিটিয়ে বা লাইন করে বীজ বপন করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বীজতলার কোথাও যেন বেশী বীজ এবং কোথাও কম বীজ না পড়ে। তবে ছিটিয়ে বীজ বপনের চেয়ে লাইনে বীজ বপন করা উত্তম, কারন উৎপন্ন চারাগুলো ঠিকমত আলো বাতাস পায়, খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা কম হয়, সুস্থ্য-সবল ও মান সম্পন্ন চারা উৎপন্ন হয়।

বীজতলা চারার পরিচর্যা

বীজতলায় বীজ বপনের ২ দিন পর থেকে বীজ কি পরিমাণ গজালো তা লক্ষ্য রাখতে হবে। বীজ গজানো শুরু হলে সাথে সাথে বীজতলা ঢেকে রাখা চাটাই তুলে ফেলতে হবে। গজানো চারা অতিরিক্ত রৌদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য বাঁশের চাটাই অথবা অন্য কিছু দিয়ে তৈরী ঝাপ ব্যবহার করতে হবে। চাটাই অথবা ঝাপ এমন ভাবে খুঁটির উপরে দিতে হবে যেন বীজতলা থেকে ১.৫ ফুট বা ৪৫ সে: মি: উপরে থাকে।

সকাল বিকাল চাটাই অথবা ঝাপ সরিয়ে দিয়ে চারাগুলোতে রোদ বাতাস লাগানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। চারাগুলো যতই আকারে বাড়বে ততই তাদের রোদের তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন বোধে সকাল বিকাল ঝাঝারি দিয়ে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। চারার বয়স ১০/১২ দিন হলে কাঠ অথবা ক্ষুদ্রাকার নিড়ানী দিয়ে বীজতলার মাটি হালকাভাবে আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে। এই ভাবে প্রতি ২/৩ দিন অন্তর অন্তর মাটি আলগা করতে হবে। চারার বৃদ্ধি ভালো না হলে, প্রতি লিটার পানিতে ১-২ গ্রাম ইউরিয়া সার গুলে চারার উপর স্প্রে করলে চারাগুলো আরোও সতেজ হবে। তবে কোন অবস্থাতেই বেশী ইউরিয়া সার দেয়া ঠিক হবে না।

বীজতলার মাটি যদি ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে থাকে তবে মাটিতে বসবাসকারী জীবানুগুলো সক্রিয় হয়ে পড়ে এতে বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। এসব রোগের মধ্যে গোড়া পচা রোগ উল্লেখযোগ্য। এই রোগের কারণে অনেক সময় চারা উৎপাদন কষ্টকর হয়। এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বীজতলা শুকনা রাখা, কুপ্রাভিট অথবা ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সেচের পানির সাথে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যাবে।

চারা তোলার পদ্ধতি

বীজতলা থেকে চারা উঠানোর সময় একবার হালকা সেচ দিয়ে চারা উঠানো উচিত। এতে চারার শিকড় কম ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে। চারার উঠানোর সময় চিকন কোচা কাঠি দিয়ে মাটিতে চাপ দিলে চারাগুলো সহজেই উঠে আসবে।

চারা সংরক্ষণ ও পরিবহণ

চারা উঠানোর পর পরই রোপন করা উচিত, এতে করে চারার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তবে অনেক সময় চারা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। তখন ঠান্ডা অন্ধকারযুক্ত স্থানে চারা ২৪ ঘন্টা থেকে ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। সেক্ষেত্রে চারার পাতায় প্রয়োজন মত পানি ছিটিয়ে দেওয়া দরকার। উৎপাদিত চারা দুর দূরান্তে নেওয়ার পুর্বে ও চারা তোলার পুর্বে ভালো ভাবে সেচ দিতে হবে যাতে পরিবহনের সময় চারার শরীরে পানির অভাব না হয়।

২.৩ অযৌন/অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার পদ্ধতি

২.৩.১ কাটিং পদ্ধতি

কাটিং হল অযৌন বংশবিস্তারের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। গাছের বিভিন্ন অংগ, যেমন- কান্ড, শিকড়, পাতা, পত্রকুড়ি প্রভৃতি মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে রাসায়নিক, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে শিকড় গজানোর মাধ্যমে মাতৃগাছের অনুরুপ নতুন গাছ উৎপাদনকে কাটিং বলে।

কাটিং এর সুবিধা

১. অংগজ বংশবিস্তার পদ্ধতি সমূহের মধ্যে এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে সহজে ও কম খরচে অধিক চারা উৎপাদন করা যায়।

২. জোড় কলমের মত এতে কোন জোড় অসামঞ্জস্যতা হয় না।

৩. এ পদ্ধতিতে অল্প জায়গায় অনেক চারা উৎপাদন করা যায়।

৪. এতে তেমন খুব একটা কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

৫. মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে নতুন চারা দ্রুত উৎপন্ন করা যায়।

৬. একটি মাত্র গাছ থেকে অসংখ্য গাছ জন্মানো সম্ভব হয়।

৭. বসত বাড়ীতে হেজ বা বেড়া নির্মাণে ও ফল গাছের বংশবিস্তারে এটি একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি।

কাটিং এর অসুবিধা

১. উপযুক্ত পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক সময় কর্তিত অংশের মূল গজায় না।

২. অনেক সময় কাটিং মাটি বাহিত বিভিন্ন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

৩. কোন কোন সময় শিকড় গজানোর পর মাটির প্রতিকূল অবস্থার কারণে শিকড় নষ্ট হয়ে যায়।

৪. কাটিং থেকে জন্মানো ফল গাছ অতি সহজেই ঝড় বাতাসে উপড়ে যেতে পারে। কারণ এতে কোন প্রধান মূল তৈরী হয় না।

২০২৪

৫. সব গাছে কাটিং সফল হয় না বা কোন কোন ফল গাছে এর সফলতার হার এত কম যে সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুমোদন করা যায় না। যেমন- বীজবিহীন এবং এলাচি লেবুতে কাটিং এর সফলতার হার অনেক বেশি অথচ কাগজি লেবুতে কাটিং সফল হয় না।

কাটিং এর প্রকারভেদ

১) শিকড় কাটিং (Root Cutting) : পরিণত গাছের শিকড় বা শিকড়াংশ মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় চারা উৎপাদন পদ্ধতিকে শিকড় কাটিং বলে। এই পদ্ধতিতে ১৫-২০ সেঃ মিঃ লম্বা এবং পেন্সিল বা আঙ্গুলের মতন মোটা শিকড়ের অংশ তির্যকভাবে কেটে মাটিতে পুতে রাখতে হয়। এ কলম করার ক্ষেত্রে মাটিতে পরিমিত আর্দ্রতা নিশ্চিত করতে হবে। কিছুদিন পর কাটিং থেকে শিকড়সহ নতুন শাখা বের হয় এবং নতুন গাছের জন্ম দিবে। এই পদ্ধতিতে পেয়ারা, বেল, ডালিম, লেবু, বাগান বিলাস, এলামন্ডা ইত্যাদি ফল ও ফুলের চারা উৎপাদন করা যায়। এই পদ্ধতিতে গাছের বংশবিস্তার আমাদের দেশে বর্ষাকালে করা হয়। গাছ নতুন ভাবে যখন ডালপালা ছাড়া শুরু করে তার পূর্বেই এই শিকড় সংগ্রহ করতে হয়। কারণ এই সময় শিকড়ে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য মজুদ থাকে। এতে কাটিং এ সফলতার হার বেড়ে যায়।

২) শাখা কলম (Stem cutting): গাছের ডাল থেকে যে কাটিং করা হয় তাকে ডাল কাটিং বলা হয়। ভাল কলম পাওয়ার জন্য ডাল কর্তনকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন -

- যেমন – শক্ত ডাল কাটিং
- আধাশক্ত ডাল কাটিং
- কচিডাল কাটিং এবং
- কোমল ডাল কাটিং

i) শক্ত শাখা কাটিং: জলপাই, ডালিম, জামরুল, পাতাবাহার, জবা, গন্ধরাজ, মুসান্ডা ইত্যাদি গাছের ক্ষেত্রে ৬-১২ মাস বয়সের পেন্সিলের ন্যায় মোটা ডাল নির্বাচন করা হয়। এ সব গাছের ক্ষেত্রে শক্ত ডাল ব্যবহার করে চারা উৎপাদন করা যায় হয়।

ii) আধা শক্ত শাখা কাটিং: লেবু, আঙ্গুর, গোলাপ ইত্যাদি গাছের ক্ষেত্রে আধা শক্ত ডাল ব্যবহার করে চারা উৎপাদন করা যায় হয়।

iii)কচি শাখা কাটিং: আপেল, নাশপাতি, রঙ্গন, ডুরান্তা ইত্যাদি গাছের জন্য কচি ডাল ব্যবহার করা হয়।

iv) কোমল শাখা কাটিং: চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা, মিষ্টি আলু ইত্যাদি গাছের ক্ষেত্রে ডালের মাথার দিকের কোমল ডাল বা নতুন গজানো ডগা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শক্ত বা আধাশক্ত শাখা কাটিং এর জন্য ডাল নির্বাচনের শর্তাবলী

ক) কাটিং এর জন্য ডাল নির্বাচনের সময় অবশ্যই সুস্থ, সবল, ডাল নির্বাচন করতে হবে।

খ) নির্বাচিত ডালের পাতাগুলো ধারালো সিকেচার দিয়ে কেটে ফেলতে হবে।

গ) কাটিং এর জন্য ব্যবহৃত ডালে কমপক্ষে তিনটি গিট বা কুঁড়ি (Bud) থাকতে হবে।

ঘ) গাছের দক্ষিন ও পুর্ব দিকের ডালে কাটিং ভাল হয়, সফলতার হার বেশী। কারণ পুর্ব দক্ষিন ও দিকের ডালে সূর্যের আলো বেশী পড়ে এবং মজুদ খাদ্যের পরিমান বেশী থাকে।

ঙ) কাটিং এর জন্য বৈশাখ হতে আষাঢ় মাস উত্তম তবে শীতকাল ছাড়া সারা বছরই ডাল কর্তন কলম করা যায়।

চারা তৈরীর পদ্ধতি

কাটিং এর জন্য ডাল তৈরীকরণ: কাটিং এর জন্য নির্বাচিত ডালটির উপরের অংশের কাটটি গিটের উপরে গোল করে এবং নিচের অংশের কাটটি গিটের নিচে তেছরা করে কাটতে হবে।

- এতে কাটিংটির আগা-গোড়া সহজেই চেনা যাবে এবং তেছরা কাটা অংশে বেশী পরিমাণ শিকড় গজানোর সুযোগ পায়।
- সাধারণত ৬-১২ মাস বয়সের ১৫-২০ সে: মি: লম্বা এবং পেন্সিল বা আঙ্গুলের মত মোটা ডালের অংশ কাটিং হিসেবে কর্তন করা হয়।

চারা তৈরী: ক) কাটিং এর জন্য তৈরিকৃত ডালগুলো উঁচু বীজতলা, টব বা কাঠের ট্রেতে রোপন করতে হবে। বেলে-দোয়াঁশ মাটির সাথে প্রচুর পরিমান পচা গোবর মিশিয়ে বীজতলা তৈরী, টব বা কাঠের ট্রেতে ভর্তি করে কাটিং রোপন করতে হবে।

খ) বীজতলার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার ও প্রস্থ ১ মিটার হতে হবে এবং বেডটি উত্তর – দক্ষিন দিকে লম্বালম্বি হবে।

গ) বীজতলায় ২০ সেমি: পর পর লাইন তৈরী করে প্রতি লাইনে ২০ সেমি: পর পর কাটিং লাগাতে হবে। কাটিং লাগানোর সময় গচি দিয়ে ছিদ্র করে কাটিং এর তেরছা অংশ মাটিতে বসাতে হবে।

ঘ) কাটিং ৪৫ কৌনিক ডিগ্রীতে উত্তর মুখী করে বেডে বসাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ১টি গিট সহ এক তৃতীয়াংশ মাটির ভিতরে প্রবেশ করে।

ঙ) কাটিং বসানোর পর কাটিং এর গোড়ার মাটি ভাল ভাবে চেপে দিতে হবে যেন ভিতরে ফাঁকা না থাকে।

চ) এবার পানি দিয়ে বেডটি ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

ছ) হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও মাঝে মাঝে সেচ দিতে হবে।

জ) এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে কাটিং হতে কুঁড়ি ও শিকড় গজাবে। তিন মাসের মধ্যে গজানো কাটিং বেড হতে তুলে পটিং করা যাবে, রোপন বা বিক্রয় করা যাবে। কাটিং বেড হতে উঠানোর ৩-৪ ঘন্টা আগে বীজতলার মাটি পানি দিয়ে ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতপরঃ নিড়ানীর সাহায্যে কাটিং এর গোড়া হতে ৩-৪ ইঞ্চি দুর দিয়ে মাটির বলসহ কাটিংটি উঠাতে হবে। সাথে সাথে পটে/পলিব্যাগে পটিং বা বাগানে রোপন করতে হবে। বিক্রয় করতে হলে কাটিং এর গোড়ার মাটির বলটি নলি সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে ১০-১৫ দিন হার্ডেনিং করে বিক্রয় করতে হবে। হার্ডেনিং এর সময় গাছের প্রয়োজন অনুযায়ী দিনে ১-২ বার হালকা সেচ দিতে হবে।

কাটিং এর উপরের কাটা অংশে ছত্রাকনাশক লাগালে রোদ ও রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। নিচের কাটা অংশে হরমোন (আই. বি. এ = ইনডোল বিউটারিক এসিড, বাজারে বাণিজ্যিক নাম সুরাটেক্স) ব্যবহার করলে খুব সহজেই শিকড় গজায়।

৩) পাতা কাটিং: কিছু কিছু গাছ আছে যেমন: পাথরকুচি, মিষ্টি আলু, লেবু, ফনিমনসা, ইত্যাদির পাতা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করলে সহজে চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে সম্পুর্ণ পাতা বা পাতার বিভিন্ন অংশ, যেমন- পত্রফলক, বোটাসহ পাতা প্রভৃতি মাতৃগাছ হতে আলাদা করে নতুন চারা উৎপাদনকে পাতা কাটিং কলম বলে। পাতার গোড়া বা অন্যান্য অংশ থেকে শিকড় ও পাতা বা কান্ড জন্মে নতুন চারা উৎপন্ন হয়। পত্র কলমের জন্য অধিক আর্দ্রতার দরকার হয়।

৪) পত্রকুঁড়ি কাটিং: কিছু কিছু গাছ আছে যাদের পত্রকুঁড়ি কাটিং হিসাবে ব্যবহার করে সহজে চারা উৎপাদন করা যায়। এ পদ্ধতিতে পাতা, পাতার বোটা, ছোট একটুকরা কান্ড ও পত্রাক্ষে অবস্থিত একটি সুপ্ত কুঁড়ির সমন্বয়ে গঠিত হয় পত্রকুঁড়ি কলম। যেমন - চা, এলাচি লেবু ইত্যাদি। যেসব গাছের পাতা থেকে শিকড় বাহির হয় কিন্তু কান্ড বাহির হয় না এমন গাছের জন্য পত্রকুড়ির কাটিং খুবই গুরুত্বপুর্ণ। শীতের শেষ দিকে সাধারণতঃ পত্রকুঁড়ি কলম করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে এক মৌসুমেই প্রতিটি কুঁড়ি হতে একটি নতুন চারা উৎপাদন করা যায়।

২.৩.২ গ্রাফটিং পদ্ধতিসমূহ

হাজার বছর ধরে মানুষ ফল গাছের বংশ বিস্তারে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে, সেটি হলো জোড়কলম পদ্ধতি। আধুনিক কৃষিতেও সংযোজিত হয়েছে জোড় কলম। গাছের আদিজোড় ও উপজোড় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যখন একটি একক গাছ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করে তখন তাকে গ্রাফ্ট জোড়কলম বলে এবং এ জোড়া লাগানো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় গ্রাফ্টিং বা জোড়কলম বলে। যে গাছের ওপর কাঙ্ক্ষিত গাছের ছোট একটি অংশ জোড়া লাগানো হয় তাকে আদিজোড় (Rootstock) এবং কাংখিত গাছের এ অংশটিকে উপজোড় (Scion) বলে। সহজভাবে বলা যায় জোড়কলমের জোড়স্থানের নিচের অংশ হলো আদিজোড় ও উপরের অংশ হলো উপজোড়। সাধারণতঃ ঝোপ জাতীয় ফল গাছ যেগুলো উঁচু কম হয় এবং পাশ্বে বেশি ছড়ায় এ ধরণের গাছের বংশবিস্তারের জন্য জোড়কলম উপযোগী।

গ্রাফটিং এর প্রকারভেদ/ জোড়কলমের পদ্ধতিসমূহ

জোড়কলম প্রধানত দু'ভাবে করা হয়ে থাকে। প্রমত উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে জোড়া লাগানো হয়। একে সংযুক্ত জোড়কলম বলে এবং দ্বিতীয়ত উপজোড়কে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিনড়ব করে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়, একে বিযুক্ত জোড়কলম বলে। এ কলম আবার বিভিন্নবভাবে করা যায়। নিচে উভয় ধরনের কয়েকটি জোড়কলম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো –

ক) সংযুক্ত বা সংস্পর্শ জোড়কলম (Contact/approach grafting): এই পদ্ধতিতে যে সায়নটি নির্বাচন করা হয় সেটি মাতৃগাছ হতে না কেটে রুটস্টকের সাথে জোড়া লাগাতে হবে। আম এবং সফেদা গাছে এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সংযুক্ত জোড়কলমের মধ্যে কয়েকটা পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সংস্পর্শ জোড় (Contact grafting) কলমই প্রচলিত বেশি। এটি সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি।

আদিজোড়কে সাধারণত টবে বা পলিব্যাগে জন্মিয়ে এক থেকে দেড় বছর পর্যন্ত লালন পালন করে তারপর তাকে কলমের কাজে ব্যবহার করা হয়। টব অথবা পলিথিনের ব্যাগসহ আদিজোড়কে রশির সাহায্যে

উপজোড়ের কাছাকাছি ঝুলিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর ধারালো চাকু দ্বারা পরস্পরের সুবিধাযুক্তস্থানে গাছের গোড়া থেকে ২৫-৩০ সে. মি. উপরে সামান্য গভীরভাবে কিছু কাঠসহ বাকল এবং ক্যাম্বিয়াম ৪-৬ সে.মি. লম্বা করে মসৃণভাবে চেছে তুলে ফেলা হয়। উভয় জোড় দু'টির কর্তিত অংশ পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে শক্ত করে এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয় যেন কর্তিত অংশ খুব ভালোভাবে মিলিত হতে পারে। বাঁধার ৪০-৫০ দিনের মধ্যে দুই জোড়ের মিলনস্থলে নতুন কলা উৎপন্ন হয়ে তারা জোড়া লেগে যায়। তখন সংযোগ স্থানের ২-৩ সে.মি. নিচে উপজোড় ২-৩ ধাপে কেটে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা হয় এবং অনুরূপভাবে সংযোগ স্থানের ওপর থেকে আদিজোড়ের অগ্রভাগ কেটে ফেলা হয়। সংযোগ স্থানের নিচে বা উপরে আদিজোড়ে কখনও কোনো শাখা প্রশাখা জন্মিতে দেয়া যাবে না।

খ) বিযুক্ত জোড়কলম (Detached grafting): এই পদ্ধতিতে যে সায়নটি নির্বাচন করা হয় তা মাতৃগাছ হতে কেটে এনে রুটস্টকের সাথে জোড়া লাগানো হয়।

গ) ভিনিয়ার জোড়কলম (Veneer grafting): ভিনিয়ার জোড়কলম এক ধরনের পার্শ্ব জোড়কলম (side grafting) । এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ের একপার্শ্বে উপজোড়ের নি¤œড়বপ্রান্ত স্থাপন করা হয়। এ কলম করার জন্য উপজোড় হিসেবে এমন একটি শাখাগ্র নির্বাচন করা হয় যার শীর্ষ কুঁড়িটি কিছুদিনের মধ্যেই উন্মোচিত হবে। এরূপ শাখাগ্রকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক সপ্তাহ আগেই তার পত্রবৃন্ত রেখে পাতাগুলো ছেঁটে দেয়া হয়। এর ফলে সুপ্ত কুঁড়িটি এক সপ্তাহের মধ্যে একটু বড় ও সবল হয়। উপজোড় হিসেবে নির্বাচিত শাখার বয়স ৬/৭ মাস হলে ভালো হয়। আদিজোড়ের গোড়া থেকে কমপক্ষে ২৫ সে.মি. উপরে ধারালো চাকু দ্বারা ৫/৬ সে.মি. দীর্ঘ করে তির্যকভাবে ওপর থেকে নিচে –মশঃ একটু গভীর করে কাটা হয়। এ কর্তনের নি¤œড়বপ্রান্তে আবার তির্যকভাবে গভীর করে আর একটি ছোট কর্তন দেয়া হয়। উপজোড়ের গোড়ার দিকে অনুরূপ কর্তন দিয়ে উভয় জোড় পরস্পর মুখোমুখি স্থাপন করে পলিথিনের ফিতা দ্বারা কর্তিত স্থান টান টান করে বেঁধে দিতে হয়। এর দুই মাস পর আদিজোড় ও উপজোড়ের ক্যাম্বিয়াম স্তর জোড়া লাগে ও উপজোড়ের সুপ্ত কুঁড়ির বৃদ্ধি শুরু হয় এবং কুঁড়ি থেকে নতুন বিটপ উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ উপজোড় ও জোড় স্থানটিকে পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিয়ে ব্যাগের খোলা মুখ আদিজোড়ের কান্ডের গায়ে বেঁধে দিতে হয়। এতে উপজোড় ও জোড়স্থানের চারপাশে বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিযুক্ত উপজোড়টি শুকিয়ে মারা যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। দুই/তিন দিন পর পর পলিথিনের নিচের বাঁধন খুলে জমাকৃত পানি বের করে দিতে হয়। মাস দুয়েক পর সংযোগ স্থানের বাঁধনটিকে একটু ঢিলা করে পুনরায় বেঁধে দিতে হয়। পুরোপুরি জোড়া লাগতে গাছ ভেদে দুই থেকে আড়াই মাস সময় লাগে। ভালোভাবে জোড়া লাগার পর বাঁধনটি কেটে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আদিজোড় থেকে কোনো শাখা-প্রশাখা বের হতে না পারে। কোন শাখা-প্রশাখা বের হওয়া মাত্রই তা কেটে ফেলতে হবে। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপর থেকে আদিজোড় ধীরে ধীরে ২-৩ ধাপে কেটে অপসারণ করা হয় এবং নতুন উপজোড় শাখাকে বাড়তে দেয়া হয়।

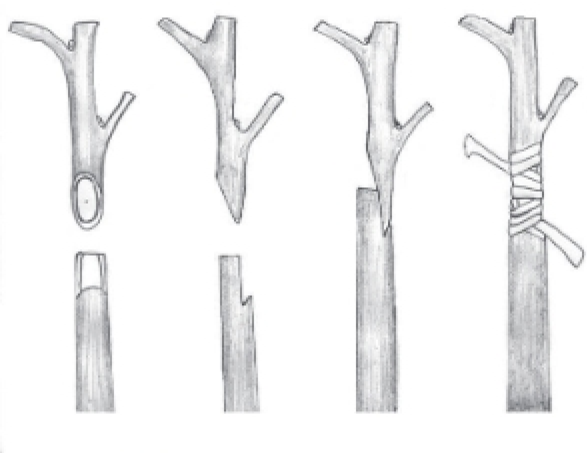

চিত্র: ভিনিয়ার জোড়কলম

ঘ) চাবুক জোড়কলম (Splice /Whip grafting): জোড়কলম তৈরির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটিই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। আদিজোড় হিসাবে ব্যবহার করা হয় লম্বা চাবুকের মত একটা শিকড়। এ পদ্ধতিতে আদিজোড় ও উপজোড় নির্বাচনের পর তাতে তেরছা ও মসৃণভাবে শুধু একবার কাটা হয়। সমদৈর্ঘ্য (৩-৫ সে.মি.) ও একই পরিমাণ কোণ করে উভয় জোড়ে কর্তন দেয়া হয়, ফলে একের কর্তনতল অন্যের কর্তনতলের সাথে ভালভাবে খাপ খায়। আদিজোড় ও উপজোড়কে অতঃপর পারস্পরিক কর্তিত তলের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এনে পলিথিন ফিতা দ্বারা শক্তভাবে বেঁধে দেয়া হয়। নাশপতি, আপেল, প্রভৃতি ফলগাছে এ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায়। বসন্তকালে কুঁড়ি উন্মোচনের ঠিক পূর্বে এ কলম করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। চূড়ান্ত ভাবে জোড়া লাগা ও উপজোড়ের বৃদ্ধি শুরু হওয়ার পর যদি সংযোগ স্থানের নিচে আদিজোড় থেকে কোনো বিটপ বা কুড়ি বের হয় তবে তা অপসারণ করতে হয়।

ঙ) ভ্রুণকান্ড বা অঙ্কুর জোড়কলম (Epicotyle/Stone grafting): কম সময়ে অধিক সংখ্যক গাছ উৎপাদনের জন্য এটি একটি আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে প্রমে বীজতলায় আদিজোড় উৎপনেড়বর জন্য বীজ বপন করা হয়। বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারার বয়স যখন ৮-১৫ দিন হয় তখন তার গোড়া থেকে ৫ সে.মি. উপরে কলম করার জন্য মাথা কেটে দেয়া হয়। লক্ষনীয় যে, অংকুরিত হওয়ার পর পাতা সবুজ হওয়ার আগেই সাধারণত এ কাজ করা হয়। কর্তিত স্থানে যে কোনো বিযুক্ত জোড় কলম পদ্ধতিতে উপজোড় স্থাপন করে এ কলম করা হয় তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আদিজোড় ও উপজোড় সমব্যাসের হয়। আমগাছের অংকুরিত চারায় এ কলম অত্যন্ত সফলভাবে করা যায়। অন্যান্য জোড়কলমের চেয়ে এ পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে সময় কম লাগে (২-৪ সপ্তাহ) । জোড়কলম সফল হলে এক বছর নার্সারিতে লালন পালন করে পরবর্তী বছর তা বাগানে লাগানো যায়।

বিযুক্ত জোড় কলমের আরও কয়েকটি পদ্ধতি হলো জিহ্বা জোড় কলম, জিন জোড় কলম, পার্শ্ব জোড় কলম, ফাটল জোড় কলম, গৌজ জোড় কলম, বাকল জোড় কলম, সেতু জোড় কলম, ইত্যাদি। এ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে আমাদের দেশে ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং প্রচলিত।

২০২৪

চ) ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড় কলম: অযৌন বংশ বিস্তার পদ্ধতি গুলোর মধ্যে ক্লেফ্‌ট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড় কলম একটি অন্যতম পদ্ধতি।

উপকরণ: এ কলম করতে গ্রাফটিং চাকু, ব্লেড, সিকেচার, পলিথিন ক্যাপ, পলিথিন ফিতা, সুতলী, পরিবেশ সহনশীল একটি ষ্টক গাছের চারা, কাংখিত গাছের ডগা বা সায়ন এবং দক্ষ মালি ইত্যাদি।

কলম করার উপযুক্ত সময়: মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কলম করার উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় বাতাসে আদ্রতা ও গাছের কোষের কার্যকারিতা বেশী থাকে। ফলে তাড়াতাড়ি জোড়া লাগে এবং সফলতার হারও বেশি পাওয়া যায়।

স্টক তৈরি: অনাকাংখিত কিন্তু পরিবেশ উপযোগী গাছের বা স্থানীয় জাতের বীজ হতে চারা তৈরী করতে হবে যাতে কাংখিত জোড়া লাগানো সম্ভব হয়।

স্টক চারা তৈরির ধাপসমুহ

- পরিণত গাছ হতে সুস্থ ও সবল বীজ সংগ্রহ করা।
- স্টক চারাটি সরাসরি মাটি বা পলিব্যাগে তৈরি করা।
- যদি চারাটি মাটিতে তৈরি করা হয় তবে মাটি ভালভাবে কুপিয়ে ঝুরঝুরা করে আগাছা পরিস্কার করে প্রয়োজনীয় জৈব সার মিশিয়ে বেড আকারে করতে হবে। বেডটির প্রস্থ যেন ১ মিটার এর বেশি না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এর পর বেডে ২৫ সেমিঃ পর পর লাইন করে প্রতি লাইনে ২০ সেমিঃ পর পর চারা/ বীজ রোপণ করতে হবে এবং কলম করার পূর্ব পর্যন্ত স্টক চারাগুলোর সকল প্রকার পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে।
- চারা পলিব্যাগে তৈরি করলে ২০ সেমিঃ x ১২ সেমিঃ পলিব্যাগ নিতে হবে। দোঁয়াশ মাটির সাথে অর্ধেক পচা গোবর ও কম্পোস্ট মিশিয়ে পলিব্যাগ ভরতে হবে।
- প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বা চারা রোপণ করতে হবে। চারা গজানোর পর পলিব্যাগ গুলো যেন কাত হয়ে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে অন্যথায় চারার গোড়া বাঁকা হয়ে যাবে।
- এবার ব্যাগটি বেডে ২৫ x ২০ সেমিঃ দুরত্বে রোপন করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে পলিব্যাগটি যেন মাটির সমান্তরালে থাকে। এতে খরা মৌসুমে পানি সেচ কম লাগে এবং চারাটি সুস্থ ও সবল হয়।
- সুস্থ, সবল এবং নিরোগ চারা পাওয়ার জন্য আগাছা, রোগ ও পোকা-মারড় দমন করতে হবে। প্রয়োজনে গাছে সার ও সেচ দিতে হবে।

স্টক চারার বয়স ও সায়ন নির্বাচন

আম

- স্টক চারাটির বয়স ৯-১২ মাস হবে।
- উৎকৃষ্ট ও কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ থেকে সুস্থ ও সবল সায়ন নিতে হবে।
- সায়নটি লম্বায় ১৫-১৮ সেমিঃ হবে।
- সায়নটির ডগায় একটি সুপ্ত কুড়ি থাকতে হবে।
- সায়নটির রং গাঢ় সবুজ থেকে কালচে সবুজ হবে এবং
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারণ করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

২০২৪

- আমের সায়ন মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় পাতা কেটে ফেলাকে ডিফলিয়েশন বলে। ১০ দিন পূর্বের ডিফলিয়েশন করা সায়ন দিয়ে কলম করলে তাড়াতাড়ি জোড়া লাগে এবং সফলতার হারও বেশি হয়।

কাঁঠাল

- স্টক চারাটির বয়স ২-৩ সপ্তাহ হতে হবে।
- সমব্যাস সম্পন্ন ১-২ মাস বয়সের কাঙ্ক্ষিত গাছের ডগা সায়ন হিসেবে নিতে হবে।
- সায়নটির শীর্ষ কুঁড়ি কয়েক দিনের মধ্যে বিকশিত হবে এমনটি হতে হবে। যার রং গাঢ় সবুজ কিন্তু টিপ দিলে শক্ত মনে হবে।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারণ করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।
- সায়নটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ সেমিঃ হবে।

জলপাই

- স্টক চারাটির বয়স ৬-৮ মাস হতে হবে।
- পরিপূর্ণ ও বিকশিত এবং কাঙ্ক্ষিত গাছের ডগার শীর্ষ থেকে কচি ১০-১৫ সেমিঃ অংশ কেটে ফেলে দিয়ে নিচের ১৫-১৮ সেমিঃ ডগাটি সায়ন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারণ করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

পেয়ারা

- স্টক চারাটির বয়স ৯-১২ মাস হতে হবে। স্টক হিসেবে পলি পেয়ারার চারা ব্যবহার করলে উইল্ট প্রতিরোধী গাছ তৈরী করা সম্ভব।
- পেয়ারা ডালের ডগার কচি অংশে ৪টি ধার/খাজ থাকে। এই ধার বা খাজের ঠিক নিচের গোলাকার অংশটিকে সায়ন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- সায়নটি লম্বায় ১৫-১৮ সেমিঃ হওয়া ভাল।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারন করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

কামরাঙা

- স্টক চারাটির বয়স ৬-৮ মাস হতে হবে।
- সায়নের ব্যাস স্টক চারার সম আকারের হলে ভাল হবে।
- পরিপূর্ণ ও বিকশিত এবং কাঙ্ক্ষিত গাছের ডগার শীর্ষ থেকে ১০-১৫ সেমিঃ কচি অংশ কেটে ফেলে দিয়ে নিচের ১৫-১৮ সেমিঃ ডগাটি সায়ন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- একটি ডগা হতে একাধিক সায়ন সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারণ করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

আমলকি

- স্টক চারাটির বয়স ৬-৮ মাস হতে হবে।

- সায়নের ব্যাস স্টক চারার সম আকারের হলে ভাল হবে ।
- পরিপূর্ণ ও বিকশিত এবং কাংখিত গাছের ডগার শীর্ষ থেকে ১০-১৫ সেমিঃ কচি অংশ কেটে ফেলে দিয়ে নিচের ১৫-১৮ সেমিঃ ডগাটি সায়ন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- একটি ডগা হতে একাধিক সায়ন সংগ্রহ করা যেতে পারে।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারণ করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

লেবু

- স্টক চারার বয়স ৬-৮ মাস হতে হবে।
- সায়নের ব্যাসার্ধ্য স্টক চারার সম আকারের হলে ভাল হবে।
- লেবু ডালের ডগার কচি অংশে ৪টি ধার/খাজ থাকে। এই ধার বা খাজের ঠিক নিচের গোলাকার অংশটিকে সায়ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- সায়নটি লম্বায় ১৫-১৮ সেমিঃ হওয়া ভাল।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারন করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

কুল বা বরই

- স্টক চারাটির বয়স ১.৫-২.০ মাস হতে হবে।
- সায়নের ব্যাস স্টক চারার সম আকারের হলে ভাল হবে ।
- সায়নের রং সবুজ বা সবুজাব হবে। ডগাটির আগাথেকে ১০-১৫ সেমিঃ কচি অংশ বাদ দিয়ে নিচের ১৫-১৮ সেমিঃ অংশ সায়ন হিসেবে নিতে হবে।
- সায়নটি সংগ্রহের পর পরই সমস্ত পাতা অপসারন করে ভিজা ন্যাকড়া ও পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে রাখলে সায়নটির সতেজতা অক্ষুন্ন থাকে।

চিত্র: সায়ন

চিত্র: স্টক চারা

পদ্ধতি

- সাধারণত স্টক গাছের গোড়া হতে ১৫-২০ সেমিঃ উপরে গ্রাফটিং করা হয়।
- খেয়াল রাখতে হবে যেন জোড়া স্থানটির নিচে অবশ্যই যেন কিছু পাতা থাকে।
- এবার সিকেচার দিয়ে নিদ্দিষ্ট উচ্চতায় স্টক গাছের মাথাটি সমভাবে কেটে অপসারণ করতে হবে।

- এবার চাকু দিয়ে স্টক গাছের মাথাটি ২-৩ সেমিঃ লম্বালম্বিভাবে চিরে দিতে হবে এবং সায়নের গোড়ার উভয় পাশ একই ভাবে ২-৩ সেমিঃ তেরছা কাট দিতে যেন গোঁজ বা তিলকের মত হয়।
- এবার স্টক গাছের কর্তিত অংশে সায়নের কর্তিত অংশ সমানভাবে প্রবিস্ট করাতে হবে।
- অতপর জোড়া লাগানোর জায়গাটি পলিথিন ফিতা দিয়ে পেচিয়ে শক্তভাবে বেঁধে দিতে হবে।
- এবার একটি পলিথিন ক্যাপ বা টুপি দিয়ে সায়নের মাথা হতে জোড়ার নিচ পর্যন্ত ঢেকে বেঁধে দিতে হবে।
- ব্যতিক্রমঃ যেহেতু কাঠলের ২-৩ সপ্তাহের স্টক চারায় গ্রাফটিং করা হয় তাই স্টক চারায় কোন পাতা থাকেনা এবং কলমটি চাকুর পরিবর্তে ব্লেড দিয়ে করতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা

- কলম করার সময় অতিরিক্ত রোদ থাকলে উপরে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করলে সফলতার হার বেড়ে যায়।
- স্টক গাছে অনাকাঙ্ক্ষিত কুশি বের হওয়ার পর পরই ভেঙ্গে দিতে হবে।
- কলমের বেড/ব্যাগে প্রয়োজনীয় রসের ব্যাবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- সায়নের মাথায় কুঁড়ি গজানোর সাথে সাথেই পলিথিনের ক্যাপটি খুলে দিতে হবে।
- জোড়াটি স্থায়ী হয়ে গেলে অর্থাৎ কলম করার প্রায় তিন মাস পর পলিথিনের ফিতাটি খুলে দিতে হবে।
- বেডের/ ব্যাগের আগাছা, রোগ ও পোকা-মাকড় দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চারার বাড়-বাড়তি কম হলে উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে অথবা ফলিয়ার স্প্রে করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইউরিয়া মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

২.৩.৩ দাবা কলম বা লেয়ারিং পদ্ধতি

দাবা কলম হচ্ছে - "মাতৃগাছের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় এর শাখায় অস্থানিক শিকড় গজিয়ে মাতৃগাছের হুবহু গুণসম্পন্ন চারা উৎপাদনের কৌশল" । অর্থাৎ ইপ্সিত ফলগাছের কোন শাখায় ক্ষত সৃস্টি করে সেখান থেকে আস্থানিক শিকড় গজিয়ে পরবর্তীতে এটিকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি পুর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র গাছ হিসাবে তৈরী করা । বাংলাদেশের বিভিন্ন ফলের বংশবিস্তারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যেমনঃ লিচু, পেয়ারা, কাগজীলেবু, জামরুল, বাতাবী লেবু, ডালিম, করমচা, গোলাপজাম, জলপাই, কামিনী ফুল, ভেলভেট ফুল ইত্যাদি।

দাবা কলমের সুবিধা

ক) এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং করতে খুব একটি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

খ) অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাছের চারা উৎপাদন করা যায়।

গ) কলমের চারায় কম সময়ে ফল ধারণ করে।

ঘ) যে সমস্ত প্রজাতি কাটিং এ সহজে শিকড় গজায় না তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সফলতা বয়ে আনতে পারে।

দাবা কলমের অসুবিধা

ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ পদ্ধতি কাটিং অপেক্ষা ব্যয়বহুল এবং এর জন্য বাড়তি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

খ) এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিক সংখ্যক মাতৃগাছের প্রয়োজন হয়।

দাবা কলমের প্রকারভেদ

অধুনা বিশ্বে এই প্রাচীন পদ্ধতির সংস্করণ করে উন্নত পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। দাবা কলমের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছেঃ

ক) শাখা দাবা কলম

খ) সরল দাবা কলম

গ) যৌগিক দাবা কলম

ঘ) পরিখা দাবা কলম

ঙ) ঢিবি দাবা কলম এবং

চ) গুটি কলম।

ক) শাখা দাবাকলম: শাখার আগ্রভাগের কিছুটা অংশ নিচের দিকে নুইয়ে এর অংশ বিশেষ বাকল তুলে ৫-৭ সেঃমিঃ মাটির গভীরে পুঁতে রাখা হয়। দুই/ তিন সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা উপরের অংশের গোড়া থেকে অস্থানিক শিকড় গজায় এবং তখন মাতৃগাছ থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় রোপণ করতে হয়। যেমনঃ রাস্পবেরী, ব্লাকবেরী।

খ) সরল দাবাকলম: এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং দ্রুত বর্ধনশীল কাণ্ডল গাছের জন্য এটি প্রযোজ্য। এ পদ্ধতিতে দ্রুত বর্ধনশীল মাটির কাছাকাছি শাখার অগ্রভাগের ১০-২০ সেঃমিঃ পিছন থেকে কিছু অংশের বাকল তুলে ৫-৭ সেঃমিঃ মাটির গভীর স্থাপন করে এমনভাবে মাটি চাপা দিতে হয় যেন শাখার অগ্রভাগে মাটির উপরে সোজাভাবে থাকে। এ ধরণের অবস্থা দ্রুত শিকড়ায়নে সহায়তা করে। এক থেকে দু'মাসের মধ্যে বাকল তোলা অংশের উপরের দিক থেকে শিকড় বের হয়। শিকড় ভালভাবে বিস্তৃতি লাভ করলে শিকড়সহ অগ্রভাগ মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রোপণ করতে হয়। বর্ষাকাল এ ধরণের কলম করার উপযুক্ত সময়। সাধারণতঃ লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি ফল গাছে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

- শাখাগুলোকে বাঁকিয়ে মাটির নীচে গোজ দ্বারা আটকিয়ে মাটি চাপা দেয়া হয়েছে।
- মাটি চাপা দেয়া শাখা থেকে মূল বের হয়েছে।
- মুল গজানো সরল দাবা কলম স্থানান্তরের উপযোগী।

গ) পরিখা দাবাকলম: এই পদ্ধতিতে ছোট আকারের গাছ অথবা শাখাকে অগভীর পরিখার মাধ্যে ৩০ থেকে ৪৫ কৌনিক ডিগ্রীতে রোপন করতে হয়। এখানে সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫-৮০ সে:মি: হয়ে থাকে। গাছের বৃদ্ধির পূর্বে মুহুর্তে পুরো গাছটিকে ৫ সে: মি: গভীর পরিখার সমতলে মাটির উপর শুইয়ে দিয়ে খুটি দিয়ে আটকে দিতে হয়। কিছু কিছু প্রশাখা এবং করা ডাল কেটে দেয়া হয়। এরপর শোয়ানো গাছের উপর রুটিং মিডিয়া (মাটি, কাঠের গুড়া, নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া ইত্যাদি) দিয়ে ৫-৭ সি: মি: পুরু করে ঢেকে দিতে হয়। শোয়ানো গাছ থেকে রুটিং মিডিয়া ভেদ করে নতুন টিপ বেরোতে থাকে। এ গুলো লম্বা হওয়ার সাথে সাথে রুটিং মিডিয়াও প্রয়োগ করতে হবে এমনভাবে যেন বিটপের গোড়ার অর্ধেকটা রুটিং মিডিয়ায় ডুবে থাকে। শেষ দফায় রুটিং মিডিয়া প্রয়োগ করার পর মিডিয়ার উচ্চতা ১৫-২০ সে: মি: হয়। প্রয়োজনে বিটপের গোড়ার অংশ থেকে বাকল তুলে দেয়া যেতে পারে। এতে প্রতিটি বিটপের গোড়ার বাকল তোলা

অংশের উপর থেকে শিকড় বের হবে। শিকড় পুরোপুরি বিস্তৃতি লাভ করলে টিপের গোড়া থেকে আস্তে আস্তে মিডিয়া সরিয়ে শিকড়যুক্ত বিটপগুলিকে অতিসন্তর্পণে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রোপণ করতে হয়। পরবর্তীতে আবার একই মাতৃগাছ থেকে পরবর্তী মৌসুমে চারা উৎপন্ন করা যেতে পারে। যেমনঃ পেয়ারা, আপেল, নাশপতি, চেরী, ইত্যাদি।

ধাপ ১. নির্বাচিত চারা যা থেকে পরিখা দাবাকলম তৈরী করা হবে।

ধাপ ২. চারা গাছটিকে মাটির সমান্তরালে পরিখায় রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে।

ধাপ ৩. মাটি চাপা দেয়া অংশ থেকে নতুন গজানো শাখা।

ধাপ ৪. নতুন গজানো শাখার গোড়া থেকে শিকড় গজিয়েছে।

ধাপ ৫. আলাদা করা দাবা কলম।

ঘ) ঢিবি দাবাকলম: দাবা কলমের এই পদ্ধতিতে প্রথমে ফল গাছের ছোট চারা লাগানো হয়। চারা কিছুটা বড় হলে মাটির সমতল থেকে একটু উপরে (২.৫ সে:মি:) মূল কান্ডটিকে কেটে দেয়া হয়। এই মুড়ি কান্ড থেকে বেশ কিছু সংখ্যক বিটপ বের হলে পরে এদের মিডিয়া (মাটি, কাঠের গুড়া, নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া ইত্যাদি) দিয়ে ঢিবি আকারে বিটপের গোড়া ঢেকে দিতে হয়। বিটপ লম্বা হওয়ার সাথে সাথে ঢিবিও উঁচু করে দিতে হয। প্রয়োজনে বিটপের গোড়ার অংশ থেকে বাকল তুলে দেয়া যেতে পারে। এতে প্রতিটি বিটপের গোড়ার বাকল তোলা অংশের উপর থেকে শিকড় বের হবে। মৌসুমের শেষ দিকে শিকড়ওয়ালা টিপিগুলিকে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রোপণ করতে হয়। উদাহারণ - লেবু, পেয়ারা, আপেল ইত্যাদি।

ধাপ ১. গাছকে মাটির সমতলে কেটে ফেলা হয়েছে।

ধাপ ২. মাটি বা কাঠের গুড়া দিয়ে ঢাকা কাটা অংশ থেকে গজানো নুতন শাখা।

ধাপ ৩. নতুন গজানো শাখার ঢেকে দেয়া অংশ থেকে গজানো মূল।

ধাপ৪. নতুন দাবা কলম আলাদা করা হয়েছে।

ধাপ ৫. মাতৃগাছ পুনরায় ঢিপি দাবা কলম তৈরীর জন্য প্রস্তুত ।

ঙ) গুটিকলম

দাবা কলমের মধ্যে গুটি কলম সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত পদ্ধতি । গুটি কলমকে পট লেয়ারেজ, চাইনিজ লেয়ারেজ, এয়ার লেয়ারেজ, মারকটেজ নামেও ডাকা হয়ে থাকে। গুটিকলম নিরক্ষীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের গাছের বংশবিস্তারে বিশেষ করে ফল গাছের বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়।

গুটি কলমের ধাপ সমূহ

ধাপ ১. নির্বাচিত শাখা যাতে গুটি কলম করা হবে।

ধাপ ২. পাতা অপসারণ করে চক্রাকারে বাকল তুলে ফেলা হয়েছে।

ধাপ ৩. কাটা অংশের চারদিকে রুটিং মিডিয়াম দিকে ঢেকে রাখা হয়েছে এবং পানি ধারণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ধাপ ৪. রুটিং মিডিয়াম সহ ডালকে পাতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে।

ধাপ ৫. মূল গজানো দাবা কলম।

চিত্র: গুটি কলম

গুটি কলম সাধারণত

ক) মাটির সমান্তরালে অবস্থান করছে এমন শাখায় করা হয়ে থাকে। খ) নির্বাচিত ডালের বয়স ৬-১২ মাস হতে হবে।

গ) ডালটি পেন্সিলের মত মোটা হতে হবে, গাছের দক্ষিণ পূর্ব দিকের ডাল হলে উত্তম।

নির্বাচিত শাখার অগ্রভাগর ৩০-৪০ সে:মি: নীচে কয়েকটি পাতা সরিয়ে দুটি পর্ব মধ্যবর্তী অংশ থেকে ধারালো ছুরি দিয়ে চক্রাকারে ৪-৫ সে:মি: পরিমাণ জায়গায় বাকল তুলে ফেলতে হয়। কাটা জায়গার কাঠের উপরের সবুজাভ আবরণটি ছুরির বুক দিয়ে চেঁছে ফেলে দিতে হয। এতে ক্যাম্বিয়াম যোগসুত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ডালের উপরের দিকের কাটাটি গিটের কাছাকাছি হলে ভাল হয়। কারন এতে কলমে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায়। এরপর কাটা জায়গাটিকে পুরোপুরি রুটিং মিডিয়া (৫০% এটেল দোয়াশ মাটি + ৫০% পঁচা গোবর) নারিকেলের ছোবড়ার গুড়া, নারিকেলের ছোবড়া, পাটের আঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে শিকড় গজানোর জন্য কাটা উপরের অংশ যেন অবশ্যই রুটিং মিডিয়া দিয়ে ঢাকা থাকে। রুটিং মিডিয়া স্থাপনের পর এর চারদিকে স্বচ্ছ পলিথিনের শীট শক্ত করে বেধে দিতে হয যেমন কোন ভাবেই রুটিং মিডিয়া পিছলে না নেমে যায়। এ ব্যবস্থা রুটিং মিডিয়ায় পানি ধারণ নিশ্চিত করে। অনেক সময় সহজে শিকড় গজায় না এমন প্রজাতির কলমের ক্ষেত্রে কাটা অংশে রুটিং হরমোন (IBA, NAA, Kinetin ইত্যাদি) প্রয়োগ করা হয়। বৈশাখ - আষাঢ় মাস গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। গুটি কলমে শিকড় গজাতে গাছের প্রকার ভেদে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় নেয়। শিকড়ের রং প্রথমে সাদা থাকে, আস্তে আস্তে রং বদলিয়ে খয়েরী হয়। শিকড়ের রং খয়েরী হলে মাতৃগাছ থেকে ২ থেকে ৩ দফায় কেটে নিয়ে এসে নার্সারী বেডে রোপণ করতে হয়। উদাহারণঃ লিচু, কাগজীলেবু, পেয়ারা, ডালিম, জামরুল, বাতাবীলেবু, জলপাই,গোলাপজাম, করমচা, আম ইত্যাদি।

গুটিকলমের সুবিধা:

ক) এটি একটি সহজ পদ্ধতি এবং করতে খুব একটি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

খ) অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাছের চারা উৎপাদন করা যায়।

গ) কলমের চারায় কম সময়ে ফল ধারণ করে।

ঘ) যে সমস্ত প্রজাতি কাটিং এ সহজে শিকর গজায় না তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সফলতা বয়ে আনতে পারে।

গুটি কলমের অসুবিধা

ক) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই পদ্ধতি কাটিং অপেক্ষা ব্যয়বহুল এবং এর জন্য বাড়তি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

খ) এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিক সংখ্যক মাতৃ গাছের প্রয়োজন হয়।

যৌগিক দাবাকলম: সাধারণতঃ লতানো স্বাভাবের কাষ্ঠল শাখা বিশিষ্ট গাছে দাবা কলমের এ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। এর জন্য লম্বা এবং সহজে বাঁকানো যায় এমনি শাখা নির্বাচন করা হয়। শাখার প্রতিটি একান্তর পর্ব বা দু'টি বাদ রেখে তৃতীয় পর্ব মাটি চাপা দেয়া হয়। মাটির নিচে চাপা দেয়া অংশ থেকে শিকড় এবং উপরের অংশ থেকে বিটপ বের হয়। তখন এগুলো কেটে লাগানো হয়। যেমনঃ আঙ্গুর, মাধবীলতা ইত্যাদি।

ধাপ - ১. একটি শাখাকে একান্তর ক্রমিক ভাবে মাটিতে পোঁতা হয়েছে।

ধাপ - ২. মাটি চাপা অংশ থেকে মূল গজিয়েছে।

ধাপ - ৩. পর্ব থেকে নতুন শাখা ও মূল গজিয়েছে।

ধাপ - ৪. যৌগিক দাবা কলম পৃথক করা হয়েছে।

দাবা কলমের ব্যবস্থাপনা

ক) যেহেতু দাবা কলম নার্সারীতে বেশ কয়েক বছর স্থায়ী হয় তাই এর স্থান, মাটি, জলাবদ্ধতামুক্ত এবং উপযুক্ত পরিবেশে হতে হবে।

খ) দাবা কলমের মাতৃগাছ হুবহু উৎস গুণসম্পন্ন এবং রোগবালাই মুক্ত হতে হবে।

গ) দাবা কলমে শিকড় গজানোর সময় রুটিং মিডিয়া দিয়ে গোড়া অবশ্যই ঢেকে দিতে হয়। এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র শিকড় গজানোর স্থানে অন্ধকার প্রদানই নয় বরং প্রয়োজনীয় জীলয় রস এবং নিস্কাশনসহ অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করে।

ঘ) রোগ, পোকামাকড় এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে। তা না হলে দাবা কলমে পুরোপুরি সফলতা আসবে না।

ঙ) দাবা কলম মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসে অতিরিক্ত পাতা ও ডাল ছাটাই করে গোড়ার পলিথিন শীট খুলে ফেলে ৩/৪ দনি জাগ দেয়া উচিৎ। এতে হার্ডেনিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যার দরুন পরবর্তীতে কলমের চারা মাঠের প্রতিকুল আবহাওয়া সহজেই সহ্য করতে পারে।

চ) দাবা কলমের চারাগুলির উপরের অংশে শিকড়ের বিস্তৃতির অনুপাতে ছাটাই করতে হবে। এ ব্যবস্থা কলমের বৃদ্ধির সামঞ্জস্যতা রক্ষা করবে।

ছ) প্রাথমিকভাবে দাবা কলমের চারাগুলিকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা এবং আদ্রতাপূর্ণ জায়গায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

জ) ১৫ সে: মি: X ২৫ সে: মি: সাইজের ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগে ২ ভাগ মাটি: ১ ভাগ গোবর: ১ বাগ কম্পোষ্ট যুক্ত মিশ্রণ দিয়ে ভর্তি করতে হবে।

ঝ) হার্ডেনিং করা দাবা কলমের চারাগুলোকে পরবর্তীতে পলিথিন ব্যাগে লাগিয়ে আধো ছায়াযুক্ত স্থানে নতুন বিটপ গজানো এবং লেগে যাওয়া পর্যন্ত রাখতে হবে।

২.৩.৪ বাডেজ ও বাডিং বা কুঁড়ি সংযোজন পদ্ধতি (Budage and Budding)

বাডেজ হলো বাডিং এর সমষ্টিগত বা সাধারণ পদ্ধতি এবং এর অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ্ধতিকে বাডিং বলা হয়। যখন কাঠসহ বা কাঠ ছাড়া একটি কুঁড়ি বা ছোট একখন্ড বাকলসহ কোন গাছে সংযোজন করে সাফল্যের সাথে তা থেকে নতুন বিটপ উৎপন্ন করা হয় তখন তাকে কুঁড়ি সংযোজন বলা হয়। একে চোখ কলম ও বলে। জোড় কলমের মত এক্ষেত্রেও একই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াসমূহ ঘটে থাকে।সেসব গাছের বাকল সহজেই গাছ থেকে আলাদা করা যায় সাধারণত সেসব গাছেই কুঁড়ি সংযোজন করা হয়ে থাকে যেমন কুল, লেবু, আপেল, পেয়ারা ইত্যাদি।

কুঁড়ি সংযোজনের সুবিধা সমূহ (Advantages of budding)

১) এ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে খুব কম সময় লাগে এবং মাতৃগাছের গুণাগুণও বজায় থাকে। কুঁড়ি সংযোজন সফল হবে কিনা তা ২ সপ্তাহের মধ্যেই বুঝা যায়।

২) বিফল হলে একই মৌসুমে একই বিটপের উপর অন্য স্থানে পুনরায় কুঁড়ি সংযোজন করা যায়। কুঁড়ি সংযোজনের ফলে গাছে তাড়াতাড়ি ফুল-ফল ধরে।

৩) অল্প সময়ে অনেক বেশি কলম করা যায় বলে বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৪) একটি কাঙ্খিত মাতৃগাছ থেকে অনেক কলম করা যায়।

৫) কুঁড়ি সহজেই দূরবর্তী স্থানে স্থনান্তর করা যায়।

৬) এ পদ্ধতিতে কলম সফলতার হার খুব বেশি এবং খরচ খুব কম।

৭) একই গাছে একাধিক জাতের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।

কুঁড়ি সংযোজনের অসুবিধা সমূহ (Disadvantages of budding)

১) কুঁড়ির আকার বেশ ছোট বিধায় এর উপর কাজ করা বেশ কষ্টকর।

২) সব সময় উপযুক্ত ও ভালো কুঁড়ি পাওয়া যায় না।

৩) এর জন্য দক্ষ মালির প্রয়োজন হয়।

৪) যখন তখন কুঁড়ি সংযোজন করা যায় না।

চোখ কলমের পদ্ধতি সমূহ (Methods of budding)

ক) বর্ম / টি চোখ কলম (T-budding /Shield budding): কুঁড়ি সংযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটি অত্যন্ত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। আদিজোড়ের গায়ে টি আকারে কেটে সেখানে বর্মাকৃতির কুঁড়ি স্থাপন করা হয় বলে এ পদ্ধতির এই নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত যে কোন চোখ কলমের জন্য প্রথমে বীজ থেকে আদিজোড় উৎপন্ন করা হয়। একটি আদিজোড়ের কান্ড বা শাখা নির্বাচন করে উপযোগী স্থানে টি আকারে বাকল কাটতে হয়। অত:পর চাকুর মাথা কর্তিত স্থানে ঢুকিয়ে লম্বালম্বি ভাবে মৃদু চাপ দিয়ে বাকলকে কাঠ থেকে আলাদা করা হয়। কাঙ্খিত কুঁড়ি (উপজোড়) গাছ থেকে তুলে তার কাঠ পরিষ্কার করে বর্মাকারে কাটা হয় এবং আদিজোড়ে কাটা স্থানে প্রবিষ্ঠ করানো হয়। কুঁড়ি সংলগ্ন বাকলটি সাধারণত ২.৫ সেমি.লম্বা ও কুঁড়ি অপেক্ষা কিছুটা চওড়া করে তৈরী করা হয়। কুঁড়ি ও পত্রবৃন্ত উন্মুক্ত রেখে পলিথিন ফিতা দ্বারা বেঁধে দেয়া হয়। যখন কুঁড়িটি আদিজোড়ের সাথে সাফল্যজনকভাবে লেগে যায় এবং নতুন বিটপের

২০২৪

প্রস্ফুরণ ঘটে তখন পলিথিন ফিতা খুলে ফেলা হয়। নব বিটপ ১০-১২ সেমি.লম্বা হলে সংযোজিত স্থানের উপর থেকে আদিজোড়ের মাথা কেটে দেয়া হয়। বসন্ত কালই (মার্চ-এপ্রিল) এজন্য সবচেয়ে উপযোগী সময়, তবে বেশী শুস্ক ও বর্ষাকাল ছাড়া গাছভেদে বছরের যে কোন সময়ই এ কলম করা যায়। আম আপেল কাঠাল লেবুকমলালেবু সফেদা কামরাঙ্গা আতা পীচ প্রভৃতি গাছের টি চোখ কলম করা যায়। তবে গোলাপ ও লেবু জাতীয় গাছে এ পদ্ধতি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যে সব গাছের বাকল পাতলা সেসব গাছে টি/বর্ম চোখ কলম করা হয়।

খ) উল্টা টি চোখ কলম (Inverted T -budding): বৃষ্টিবহুল এলাকায় বা বর্ষাকালে টি চোখকলম করা কিছুটা অসুবিধাজনক। তাই তখন উল্টা টি চোখকলম করা হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি যাতে সংযোজিত স্থানের ভিতরে জমে থাকতে না পারে প্রধানত সে জন্যই এ সময় এ কলম করা হয়ে থাকে। প্রমে উল্টা টি আকারে (⊥) আদিজোড়ে বাকল কেটে সেখানে উল্টা করে তৈরিকৃত বর্মাকৃতির কুঁড়িটিকে কাটা বাকলের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। কুঁড়ি সংযোজনের কাজ সাধারণত ৫ মিনিটের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়। লেবুতে এ পদ্ধতি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ) আই চোখ কলম (I -budding) এ ধরনের চোখকলম তৈরির জন্য কুঁড়িটিকে প্রমে বর্গাকার বা আয়তাকারে কাটা হয়। অত: পর আদিজোড়ের বাকলে কুঁড়ির দৈর্ঘ্য সমান করে আনুভূমিকভাবে দু 'টি কর্তন দেয়া হয়। এ দু 'টি কাটা স্থানের মাঝখানে লম্বাভাবে একটি কর্তন দিয়ে যোগ করা হয়। ধীরে ধীরে বাডিং নাইফ বা চাকুর মাথা দিয়ে কর্তিত বাকলকে আল্গা করে সেখানে প্রস্তুতকৃত কুঁড়িটিকে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং তারপর টি চোখকলমের মতই অন্যান্য কাজ করা হয়।

ঘ) তালি চোখ কলম (Patch/Plate budding): এ পদ্ধতিতে বাকলকে আয়তাকারে কাটা হয়। অতপর ঐ আয়তাকার স্থনে প্রস্তুতকৃত কুঁড়িটিকে তালির মত স্থাপন করা হয় এবং মোমযুক্ত ফিতা বা পলিথিন ফিতা দ্বারা পেচিয়ে বেধেঁ দেয়া হয়। তবে বাঁধার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কুঁড়িটি কোন সময় ফিতা দ্বারা ঢাকা না পড়ে। এ কলমের জন্য ১.২৫-২.৫ সেমি. ব্যাসের আদিজোড় উত্তম। সংযোজিত কুঁড়ি থেকে ১৫-৩০ দিনের মধ্যেই নতুন বিটপের উন্মোচন ঘটে। তখন আদিজোড়ে জন্মানো অন্যান্য নতুন কুশি বা বিটপ অপসারণ করতে হয়। যদিও কিছু কিছু তালি চোখ কলম টি চোখ কলমের চেয়ে ধীরগতি সম্পন্ন তবুও কিছুটা পুরু বাকলবিশিষ্ট গাছের জন্য এ পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। পুরু বাকল বিশিষ্ট গাছে বর্ম চোখ কলম করতে গেলে আদিজোড়ের বাকল ফেটে যেতে পারে। যেমন আখরোট, পিকান প্রভৃতি ফলগাছে টি চোখ কলমের ভালো ফল পাওয়া যায় না কিন্তু তালি চোখ কলমে অনেক বেশী সফলতা পাওয়া যায়। এছাড়া কুল, কমলালেবু, পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলগাছেও সাফল্যজনকভাবে তালি চোখ কলম করা যায়।

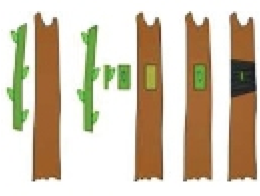

চিত্র: তালি চোখ কলম

ঙ) বলয় বা আংটি চোখ কলম (Ring budding) উপজোড় থেকে কুঁড়িসহ চ-াকারে সম্পূর্ণ বাকল তুলে আদিজোড়ে সংযোজন করাই হলো চ- চোখকলম। এ পদ্ধতিতে উপজোড় থেকে একটি কুঁড়িসহ চ-াকারে ১.২৫-২.৫ সে. মি. লম্বা বাকল কাঠ থেকে আলগা করে ধীরে ধীরে তুলে নেয়া হয়। অনুরূপে একই ব্যাসের আদিজোড়ের যেখানে কুঁড়ি সংযোজন করা হবে সেখান থেকেও সমদৈর্ঘ্যরে বাকল তুলে নেয়া হয়। একাজ একটি দ্বিফলা ছুরি দ্বারা সম্পনড়ব করলে উভয়জোড়ের কর্তিত বাকলের দৈর্ঘ্য/উচ্চতা সমান থাকে। অতঃপর কুঁড়িযুক্ত বাকলটিকে আদিজোড়ের বাকলমুক্ত স্থানে স্থাপন করে এঁটে দিতে হয়। স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই উপজোড় কুঁড়িটি আদিজোড়ের সংগে জোড়া লেগে যায় এবং ২০-২২ দিন পরে সুপ্ত কুঁড়িটি অঙ্কুরিতহয়ে নতুন শাখা উৎপনড়ব করে। কুল, পেয়ারা প্রভৃতি গাছে এ কলম করা যায়।

চ) কুচি চোখ কলম (Chip budding) যখন বাকলকে আদিজোড় বা উপজোড় থেকে সহজে আলগা করা যায় না তখন এ কলম করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে আদিজোড় ও উপজোড় উভয় গাছ থেকেই চীপ বা কুচি আকারে কিছু কাঠসহ বাকল তুলে ফেলা হয়। উপজোড়ের ক্ষেত্রে এর সাথে একটি কুঁড়ি থাকে। সাধারণত: এই কুচির দৈর্ঘ্য ২.৫-৩.০ সে. মি. হয়ে থাকে। আদিজোড়ে আন্তঃপর্বের মসৃণ জায়গা থেকে এরূপ কুচি তোলা হয় উপজোড় শাখা থেকে এবং অনুরূপ আকৃতির একটি কুঁড়িসহ কুচি কেটে সেখানে সংযুক্ত করা হয়। সংযোজনের পর পলিথিন ফিতা দ্বারা কুঁড়ি উন্মুক্ত রেখে বেঁধে দেয়া হয়। পেয়ারা, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলগাছে এ কলম করা যায়।

ছ) জিহ্বা বা ফোরকার্ট চোখকলম (Forkert budding) এ পদ্ধতিতে আদিজোড়ে আন্ত ঃপর্বের বাকলে ধারালো চাকু দ্বারা আড়াআড়িভাবে ১.২ সে.মি. ছেদন করার পর ঐ ছেদন রেখার প্রান্ত দ্বয় থেকে লম্বাভাবে ৪ সে.মি. লম্বা দুটি ছেদন রেখা টানা হয়। এরপর ছেদিত বাকলের মুক্তপ্রান্ত ধীরে ধীরে টান দিলে কাঠ থেকে আলগা হয়ে উঠে আসে এবং নিচের দিকে যুক্ত থাকায় জিহবার মত ঝুলে পড়ে। এজন্য একে জিহবা চোখকলমও বলে। অনুরূপভাবে উপজোড় বা মাতৃগাছ থেকে ১.২ সে.মি. চওড়া ও ৩.০ সে.মি. লম্বা একটি চোখ বা কুঁড়িসহ বাকল তুলে আদিজোড়ে স্থাপন করে কুঁড়ির অগ্রভাগ খোলা রেখে ফিতার সাহায্যে বেঁধে দিতে হয়। কুঁড়ির বৃদ্ধি শুরু হলে ফিতার বাঁধন ঢিলে করে দিতে হবে।

কুঁড়ি সংযোজনে সাবধানতা অবলম্বন (Precautions to be taken during budding)

চোখ কলম তৈরীর সময় নিম্নলিখিত সাবধানতাসমূহ অবলম্বন করা উচিত-

১) কুঁড়ি সংযোজন বা চোখ স্থাপন ৪-৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

২) কুঁড়ি স্থাপনের পর ফিতা দ্বারা বাঁধার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন কুঁড়িটি ঢাকা না পড়ে।

৩) বাকল ছেদন করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন বাকলের উপর কুঁড়ি ও নিচের ক্যাম্বিয়াম স্তর ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

৪) আদিজোড়ের বিটপ সমূহ কুঁড়ি সংযোজনের ৩/৪ সপ্তাহ হওয়ার পর জোড় স্থানের উপরিভাগ কেটে দিতে হবে।

৫) বলয় চোখ কলমের ক্ষেত্রে আদিজোড় ও উপজোড় সমব্যাসযুক্ত হতে হবে। অন্যান্য চোখ কলমের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যেন কুঁড়িসহ বাকল ও কুঁড়ি সংযোজনের স্থান সমান আকার-আকৃতি বিশিষ্ঠ হয়, যাতে তারা পরস্পর খুব ভালভাবে খাপ খায়।

২.৩.৫ গ্রাফটিং, লেয়ারিং ও বাডিং পদ্ধতির মাঝে তুলনামূলক পার্থক্য

গ্রাফটিং	লেয়ারিং	বাডিং
উপজোড়কে মাতৃগাছে সংযুক্ত অবস্থায় রেখে এবং মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আদিজোড়ের সাথে জোড়া লাগানো হয়।	মাতৃগাছের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় এর শাখায় অস্থানিক শিকড় গজিয়ে মাতৃগাছের হুবহু গুণসম্পন্ন চারা উৎপাদনের কৌশল"	একটি উদ্যানতাত্তিক কৌশল যেখানে একটি উদ্ভিদের একটি কুঁড়ি একটি দ্বিতীয় উদ্ভিদে ঢোকানো হয়।
গ্রাফটিং এর জন্য একই প্রজাতির দুটি গাছের প্রয়োজন হয়।	শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদ প্রয়োজন।	শুধুমাত্র একটি উদ্ভিদ প্রয়োজন।
একটি উদ্ভিদের কাংখিত বৈশিষ্ট্য পেতে এই পধ্ধতি ব্যবহার করা হয়।	কাংখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান	একটি উদ্ভিদের কাংখিত বৈশিষ্ট্য পেতে এই পধ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিক সংখ্যক মাতৃগাছের প্রয়োজন হয়।	এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিক সংখ্যক মাতৃগাছের প্রয়োজন হয়।	একটি কাঙ্খিত মাতৃগাছ থেকে অনেক কলম করা যায়।
একই গাছে একাধিক জাতের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।	একই গাছে একাধিক জাতের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়।	একই গাছে একাধিক জাতের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব।
লেয়ারিং এর তুলনায় এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর।	পুরাতন পদ্ধতি	নতুন পদ্ধতি
এক্ষেত্রে সায়ন হচ্ছে কান্ডের অংশ।	লেয়্যারিং শুধুমাত্র উদ্ভিদের শাখায় করা হয়।	এটি এক ধরণের গ্রাফটিং। এক্ষেত্রে একটি বাড হচ্ছে সায়ন।
শীতকালে এবং বসন্তের শুরুতে	শীতকাল ছাড়া সব সময় করা	স্টকের সক্রিয় ক্রমবর্ধমান

স্টক সুপ্ত থাকলে গ্রাফটিং করা হয়।	সম্ভব	মৌসুমে বাডিং করা হয়।
গ্রাফটিং বাডিং এর চেয়ে বেশি সময়সাপেক্ষ।	বাডিং এর চেয়ে সময় বেশি লাগে	গ্রাফটিং এর তুলনায় কম সময় লাগে

২.৪ টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার

২.৪.১ টিস্যুকালচারের সংজ্ঞা

জীবাণুমক্ত পরিবেশে কালচার মাধ্যমের সাহায্যে পরীক্ষানলে বা অন্য কোনো পাত্রে পুষ্টি ও পরিবেশ নিয়ন্তক পুর্বক উদ্ভিদের কোনো ক্ষুদ্র অঙ্গ থেকে এর বংশ বিস্তার করাকে টিস্যুকালচার বলে। টিস্যু কালচার বলতে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কৃত্রিম মাধ্যমে (ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে) উদ্ভিদের কোনো কর্তিত অংশ (explant) থেকে বংশবিস্তার করাকে বোঝায়। এর আরেকটি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে ইন-ভিট্রো কালচার।

২.৪.২ টিস্যু কালচারের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি

যে কোনো সফল টিস্যু কালচারের জন্য সাধারণত নিুলিখিত সুবিধাদির প্রয়োজন হয়, যথা- (ক)কালচার ল্যাবরেটরী (খ) জীবাণুমুক্তকরণ ব্যবস্থা (গ) কালচার মাধ্যম ও (ঘ) কালচার পরিবেশ।

২.৪.৩ টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্য, ব্যবহার ও সুবিধাসমূহ

আজকাল বর্ধিত হারে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই টিস্যুকালচারের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মুখ্যতঃ বংশবিস্তারের কাজে টিস্যু কালচার প্রাথমিকভাবে দু'টি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় যথা- (ক) দ্রুত অসংখ্য নতুন চারা বা ক্লোন তৈরি করা ও (খ) নির্দিষ্ট রোগজীবাণু-পরীক্ষিত (specific pathogen-tested) ক্লোনসমূহের বর্ধন, ব্যবস্থপনা ও বিস্তার। এ ছাড়াও দূরবর্তী অঞ্চলে রোপণদ্রব্য স্থানান্তর, দীর্ঘদিন যাবৎ ক্লোনাল দ্রব্য সংরক্ষণ প্রভৃতিতে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদ্ভিদ প্রজননবিদগণও তাদের বিভিন্ন কাজে এ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকেন।

২.৪.৪ টিস্যু কালচারের সুবিধাসমূহ

- নির্দিষ্ট ক্লোনের গণবংশবিস্তার- অল্প সময়ে দ্রুত বংশবিস্তার টিস্যু কালচারের একটি অন্যতম সুবিধা।
- রোগজীবাণুমুক্ত গাছ উৎপাদন- টিস্যু কালচার এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে ক্লোনকে জীবাণুমুক্ত করা হয় এবং ব্যবহারকারীদের নিকট না দেয়া পর্যন্ত জীবাণু দ্বারা পুনঃ আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়।
- হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য মাতৃগাছের ক্লোনাল বংশবিস্তার- সাধারণত অ্যাসপারাগাস, টমেটো, কুমড়া জাতীয় সবজী এবং ব্রোকলির জন্য করা হয়।

- একবীজপত্রী উদ্ভিদের অঙ্গজ বংশবিস্তার- একবীজপত্রী উদ্ভিদে সাধারণত বীজ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বংশবিস্তার করা যায় না। কিন্তু টিস্যু কালচারের মাধ্যমে এসব গাছের বংশবিস্তার করা যায়, যেমন- নারিকেল খেজুর ইত্যাদি।

পাঠসংক্ষেপ

- সাধারণভাবে একটি গাছ থেকে আরেকটি গাছের জন্ম হওয়ার পদ্ধতিকে গাছের বংশবিস্তার বলে।
- বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে কখনো মাতৃগাছের গুণাগুন অক্ষুন্ন থাকে না।
- মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত কলম করার উপযুক্ত সময়।
- বিভিন্ন ফসলের চারা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়।
- দাবা কলমের মধ্যে গুটি কলম সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত পদ্ধতি ।
- কুঁড়ি সংযোজন বা চোখ স্থাপন ৪-৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- বৃষ্টিবহুল এলাকায় বা বর্ষাকালে টি চোখকলম করা কিছুটা অসুবিধাজনক।
- কলম করার সময় অতিরিক্ত রোদ থাকলে উপরে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করলে সফলতার হার বেড়ে যায়।
- স্টক গাছে অনাকাঙ্ক্ষিত কুশি বের হওয়ার পর পরই ভেঙ্গে দিতে হবে।
- সায়নের মাথায় কুঁড়ি গজানোর সাথে সাথেই পলিথিনের ক্যাপটি খুলে দিতে হবে।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা বিভিন্ন ফলের/ফুলের বংশবিস্তারের পদ্ধতি সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি গাছের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তুমি ছবি দেখে বংশবিস্তারের পদ্ধতিসহ সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ কর।

ক্রমিক নং	গাছের নাম	বংশবিস্তারের পদ্ধতি	সময়	সুবিধা	অসুবিধা
০১	গোলাপ ও লেবু জাতীয় গাছ				
০২	লিচু ও পেয়ারা				
০৩	খেজুর				
০৪	আম,কাঁঠাল				
০৫	জলপাই, কামরাঙ্গা, ডালিম				
০৬	চা				
০৭	চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, গাঁদা,				
০৮	কুল বা বরই				

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

তোমার এলাকার রফিক ভাই তার নার্সারীতে গোলাপ ও অপ্রচলিত ফলের চারা করতে চায়। নিম্নের প্রশ্নের আলোকে সফলভাবে চারাকলম তৈরি পরামর্শ প্রদানপূর্বক প্রতিবেদন তৈরি কর।

১) বংশবিস্তারের কোন কোন পদ্ধতি অনুসরন করবে?

২) আদিজোড় ও উপজোড়ের বৈশিষ্ট্যসহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা উল্লেখ কর।

২) চারা কলমের পরবর্তী পরিচর্যা উল্লেখ কর।

৩) ফাটল কলম তৈরির জন্য কি কি করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. উদ্ভিদের বংশ বিস্তার বলতে কি বোঝায়?

২. কোন ধরনের বংশ বিস্তার আম গাছের জন্য উপযোগী?

২. কোন্ বংশ বিস্তারের মাধ্যমে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব?

৪. গুটি কলমের জন্য উপযুক্ত সময় কখন?

৫. কীভাবে বংশ বিস্তার করলে মাতৃ গাছের গুণাগুণ ঠিক থাকে না?

৬. কোন অবস্থায় গাছ থেকে গুটিকলম সংগ্রহ করা হয়?

৭. শাখা কলমে কমপক্ষে কয়টি পর্বসন্ধি থাকা উচিত?

৮. শাখা কলমের জন্য উত্তম সময় কোন্ টি?

৯. শাখা কলম সাধারণত মাটির সাথে কত ডিগ্রি কোণ করে লাগাতে হয়?

১০. আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কোন্ দাবাকলম?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. যৌন বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায়?

২. শাখা কলম বলতে কী বোঝায়?

৩.শাখা কলম কত প্রকার ও কী কী?

৪.ভিনিয়ার ও সংস্পর্শ জোড়কলমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী

৫. দাবা কলম বলতে কী বোঝায়?

৬. আদি জোড়ের গোড়া থেকে কমপক্ষে কত উপরে কাটতে হয়?

৭. টি চোখ কলমের ক্ষেত্রে কুড়ি সংলগ্ন বাকলটি সাধারনত কত সে. মি. লম্বা করে কাটা হয?

৮.টি চোখকলম কখন করা হয়?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. অঙ্গজ ও যৌন বংশ বিস্তারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিপিবদ্ধ করুন।

২. জোড়কলমের সুবিধা ও অসুবিধাসমহ লিপিবদ্ধ করুন।

৩. আমের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. কাঁঠালের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. লিচুর চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৬.স্টক চারা তৈরির ধাপসমুহ বর্ননা কর।

জব ২.১ শাখা কলম পদ্ধতি অনুশীলন

শিখনফল

এ জব শেষে আমরা-

- শাখা ও গুটিকলম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গীক দ্রব্যের তালিকা তৈরি করতে পারব।
- শাখা কলম হাতে কলমে তৈরি করতে পারব।
- শাখা কলম তৈরি করার জন্য কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি

ক) উন্নত জাতের মাতৃগাছ

খ) সিকেচার

গ) ধারালো চাকু

ঘ) নার্সারি বেড

ঙ) খুরপী

চ) কোদাল

ছ) ছায়াযুক্ত স্থান

কাজের ধাপ

- শাখার অগ্রভাগ থেকে ১৫ সে. মি. বাদ দিয়ে নির্বাচিত মাতৃগাছ থেকে ৩টি পর্বসহ এক বছর বয়সের ২০-২৫ সে. মি. দীর্ঘ একটি শাখা সিকেচারের সাহায্যে কেটে নিতে।
- শাখার উপরের প্রান্ত পর্বসন্ধির ২.০ সে. মি. উপরে গোল করে ও কর্তিত শাখার নিচের প্রান্ত পর্বসন্ধির ঠিক নিচে ৩/৪ সে. মি. দীর্ঘ করে তির্যকভাবে কাটতে হবে।
- এক তৃতীয়াংশ মাটির উপরে ও দুই তৃতীয়াংশ মাটির নিচে রেখে মাটির সাথে ৪৫থ কোণ করে নার্সারি বেডে ছায়াযুক্ত স্থানে শাখা কলমটি রোপণ করতে হবে।
- অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শাখা কলম তৈরি করে নার্সারি বেডে রোপণ করতে হবে।

সাবধানতা

- শাখা কলম রোপণের সময় অগ্রভাগ উপরে রেখে নিুাংশ মাটিতে পুতে দিতে হবে।
- নার্সারি বেড অর্ধ ছায়াযুক্ত স্থানে হওয়া বাঞ্চনীয়।
- নার্সারি বেডের মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক কিন্তু সুনিষ্কাশিত হওয়া বাঞ্চনীয়।

জব ২.২ আমের জোড় কলম তৈরীর কলাকৌশল

সাধারণভাবে একটি গাছ থেকে আরেকটি নতুন গাছের জন্ম হওয়ার পদ্ধতিকে গাছের বংশবিস্তার বলে। অন্য কথায় যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গাছ যৌন কোষ বা তার অংগজ কোষ থেকে নতুন স্বতন্ত্র গাছ সৃষ্টি করে তাকে বংশবিস্তার বলে। বংশ বিস্তার সাধারনত ২ ধরনের হয়ে থাকে যথা-

১। যৌন বংশবিস্তার এবং ২। অযৌন বংশ বিস্তার

যেহেতু ফল গাছ রোপণের মূল উদ্দেশ্য হলো ভালো, উন্নতমান ও মাতৃ গাছের গুনাগুন সম্পন্ন ফল পাওয়া। এ কারণে ফল গাছের ক্ষেত্রে যৌন পদ্ধতির তুলনায় অযৌন পদ্ধতির চারা, কলম অধিক গুরুত্বপুর্ন। অযৌন বংশবিস্তার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে ভিনিয়ার গ্রাফটিং, ক্লেফট গ্রাফটিং ও স্টোন গ্রাফটিং অন্যতম পদ্ধতি।

শিখনফল

১। গ্রাফটিং বা কলমের জন্য মাতৃগাছ বা রুটস্টক নির্বাচন করতে পারবে।

২। গ্রাফটিং বা কলমের জন্য সতেজ ও সবল সায়ন নির্বাচন করতে পারবে।

৩। গ্রাফটিং বা কলমের সকল ধাপসমূহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

৫। গ্রাফটিং বা কলমের মাধ্যমে আমের সুস্থ ও সবল চারা তৈরী করতে পারবে।

কাজের ধাপ

ক) ভিনিয়ার গ্রাফটিং

সংযুক্ত জোড় কলমের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ভিনিয়ার পদ্ধতির কলম প্রচলন আসে। বর্তমানে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আমের কলম ভিনিয়ার পদ্ধতিতে করা হয়। এই পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত জাতের গাছ থেকে সায়ন বা উপজোড় কেটে নিয়ে এসে আদিজোড় বা রুটস্টকের সাথে বিশেষ পদ্ধতিতে জোড়া লাগানো হয়।

আদিজোড়: আমরা যে গাছের সাথে নতুন একটি ডাল এনে জোড়া লাগাবো ঐ গাছটিকে আদিজোড় বলে।

উপজোড়: চাহিদাকৃত যে ডালাটি এনে আদিজোড় এর সাথে জোড়া লাগানো হবে তাকে উপজোড় বলে।

সময়: ভিনিয়ারের উপযুক্ত সময় বৈশাখ- জ্যৈষ্ঠ তবে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত করা যাবে।

আদিজোড় ও উপজোড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

আদিজোড় নির্বাচন পদ্ধতি

১) চারা বা শাখার বয়স এক থেকে দেড় বছর হতে হবে।

২) চারা স্বাস্থ্যবান, নিরোগ ও পেন্সিলের মত মোটা হতে হবে।

৩) চারা বা শাখাঁটি শক্ত কাঠের মত হতে হবে।

উপজোড় নির্বাচন পদ্ধতি

১) একটি সুস্থ সবল বড় গাছ হতে উপজোড় সংগ্রহ করতে হবে।

২) উপজোড় শাখার বয়স আদিজোড় শাখার বয়সের সমান হতে হবে।

৩) উপজোড় শাখার আকার আদিজোড় শাখার সমান হতে হবে।

১) আদিজোড় প্রস্তুতকরণ - মাটি থেকে ১৫-২৫ সে: মি: উঁচুতে চারার যে কোন একপাশে ৩-৫ সেন্টিমিটার লম্বা করে ওপর থেকে নিচে তীর্যকভাবে বাকল সহ কাঠের সামান্য অংশ ধারালো ছুরি দ্বারা কাটতে হবে। - কর্তনকৃত ডালের নিচের অংশে 'V' আকৃতির একটি পকেট তৈরি করতে হবে।	চিত্রঃ আদি জোড়
২) উপজোড় প্রস্তুতকরন -উপজোড় এর জন্য ২-৩ টি কুড়িসহ ডাল নির্বাচন করতে হবে। -ধারালো ছুরি দিয়ে আদিজোড়ের কর্তন অংশের সমান করে (৩-৫ সে:মি) উপজোড়টি তৈরি করতে হবে। - উপজোড়ের কর্তন অংশের পিছনে 'V' আকৃতি করে দিতে হবে যাতে করে আদিজোড়ের কর্তন অংশের সাথে উপজোড়টি হুবহু মিলে যায়।	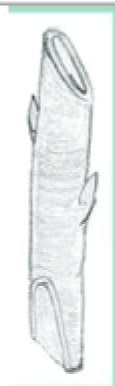 চিত্রঃ উপজোড়
৩) জোড়া লাগানো -আদিজোড় ও উপজোড় এর কাটা অংশ মুখোমুখি করে মিলিয়ে এমন ভাবে মিশাতে হবে যাতে ভিতরে কোন ফাঁক না থাকে। - এরপর পলিথিন দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধে দিতে হবে। - উপজোড়টিকে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। - ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই আদিজোড়ের সাথে উপজোড় জোড়া লেগে যাবে। উপজোড়ের কুঁড়ি ফুটে নতুন পাতা বের হবে - এ সময় পলিথিন খুলে দিতে হবে।	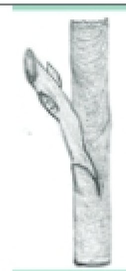 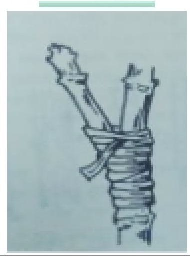

২০২৪

খ) ক্লেফট গ্রাফটিং

এই গ্রাফটিং সহজ এবং রুটস্টকের যে কোন বয়সে করা সম্ভব। এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে বর্তমানে নার্সারী পর্যায়ে এর প্রচলন কম। অনেক সময় বাজারে ক্লেফট গ্রাফটিং এর চারা বাজারে বিক্রয় করতে অসুবিধায় পড়েন কারণ এই গ্রাফটিং এ জোড়া অংশ এমন সুন্দরভাবে মিলিয়ে যায় যে ক্রেতারা চারাটি কলমের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তব্ওু উত্তম বংশবিস্তার পদ্ধতি হিসেবে এখন থেকে ক্লেফট গ্রাফটিং এর প্রচলন বাড়ানো জরুরী।

সময়

উপযুক্ত পরিবেশ ও সঠিক বয়সের সায়ন পেলে সার বৎসর ক্লেফট গ্রাফটিং করা যাবে। তবি উত্তম সময় এপ্রিল-জুন মাস। তবে সেচ ও ছায়ার ব্যবস্থা করা গেলে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসেও করা যাবে।

রুটস্টক ও সায়ন নির্বাচন

রুটস্টকের বয়স বিশেষ করে আমের ক্ষেত্রে যে কোন বয়সের হতে পারে, তবে ১ বৎসর বয়সের রুটস্টকে কলম বেশি করা হয়। সায়নের বয়স পরিপুষ্ট হতে হবে। চলতি মৌসুমের ডালের পাতাগুলো যখন গাঢ় সবুজ হবে, ডালের ডগায় কুঁড়ি স্ফীত বা ফোটা ফোটা ভাব হবে এবং রোগ বালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ মুক্ত হবে, তখন ঐ ডালকে উপযুক্ত সায়ন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

রুটস্টক ও সায়ন প্রস্তুতকরণ (১-২ বৎসর বয়সের ক্ষেত্রে)

১। সতেজ, সবল, সুস্থ রুটস্টক নিতে হবে।

২। মূল ও কান্ডের সংযোগস্থলের যথাসম্ভব কাছাকাছি কান্ডের সবুজ ও খয়েরী রং এর মিশ্রণ স্থানে রুটস্টকের মাথা কেটে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কাটা জায়গার নিচে যাতে অবশ্যই কিছু পাতা থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। কাটা মাথার মাঝ বরাবর পরে ধারালো চাকু দিয়ে আনুমানিক ৩-৪ সে.মি. পর্যন্ত চিরে দুভাগ করতে হবে।

৪। পরিপুষ্ট সায়নের সমস্ত পাতা বোটা রেখে কেটে ফেলতে হবে।

৫। এরপর সায়নের গোড়ার দিকে, দুই ধার তেরছা করে কাটতে হবে যেন সায়নের গোড়ার দিকটা ৩-৪ সে.মি. পর্যন্ত ক্রমশ মোটা থেকে পাতলা পাতের মত হয়।

৬। এখন উভয় পাশে তেরছা করে কাটা গোড়ার এই পাতমত অংশটি রুটস্টকের ফাটলের ভিতর ঢুকিয়ে মাপমত বসিয়ে দিতে হবে। তারপর পলি টেপ দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে।

৭। এরপর জোড়া লাগানো অংশসহ সম্পূর্ণ সায়নটি পলি কভার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

স্টোন গ্রাফটিং

আসলে স্টোন গ্রাফটিং ক্লেফট পদ্ধতি থেকে তেমন আলাদা কিছু নয়। আমের চারার একেবারে ছোট অবস্থায় (৭-৩০ দিন বয়সে) অর্থাৎ যখন আটি চারার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে ঐ সময় জোড়া কলম করাকেই স্টোন গ্রাফটিং বলে। এটি ক্লেফট পদ্ধতিতে ছোট চারার উপর করা হয়।

আমের স্টোন গ্রাফটিং এর ক্ষেত্রে যা মনে রাখতে হবে তা হলো

১। যেহেতু চারাগুলো খুবই নরম থাকে, তাই পাতলা ধারালো চাকু বা ব্লেড দিয়ে জোড়া লাগানোর জন্য কাটাকাটির কাজ করতে হবে।

২। স্টোন গ্রাফটিং এর চারার বৃদ্ধি প্রাথমিক পর্যায়ে কম তবে একেবারেই নিচে অর্থাৎ মাটির নিকটবর্তীতম জায়গায় করা যায় বিধায় গাছ ঝোপালো হয় ও অফসুট (জোড়া লাগার নিচের অংশে অনাকাঙ্ক্ষিক্ষত কচি ডগা) গজানোর সমস্যা কম হয়।

৩। তবে মনে রাখতে হবে, রুটস্টক যতই কচি বা নরম হোক না কেন, সায়ন অবশ্যই আগের বর্ণনা অনুসারে পরিপুষ্ট, সঠিক বয়সের হতে হবে।

আমের জোড় কলমের সফলতার জন্য কোন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি

১। সায়ন ও রুটস্টক বয়স ও আকার আকৃতির দিক থেকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যেন তারা সহজে মিলে মিশে একাকার হতে পারে।
২। রুটস্টক অবশ্যই সঠিক বয়স ও তেজের হতে হবে।
৩। সায়ন অবশ্যই সঠিক বয়স ও পরিপুষ্ট হতে হবে।
৪। গ্রাফটিং অবশ্যই সঠিক সময়ে করতে হবে।
৫। রুটস্টক ও সায়নের জোড়া এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে ভিতরে অবশ্যই যেন কোন ফাঁক না থাকে।
জব ১২.৩ গুটি কলম এর মাধ্যমে লিচু গাছের চারা উৎপাদন
গুটিকলম দাবাকলমের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। গুটি কলম সাধারণত ফল গাছের গাছের বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বিভিন্নরকম ফলের বংশবিস্তারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ পেয়ারা, লেবু, জামরুল, লিচু, ডালিম, করমচা, গোলাপজাম, জলপাই, কামিনী ইত্যাদি। সাধারণত ঝোপালো কম উঁচু ফল গাছে এ ধরণের গাছের বংশবিস্তারের জন্য গুটি কলম উপযোগী।

শিখনফল

১। কলমের জন্য মাতৃগাছ নির্বাচন করতে পারব।

২। মাতৃগাছ হতে প্রয়োজনীয় সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন করতে পারবে।

৩। কলমের জন্য প্রয়োজনীয় রুটিং মিডিয়াম তৈরী করতে পারবে।

৪। গুটি কলমের সকল ধাপসমূহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

৫। গুটি কলমের মাধ্যমে লিচুর সুস্থ ও সবল চারা তৈরী করতে পারবে।

কাজের ধাপ

শাখা গুটি কলম

যেসব গাছের শাখার অগ্রভাগের অংশ নিচের দিকে নুইয়ে পড়ে সেশব গাছে শাখা কলম করা হয়। শাখা কলম করার জন্যে এর কিছু অংশবিশেষের বাকল তুলে ৫-৭ সেমি মাটির গভীরে পুঁতে রাখা হয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা উপরের অংশের গোড়া থেকে অস্থানিক শিকড় গজায় এবং তখন মাতৃগাছ থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে রোপণ করা হয়। যেমনঃ রাস্পবেরী, কালো জাম ইত্যাদি।

গুটি কলমের ধাপসমূহ

ক) সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন।

খ) নির্বাচিত শাখার বাকল তুলে ফেলা।

গ) কাটা অংশে রুটিং মিডিয়ামের ব্যবহার।

ঘ) রুটিং মিডিয়ামসহ গাছকে পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে আবদ্ধ রাখা।

ঙ) মূল উৎপাদন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দ্রব্যাদি

১। ধারালো ছুরি, ২। পলিথিন, ৩। সুতলি, ৪। মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়াম ইত্যাদি।

গুটি কলমের শাখা নির্বাচনে নির্দেশিকা

ক) ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করা শাখা নির্বাচন।

খ) কচি ও সুস্থ শাখা নির্বাচন।

গ) ডালটির পুরুত্ব পেন্সিলের মত হতে হবে

ঘ) শাখা কলম করার স্থান দক্ষিণ-পূর্ব দিকে করা উত্তম।

মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়া প্রস্তুতি

কলম করার জন্যে মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রুটিং মিডিয়া কলম কালীন অবস্থায় শাখাকে পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। কলম করার জন্যে যেসব রুটিং মিডিয়ামের প্রয়োজনঃ

ক) ৫০% এঁটেল-দোআঁশ মাটি, খ) ৫০% গোবর সার, গ) নারিকেলের ছোবড়া/ গুড়া, ঘ) পাটের আঁশ

এগুলো একসাথে মিশ্রিত করে শিকড় গজানোর স্থানে ঢেকে দিতে হবে।

গুটি কলমের উপযুক্ত সময়ঃ বৈশাখ - আষাঢ় মাস গুটি কলম করার উত্তম সময়।

লিচু গাছের গুটি কলম করার পদ্ধতিঃ

লিচু গাছে কলম করার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। গুটি কলমের জন্য এক থেকে দুই বছরের চারা ব্যবহার করা উত্তম।

১। মাতৃ গাছের নির্বাচিত ডালের আগা থেকে ৪০-৫০ সেমি লম্বা একটি গিটের নিচে কলমটি করতে হবে।

২। নির্বাচিত ডালের মধ্যে একটি গিটের নিচে ৩-৪ সেমি মাপে ডালের ছাল গোল করে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে।

২০২৪

৩। কেবল ডালটির বাকল উঠিয়ে ফেলতে হবে। ডালটির শক্ত কাঠটিতে আঘাত লাগানো চলবে না।

৪। ডালটির বাকল উঠিয়ে নেওয়ার পর কাঠটিতে লেগে থাকা সবুজ রং এর আবরণটি ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলতে হবে। এবং কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে।

৫। এরপর মাটির পেস্ট টি ডালের মধ্যে কাটা অংশটির মধ্যে দিয়ে ভালো ভাবে ঢেকে দিতে হবে। যেন বাকল তোলা পুরো জায়গায় ঠিকমত মাটির পেস্ট টি বসে যায়।

৬। মাটির পেস্ট টি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর, ২০ সেমি লম্বা পলিথিন দিয়ে মাটির বলটি ঢেকে দিয়ে দু'দিকে উপরে এবং নিচে সুতলি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৭। কলম করা ডাল অর্থাৎ গুটির মধ্যে শিকড় আস্তে সময় লাগে ২.৫-৩ মাস।

৮। প্রথমে সাদা রঙের শিকড় দেখা যাবে। শিকড় এর রং যখন খয়েরী বা তামাটে হবে তখন গুটি সহ ডালটি গাছ থেকে কেটে নিতে হবে।

৯। গুটির পলিথিন সরিয়ে নিয়ে ডালটি ছায়া জায়গায় পলিথিন ব্যাগ অথবা টবে ৪-৫ সপ্তাহ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

১০। কলম করা ডালটি ৪-৫ সপ্তাহ সংরক্ষণ করে রাখার পরে লাগানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে।

গুটি কলমের সুবিধা

ক) এটি অন্যান্য কলম প্রক্রিয়ার চেয়ে তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি এবং খুব একটা দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

খ) অল্প সময়ে বহু সংখ্যক গাছের চারা উৎপাদন করা যায়।

গ) কলম করা চারায় বীজ পদ্ধতির চেয়ে স্বল্প সময়ে ফল ধারণ করে।

ঘ) যে সমস্ত প্রজাতি কাটিং এ সহজে শিকড় গজায় না তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী।

ঙ) কলম করা চারা পোকামাকড় ও মাটিবাহিত রোগ সহনশীল হয়ে থাকে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবিধা। কলম করা চারাটি ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, নেমাটোড, নডিউল, টোবাক্যো মোজাইক ভাইরাস ইত্যাদি সহনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চ) নতুন চারাটির মাতৃ উদ্ভিদের চেয়ে বেশি জীনগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে।

ছ) নতুন চারাটি লবণাক্ততা, আর্দ্রতা সহনশীল হয়ে থাকে।

গুটি কলমের অসুবিধা

ক) বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধতি কাটিং অপেক্ষা ব্যয়বহুল।

খ) এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিকসংখ্যক মাতৃ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়।

গ) সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করলে চারাটি আশানুরূপ হয় না।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ করতে সক্ষম।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়
গ্রীষ্মকালীন ফল চাষ
(Cultivation of Summer fruits)

ফল রসিকরা গ্রীষ্মকাল বিশেষকরে জ্যৈষ্ঠ মাসকে 'মধুমাস' নামে অভিহিত করে থাকেন। এ দেশে উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬০ শতাংশ উৎপাদন হয় বৈশাখ থেকে শ্রাবণের মধ্যে অর্থাৎ চার মাসে। বাকি ৪০ শতাংশ ফল উৎপাদিত হয় বাকি আট মাসে। এজন্য গ্রীষ্ম মৌসুমকে বলা হয় ফলের মাস।বাংলাদেশ উষ্ণপ্রধান দেশ। এ দেশে তাপমাত্রা সাধরণত ১০ থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে থাকে। বছরব্যাপী কম বেশি বৃষ্টিপাত হয়, গ্রীষ্মের পর থেকে বৃষ্টি শুরু হয় যা, পুরো বর্ষাকালজুড়ে বজায় থাকে। এ দেশের মাটি উর্বর। তাই অনেক ধরনের ফল এ দেশে জন্মে। গ্রীষ্মকালে এ দেশে বেশিরভাগ ফল উৎপাদিত হয় এবং প্রায় সব ফলই মিষ্টি, সুঘ্রাণযুক্ত ও সুদর্শন হয়। গ্রীষ্মকালে এ দেশে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, নারিকেল, সফেদা, তালশাঁস, কামরাঙা, ড্রাগন ফল, ডেউয়া, জাম, জামরুল, গাব, আতা, শরিফা ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস চাষাবাদ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে

১. গ্রীষ্মকালীন ফলসমূহের নাম ও পরিচিতি বলতে পারবে
২. আম, কাঁঠাল, লিচু ও আনারসের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবে
৩. উপরোক্ত ফলগুলোর জলবায়ু, মাটি, বিভিন্ন জাত এবং চাষাবাদের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে
৪. স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনীয় জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, চারা উৎপাদন, রোপন ও আন্ত: পরিচর্যার বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করতে পারবে
৫. ফলের পরিপক্কতার লক্ষণ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি বর্ণনা করতে পারবে

৩.১ আমের চাষ (Cultivation of Mango)

ইংরেজী নাম: Mango

বৈজ্ঞানিক নাম: *Mangifera indica*

গোত্র: Anacardiaceae

ভারত উপমহাদেশে ফল সমূহের মধ্যে উৎপাদন ও জনপ্রিয়তাই আমের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। এজন্য আমকে ফলের রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে আম উৎপাদনে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। আম বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় ফল। এর সাথে অন্য কোন ফলের তুলনা হয় না কারন উৎকৃষ্ট জাতের আম স্বাদে গন্ধে ও দেখতে খুবই আকর্ষনীয়। আম এমন একটি ফল যা ছোট থেকে শুরু করে পাকা পর্যন্ত সর্ব অবস্থায় খাওয়া যায়। এই ফলটি দেশে বিদেশে সবার নিকট সমানভাবে সমাদৃত।

৩.১.১ আমের খাদ্যমান

আমাদের খাদ্যের প্রয়োজনীয় খনিজ লবন এবং ভিটামিনের উৎস বিভিন্ন রকম ফল। আম খাদ্য মানে উন্নত। কাঁচা আমে প্রচুর ভিটামিন-সি রয়েছে। পাকা আমে প্রচুর পরিমানে ক্যারোটিন বা ভিটামিন-এ রয়েছে। ভিটামিন-এ এবং সি ছাড়াও আমে প্রচুর পরিমানে লৌহ এবং ক্যালসিয়াম রয়েছে। বেশী করে উন্নত জাতের আমের গাছ লাগানোর সাথে সাথে উন্নত পরিচর্যার মাধ্যমে আমের উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আমাদের রয়েছে।

৩.১.২ আমের ঔষধি গুণ

আম একটি ফল হলেও এর অনেক ঔষধি গুন রয়েছে। আয়ুর্বেদীয় ও ইউনানী পদ্ধতির চিকিৎসায় পাকা আমকে ল্যাকজেটিভ এবং বলকারক খাদ্যরূপে অভিহিত করা হয়। কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকার আমে ভিটামিন - 'এ' থাকায় চোখের জন্য বেশ উপকারী। আম খেলে যকৃত ভাল থাকে। আম পাতা পোড়া ছাই আগুনে পোড়া ক্ষতে প্রয়োগ করলে তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। আম গাছের বাকলের রস বা কচি পাতার রস সাধারন আমাশয় বা রক্ত আমাশয়ে বেশ উপকারী। আম বীজের শাঁসের ক্বাথ আদার সহকারে সেবন করলে উদরাময়ে আরাম হয়।

৩.১.৩ জলবায়ু ও মাটি

বাংলাদেশের জলবায়ূ ও মাটি আম উৎপাদনের জন্য বেশ উপযোগী। আম গাছ প্রায় সব ধরনের মাটিতেই জন্মে। তবে মাটি গভীর হতে হবে। সাধারনত ২-৬ মিটার গভীরতা যুক্ত মাটিতে আম চাষ করা ভালো। মাটি কিছুটা অম্লীয় হতে হবে। জমি উচু ও সুনিষ্কাশিত হতে হবে। জমিতে যেন জল জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমের জন্য মাটির অম্লতা ৫.৫-৭.০ সর্বোত্তম। তাপমাত্রা ১০° সে থেকে ৪২° সে এর মধ্যে আম জন্মানো যায় তবে ২৫° সে তাপমাত্রা গাছের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উত্তম।

৩.১.৪ আমের চারা/কলম তৈরী

আমের চারা সাধারণত দুই ভাবে উৎপাদন করা যেতে পারে। প্রথমত আঁটি বা বীজ থেকে এবং দ্বিতীয়ত কলমের মাধ্যমে। বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে যে ফল ধরে তা সাইজে ছোট ও নিম্মমানের হয়ে থাকে। বীজের

গাছে ফল ধরতেও বেশী সময় লাগে এবং গাছের আকার-আকৃতিও তুলনামুলকভাবে বড় হয়। তাছাড়া ফলের মধ্যে মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। অপরদিকে কলমের গাছে ফল ধরতে কম সময় লাগে, ফলের সাইজ বড়, গুণগতমান ভালো হয় এবং মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে। এছাড়া গাছও ছোট হয়, ফলে অল্প জমিতে বেশী গাছ লাগিয়ে উৎপাদন আয় বাড়ানো যায়।

৩.১.৫ আমের আঁটির মাধ্যমে চারা তৈরী

আমের আঁটি ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে অংকুরোদগম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাই রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত পাকা আম থেকে আঁটি সংগ্রহ করে সাত দিনের মধ্যে প্রথম বীজতলায় ঘন করে বিছিয়ে ৫ সে.মি. মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজ তলায় যেন প্রয়োজনীয় রস থাকে এবং কখনও পানি না দাঁড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেসব আঁটি পানিতে ডুবে যায় শুধুমাত্র সে সব আঁটি চারা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। অংকুরোদগমের পরপরই চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করতে হবে।

চিত্রঃ আমের আঁটির মাধ্যমে চারা তৈরী

কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি

আদিজোড় বা স্টক গাছ মওজুদ রেখে তার উপর যে জাতের গাছ তৈরী করতে হবে তার উপজোড় বা সায়ন উভয়ের কতর্নকৃত অংশের মাধ্যমে জোড়া লাগিয়ে নতুন গাছ তৈরীর নাম কলম।

কয়েক প্রকারের কলমের মাধ্যমে আমের চারা তৈরি যায়। যেমনঃ

১। জোড় কলম
২। ভিনিয়ার কলম
৩। কেলফট বা ফাটল কলম
৪। স্টোন বা আঁটি কলম

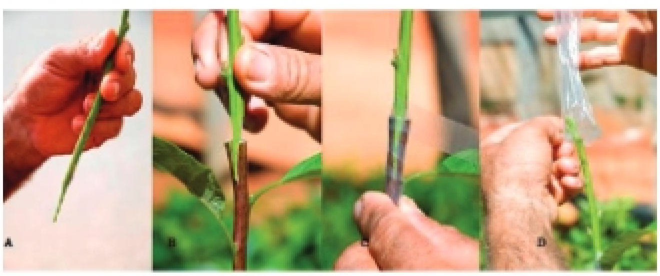

চিত্রঃ কলমের মাধ্যমে আমের চারা তৈরি

৩.১.৬ জমি তৈরি

জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। জমি সমতল হতে হবে। আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। জমিতে যদি পুরনো গাছের গোড়া, ইট, পাথর বা অন্য কোন জঞ্জাল থাকে তাহলে সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি খুব ভালোভাবে চাষ করে নিতে হবে তাহলে গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে তা সাহায্য করে এবং গাছ মাটি থেকে সহজেই পুষ্টি শোষন করতে পারে।

৩.১.৭ চারা রোপন প্রণালী

চারা রোপন করার জন্য জমি সমতল করতে হবে। এই সমতল জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে, আয়তাকার পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। যদি পাহাড়ি জমিতে চাষ করা হয় তাহলে কন্টুর পদ্ধতিতে চাষ করতে হবে। চারা রোপন করার জন্য সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা বাছাই করতে হবে।

৩.১.৮ রোপনের সময়

চারা রোপনের উপযুক্ত সময় হলো জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আষাঢ় মাসে এবং ভাদ্র মাস থেকে আশ্বিন মাসে। তবে জল সেচ দেয়ার সুবিধা থাকলে বছরের যে কোন সময় চারা রোপন করা যায়। শীতকালে চারা রোপন না করাই ভালো।

৩.১.৯ রোপন দূরত্ব

গাছ সাধারনত ১২ মিটার দূরত্বে লাগানো উচিত। তবে ১০ মিটার দূরত্বে ও লাগানো যায়। গাছ যদি একটু খাটো প্রকৃতির হয় তাহলে ৬-৮ মিটার দূরত্বে ও লাগানো যায়। জাত ভেদে বিভিন্ন গাছের রোপন দূরত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে।

৩.১.১০ গর্ত তৈরি

চারা রোপন করার আগে গর্ত তৈরি করে নিতে হবে। গর্ত তৈরি করার জন্য চারার জাত, জমির আকৃতি এসব খেয়াল করতে হবে। গর্ত সাধারনত ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি করতে হবে। গর্ত করার ১০-১৫ দিন পর এতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গর্তের জন্য গোবর সার ১০ কেজি, টিএসপি ৫০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, জিপসাম ২৫০ গ্রাম দিয়ে মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর গর্ত ভরাট করে দিতে হবে।

৩.১.১১ চারা রোপন

গর্ত তৈরি করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপন করার সময় খেয়াল রাখতে হবে চারার গোড়া যেন সোজা থাকে। চারা যেন বেশি পরিমান গর্তে না ঢুকে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারার গোড়া যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। রোপন করার পর খুটি বেধে দিতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি দিয়ে কিছুটা উচু করে দিতে হবে। প্রয়োজনে জল সেচ দিতে হবে।

৩.১.১২ সার প্রয়োগ

ভালো ফলন পেতে হলে গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছে বছরে ৫০ কেজি জৈব সার, ২ কেজি ইউরিয়া, ১ কেজি টিএসপি, ৫০০ গ্রাম এমওপি, ৫০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। সবগুলো সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে আষাঢ় মাসের দিকে। দ্বিতীয় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে ভাদ্র থেকে আশ্বিন মাসের দিকে।

৩.১.১৩ আগাছা দমন

গাছের গোড়ায় যেন আগাছা না জমে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। জমি ভালোভাবে চাষ দিতে হবে যেন আগাছা না জন্মায়। তবে ভালোভবে চাষ দিলে আরো উপকার হয় কারন আগাছাগুলো পচে জৈব সারে পরিণত হয়। আমগাছে এক ধরনের পরগাছা উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এরা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। গাছকে দুর্বল করে দেয়। এসব থেকে গাছকে রক্ষা করতে হবে।

৩.১.১৪ সেচ ব্যবস্থা

গাছে মুকুল ধরার ৩-৪ মাস আগে থেকে গাছে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। তবে মুকুল ধরার পরে এবং ফল মটর দানার মতো থাকে অবস্থায় একবার সেচ দিতে হবে। বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে ভালো।

৩.১.১৫ ডাল ছাটাই

গাছের কান্ডটি যেন সোজা ভাবে উঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাই অপ্রয়োজনীয় ডাল পাতা ছেটে দিতে হবে।

৩.১.১৬ গাছের মুকুল ভাঙ্গন

কলম থেকে যে গাছে তৈরি হয় তাতে ৪ বছর বয়স হবার আগ পর্যন্ত মুকুল আসলে ভেঙ্গে দিতে হবে। বেশি পরিমান ফলের আকৃতি নষ্ট করে।

৩.১.১৭ সাথী ফসলের চাষ

আমবাগানের ফাঁকা অংশে বা আমগাছের নিচে সাথী ফসলের চাষ করে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। আমবাগানে বেশী ফাঁকা জায়গা থাকলে পেয়ারা, পেঁপে ও আনারসের চাষ করা যায় আবার আমগাছের ছায়ায় আদা হলুদের চাষ করা সম্ভব। আম বাগানের যেখানে কিছু সময়ের জন্য হলেও রোদের আলো পড়ে সেখানে সাথী ফসলের আবাদ ভাল হয়। আমবাগানে ডাল জাতীয় ফসল (যেমন মাসকলাই) চাষ করলে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে।

৩.১.১৮ রোগ ও পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

হপার বা শোষক পোকা: যে সমস্ত পোকা আমের সব চাইতে বেশী ক্ষতি করে থাকে হপার বা শোষক পোকা তাদের মধ্যে অন্যতম। এ পোকা বাংলাদেশের সর্বত্র এবং সব জাতে আক্রমন করে থাকে। সারা বছর আমগাছে এই পোকাগুলি দেখা যায়। আম গাছে কচি পাতা বা মুকুল বের হওয়ার সাথে সাথে এগুলি সক্রিয় হয়ে উঠে।

চিত্রঃ হপার বা শোষক পোকার আক্রমন

দমন পদ্ধতি

১। বাগান পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে। গাছের ডালপালা ছাটাই করতে হবে যাতে গাছের মধ্যে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে।

২। অমের মুকুল যখন ৮/১০ সেন্টিমিটার হয় তখন একবার এবং আম যখন মটর দানার মত হলে আর একবার প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকডর/সিমবুস/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ইসি মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ স্প্রে করতে হবে।

৩। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড বা ঝুল রোগের আক্রমন ঘটে তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে থিওভিট ব্যবহার্য কীটনাশকের সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মাছি পোকা

মাছি পোকা পাকা আমের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এ পোকা কাচা আমের জন্য তেমন ক্ষতিকারক নয়। ফজলী, ল্যাংড়া, খিরসাপাতসহ গুটিজাতীয় বিভিন্ন জাতের পাকা আমে এ পোকাটির আক্রমন হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থা

১। আম গাছে না পাকিয়ে কাঁচা অথচ পরিপক্ক আম বাড়ীতে এনে পাকালে এ পোকার আক্রমন কমানো যাবে।

২। ফেরোমন ফাঁদ ব্যাবহার বাগানের মাছিপোকা দমন করা যায়।

৩। আম পাকার মৌসুমে প্রতিটি আম কাগজ (ব্রাউন পেপার) দ্বরা মুড়িয়ে দিলে আমকে পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করা যাবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

আম ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন ১৯৯৬ সালে নবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলায় প্রথম লক্ষ্য করা হয়। বর্তমানে আম চাষীদের নিকট এ পোকা একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

দমন ব্যবস্থা

১। আক্রান্ত আম সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

২। আক্রমন দেখা দেওয়া মাত্র সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে।

আমের রোগ ও তার প্রতিকার

এনথ্রাকনোজ

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে আম উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রোগ এনথ্রাকনোজ। রোগের জীবানু কচি পাতা, নতুন কুঁড়ি, ছোট আম ও মুকুলে আক্রমন করে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করতে পারে। খিরসাপাত, গোপালভোগ ইত্যাদি জাতে এ রোগের আক্রমন বেশী দেখা যায় অপরদিকে ফজলী, ল্যাংড়া, বারি আম -১, ২ ইত্যাদি জাতে রোগের আক্রমন কম হয়ে থাকে।

প্রতিকার

১। প্রতি বছর রোগাক্রান্ত ও মরা ডালপালা ছাটাই করে পুড়ে ফেলতে হবে।

২। গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও ঝরে পড়া আম সংগহ্র করে পুড়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।

৩। মুকুলে রোগের আক্রমন প্রতিহত করতে হলে ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

চিত্রঃ আমের এন্থ্রাকনোজ

পাউডারী মিলডিউ

পাউডারী মিলডিউ একটি মারাত্বক রোগ। কোন বছর অনুকুল আবহাওয়া বিরাজ করলে রোগটি মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি করে থাকে। এ রোগের জীবানু আমের মুকুলে আক্রমন করে। আক্রান্ত মুকুল সম্পূর্নরুপে নষ্ট হয়ে ফলধারন মারাত্মকভাবে ব্যহত হতে পারে।

প্রতিকার

১। মুকুলে রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

২। আম বাগান পরিস্কার পরিছন্ন ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

চিত্রঃ আমের পাউডারী মিলডিউ

৩.১.১৯ ফসল সংগ্রহ

ফল ধরার ৩-৫ মাসের মধ্যেই জাত ভেদে ফল পাকতে শুরু করে। সাধারণত আমের সবুজ রং পরিবর্তন হয়ে হাল্কা হলুদ বা কমলা হলুদ হলে ফল পাকা শুরু হয়। ফল পাকা শুরু হলেই বাশের কোটায় থলে সদৃশ জালি লাগিয়ে আম পাড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ফলে যেন কোন ভাবেই আঘাত না লাগে। ফল কখনোই পুরোপুরি পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। অল্প পাকা শুরু হলেই গাছ থেকে ফল পাড়তে হবে।

৩.১.২০ ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা ও সঠিক উপায়ে চাষ করতে পারলে জাত ভেদে একর প্রতি ২০০-২২০ মন আম পাওয়া যেতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

১। আমের জন্য মাটি কিছুটা অম্লীয় হতে হবে এবং পিএইচ মান ৫.৫-৭.০ সর্বোত্তম।

২। জমি উচু ও সুনিষ্কাশিত হতে হবে। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৩। আমের কলমের গাছে ফল ধরতে কম সময় লাগে, ফলের সাইজ বড়, গুণগতমান ভালো হয় এবং মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে।

৪। আম কখনোই পুরোপুরি পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। অল্প পাকা শুরু হলেই গাছ থেকে আম পাড়তে হবে।

৩.২ কাঁঠালের চাষ (Cultivation of Jackfruit)

ইংরেজী নাম: Jackfruit

বৈজ্ঞানিক নাম: *Artocarpus*

গোত্র: Moraceae

২০২৪

এটি এক প্রকারের হলুদ রঙের সুমিষ্ট গ্রীষ্মকালীন ফল। গ্রামাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। কাঁচা কাঁঠালকে বলা হয় এঁচোড়। কাঁঠাল গাছের কাঠ আসবাবপত্র তৈরীর জন্য সমাদৃত। কাঁঠাল পাতা বিভিন্ন প্রাণীর পছন্দের খাদ্য। তুলনামূলকভাবে বিশালাকার এই ফলের বহির্ভাগ পুরু এবং কন্টকাকীর্ণ, অন্যদিকে অন্তরভাগে একটি কান্ড ঘিরে থাকে অসংখ্য রসালো কোয়া। কাঁঠালের বৃহদাকার বীজ কোয়ার অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত।

৩.২.১ কাঁঠালের জাত

কাঁঠালের বেশ কিছু জাত রয়েছে। চাষযোগ্য জাতসমূহ মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। গালা ও খাজা - এ দুটি জাত ছাড়াও কাঁঠালের আরো জাত আছে। গালা ও খাজা কাঁঠালের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে রয়েছে 'রসখাজা'।

১.গালা বা গলা

যখন কাঁঠাল ভালভাবে পাকে তখন এর অভ্যন্তরে রক্ষিত কোষ বা কোয়া অত্যন্ত কোমল, মিষ্টি ও রসালো প্রকৃতির হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো রসের স্বাদ টক-মিষ্টিও হয়ে থাকে। কোষ অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। খোসার গায়ে কাঁটাগুলো খুব একটা চ্যাপ্টা হয় না। পাকার পর একটু লালচে-হলুদাভ হয়। কোষগুলোকে সহজেই আলাদা করা যায়।

চিত্রঃ গালা কাঁঠাল

২.খাজা

কোষ আকারে বড় হয়, পাকার পর কম রসালো ও অপেক্ষাকৃত শক্ত বা কচকচে হয়। কোষ চিপলেও সহজে রস বের হয় না। রং ফ্যাকাশে হলুদ ও স্বাদ মোটামুটি মিষ্টি হয়। সহজে হজম হয় না বলে অনেকেই এ জাতের কাঁঠাল পছন্দ করেন না। খোসার রঙ পাকার পরও সবুজাভ থাকে এবং গায়ের কাঁটাগুলো মোটামুটি চ্যাপ্টা, বড় ও মসৃণ প্রকৃতির হয়।

চিত্রঃ খাজা কাঁঠাল

৩.২.২ কাঁঠালের পুষ্টিগুণ

কাঁঠাল পুষ্টি সমৃদ্ধ। এতে আছে থায়ামিন, রিবোফ্লাভিন, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং নায়াসিনসহ বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদান। অন্যদিকে কাঁঠালে প্রচুর পরিমাণে আমিষ, শর্করা ও ভিটামিন থাকায় তা মানব দেহের জন্য বিশেষ উপকারী।

উপকারিতা

১.কাঁঠালে চর্বির পরিমাণ নিতান্ত কম। এই ফল খাওয়ার কারণে ওজন বৃদ্ধির আশঙ্কা কম।

২.কাঁঠাল পটাশিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। ১০০ গ্রাম কাঁঠালে পটাশিয়ামের পরিমাণ ৩০৩ মিলিগ্রাম। পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এ জন্যে কাঁঠালে উচ্চরক্তচাপের উপশম হয়।

৩. কাঁঠালে প্রচুর ভিটামিন এ আছে যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৪. কাঁঠালের অন্যতম উপযোগিতা হল ভিটামিন সি। প্রাকৃতিকভাবে মানবদেহে ভিটামিন “সি” তৈরি হয় না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দাঁতের মাড়িকে শক্তিশালী করে ভিটামিন “সি” ।

৫.কাঁঠালে আছে শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদেরকে সর্দি-কাশি রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৬. টেনশন এবং নার্ভাসনেস কমাতে কাঁঠাল বেশ কার্যকরী।

৭.বদহজম রোধ করে কাঁঠাল।

৩.২.৩ মাটি ও জলবায়ু

পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি সুনিষ্কাষিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী।সাধারতঃ দোআশ ও পলি মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য উপযোগী। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কাঁঠাল চাষের জন্য উত্তম।

৩.২.৪ চারা প্রস্তুতকরণ

সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠালের চারা তৈরি করা হয়। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপন করলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে। ২-৩ মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।এছাড়া গুটি কলম, ডাল কলম, চোখ কলম, চারা কলম এর মাধ্যমেও চারা তৈরি করা যায়।

৩.২.৫ রোপনের সময়

ষড়ভূজী পদ্ধতিতে সুস্থ্য, সবল ও রোগমুক্ত চারা বা কলম মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ মাসে রোপণ করতে হয়।

৩.২.৬ রোপন পদ্ধতি

গাছ ও লাইনের দূরত্ব ১২ মিটার করে রাখা দরকার। রোপণের সময় প্রতি গর্তে গোবর ৩৫ কেজি, টিএসপি সার ২১০ গ্রাম, এমওপি সার ২১০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতি গাছের জন্য সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার।

৩.২.৭ সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা

চারা/ কলমের তাড়াতাড়ি বাড়বাড়তি হওয়ার জন্য পরিমিত ও সময় মতো সেচ প্রদান ও আগাছা দমন করা দরকার।

৩.২.৮ রোগ ও পোকা মাকড় ব্যবস্থাপনা

কাঁঠাল পচা রোগ: এক ধরণের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদমি রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত ফল গাছ থেকে ঝড়ে পড়ে।

প্রতিকার: গাছের নিচে ঝড়ে পড়া পাতা ও ফল পুড়ে ফেলতে হয়। ফলিকুর ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর থেকে ১৫ দিন পর পর ৩ বার সেপ্র করা দরকার।

চিত্রঃ কাঁঠালের ফল পচা রোগ

মুচিঝরা রোগ: ছত্রাকের আক্রমণের কারনে ছোট অবস্থাতেই কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে।
প্রতিকার: ডাইথেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল এম জেড ৭৫, প্রতিলিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম করে মিশিয়ে সেপ্র করতে হবে।

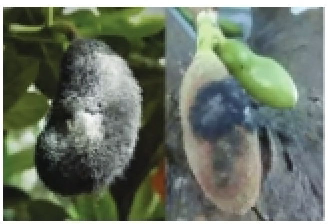

চিত্রঃ কাঁঠালের মুচিঝরা রোগ

৩.২.৯ ফলন সংগ্রহ

ফল পাকতে ১২০-১৫০ দিন সময় লাগে। সাধারণত জ্যৈষ্ঠ- আষাঢ় মাসে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়। কাঁঠাল পাকলে এর গায়ের রং উজ্জ্বল হলুদ হয়ে যায়। কিন্তু কালচে বা বাদামি রং হয় না। কাঁঠাল এর গায়ের রং উজ্জ্বল হলুদ হলেই গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

পাঠ সংক্ষেপ

১। দোআশ ও পলি মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য উপযোগী।

২। পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারি সুনিষ্কাষিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী।

৩। সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকে কাঁঠালের চারা তৈরি করা হয়।

৪। সুস্থ্য, সবল ও রোগমুক্ত কাঁঠালের চারা মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ মাসে রোপণ করতে হয়। ২০২৪

৩.৩ লিচুর চাষ (Cultivation of Litchi)

ইংরেজী নাম: Litchi
বৈজ্ঞানিক নাম: *Litchi chinensis*
গোত্র: Sapindaceae

বাংলাদেশে লিচু একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর ফল। যদিও এ দেশে এটি অতি সহজেই জন্মানো যায়, তথাপি এখানে এর চাষ তেমন ব্যাপকতা লাভ করেনি। এ দেশের সব জেলাতেই লিচুর চাষ করা যায় কিন্তু বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। রূপে, গুণে ও স্বাদে এটি একটি উপাদেয় ফল বিধায় অনেকে বিশ্বের সবচেয়ে লোভনীয় ও সুস্বাদু ফল বলে মনে করেন। এতে ঔষধি গুণ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ, শর্করা জাতীয় পদার্থ ও ভিটামিন 'সি' রয়েছে। বাজারে অল্প সময়ের জন্য থাকলেও সবার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফল হিসেবে পরিচিত। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে এ ফল চাষের সম্ভাবনা রয়েছে।

৩.৩.১ জলবায়ু

লিচু একটি অবউষ্ণ জলবায়ুর ফল। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে গাছ ভালোভাবে বাড়লেও ফুল ধারণের জন্য মৃদু ঠান্ডার আবেশ দরকার। অউষ্ণমন্ডলের যেখানে শীতকালে ঠান্ডা অথচ তুষারপাত হয় না এবং গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিরাজমান সেখানে লিচু ভালো হয়। শীতকালে তুষারপাত ও গ্রীষ্মকালে উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া লিচু চাষের প্রধান অন্তরায়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫০ সেমি. ও বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৮৫% লিচু চাষের জন্য উপযোগী। গাছে ফুল আসার সময় বৃষ্টিপাত হলে পরাগায়ন ব্যাহত হয়। গ্রীষ্মকালে পর্যায়ক্রমে শুষ্ক আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত হলে ফল ফেটে যায় ও ঝরে পড়ে। পাকার সময় আবহাওয়া শুষ্ক হলেও ফল ফেটে যায়।

৩.৩.২ মাটি

সব মাটিতে লিচু ভালো হয়। তবে প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ নিষ্কাশিত গভীর উর্বর দো-আঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য সর্বোত্তম। যদিও জলাবদ্ধতা এর জন্য ক্ষতিকর কিন্তু লিচু স্যাঁতসেঁতে মাটি পছন্দ করে। সাধারণত মাটির পিএইচমান ৬.৫-৬.৮ হলে লিচু চাষ উপযোগী হয়। তবে বেলেমাটি লিচু চাষের অনুপযুক্ত।

৩.৩.৩ জমি তৈরি

লিচু চাষের জন্য নির্বাচিত জমি ভালো করে লাঙল, পাওয়ারটিলার, কিংবা ট্রাক্টর যে কোনোটির দ্বারা চাষ ও পরে মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছা মুক্ত করে নিতে হবে। জমি থেকে ইট, পাথর, অন্য কোনো গাছের গোড়া ইত্যাদি যদি থাকে তবে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। জমি চাষের ফলে মাটিতে প্রচুর বায়ু চলাচল হয়। ফলে মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি গাছের জন্য সহজলভ্য হয়। তাছাড়া শিকড় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

৩.৩.৪ রোপণ প্রণালী

রোপণ প্রণালী হলো রোপিত চারার পারস্পরিক অবস্থান। প্রতি হেক্টর জমিতে কি পরিমাণ লিচুর চারা লাগানো সম্ভব তা নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব, জমির আকৃতি ও রোপণ প্রণালীর ওপর। সমতল ভূমিতে বর্গাকার প্রণালীতে এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর প্রণালীতে লিচু গাছের চারা লাগানো হয়।

৩.৩.৫ বাগানের নকশা

লিচু বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পরিকল্পনাটিকে যখন বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য কাগজে অঙ্কন করা হয় তখন তাকে বাগানের নকশা বলা হয়। নকশা অনুযায়ী গাছের চারা লাগালে প্রত্যেকটি চারা অপরটির থেকে দূরত্ব বজায় রেখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও স্বাভাবিকভাবে ফল ধারণ করে। তাছাড়া বাগান রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম পড়ে এবং সেচ ব্যবস্থা সুন্দর হয়। কম জায়গায় সর্বোচ্চসংখ্যক চারা লাগানো যায়। বাগানের ভেতরে সাথী ফসলেরও চাষ করা সহজ হয়।

৩.৩.৬ জাত নির্বাচন

বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে চাষকৃত লিচু জাতের মধ্যে বেদানা, বোম্বাই, চায়না-৩, রাজশাহী, মাদ্রাজি, মংগলবাড়ী, মোজাফফরপুরী, বারি লিচু-১ ও ৩ উল্লেখযোগ্য।

৩.৩.৭ বংশবিস্তার

লিচুর বংশ বিস্তার দু'ভাবে করা যায়। সরাসরি বীজ থেকে এবং কলমের মাধ্যমে। বীজ থেকে চারা তৈরি করলে ফল ধরতে ৮-১০ বছর লেগে যায়। তাছাড়া জাতের গুণাগুণ লোপ পায়। লিচুর জন্য গুটি কলম বেশি উপযোগী। এতে মাতৃ গুণাগুণ বজায় থাকে। কাজেই এক বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করে লাগাতে হবে। লিচু ফলের মওসুম শেষেই শুরু হয়ে যায় ফলগাছ রোপণ মওসুম। বর্ষার পর যখন মাটিতে রসের আধিক্য কমতে থাকে তখনই লিচুর কলম রোপণ করতে হয়। আসলে লিচুর গুটি কলম অন্যান্য ফলগাছের গুটি কলমের মতো নয় বলেই মাটিতে বেশি রস থাকলে রোপণ করা উচিত নয়। তবে যেসব জায়গা উঁচু, মাটি বেলে দো-আঁশ ধরনের, যে মাটিতে পানি দীর্ঘক্ষণ জমে থাকে না এবং সারা দিন রোদ পড়ে সেসব জায়গাই লিচুর কলম রোপণের জন্য উপযুক্ত।

৩.৩.৮ চারা রোপণের দূরত্ব

ঘন করে লিচুর চারা লাগানো হলে সেসব গাছে সূর্যের আলো পায় না। ফলে গাছে খাদ্য প্রস্তুত ভালোভাবে হয় না। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া রোগ-পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গাছের জন্য অনুমোদিত দূরত্ব অনুরসণ করলে উপরিউক্ত সমস্যা থাকে না। লিচুগাছ সাধারণত ১০-১২ মিটার (অর্থাৎ ৩০-৪০ ফুট) দূরত্বে লাগানো হয়।

৩.৩.৯ চারা রোপণের সময়

বর্ষাকাল চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় অর্থাৎ জুন-জুলাই মাস। তবে চারা জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লাগানো চলে। প্রখর রোদ ও প্রচন্ড বাতাসে চারা লাগানো যাবে না। বিকেলে চারা লাগানো উত্তম।

৩.৩.১০ গর্ত তৈরি

বর্ষার আগেই নির্ধারিত জায়গায় গর্ত করতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য ১ মিটার, প্রস্থ ১ মিটার ও গভীরতা ১ মিটার রাখতে হবে। গর্ত তৈরির সময় গর্তের ওপরের মাটি এক পাশে ও নিচের অংশের মাটি অন্য এক পাশে রেখে ১০-১৫ দিন পর্যন্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। ফলে মাটিতে কীট বা রোগের জীবাণু থাকলে রোদে তা মারা যাবে। গর্তের ওপরের অংশের মাটির সাথে ২০-২৫ কেজি গোবর সার, কিছুটা পুরনো লিচু বাগানের মাটি, টিএসপি ৬০০-৭০০ গ্রাম, এমপি ৩৫০-৪৫০ গ্রাম, জিপসাম ২০০ -৩০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ৪০-৬০ গ্রাম মিশিয়ে দিতে হবে এবং ওপরের এই সার মিশ্রিত মাটি গর্তের নিচে এবং গর্তের নিজের মাটি গর্তের ওপরে দিয়ে পুরো গর্তটি ভরাট করতে হবে। প্রতি বছর সারের পরিমাণ কছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে। গাছের বয়স ১০-১৫ বছর হলে সারের মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে।

৩.৩.১১ চারা রোপণ পদ্ধতি

গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর চারাটি ঠিক গর্তের মাঝখানে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর খুঁটি এবং প্রয়োজনে খাঁচা দিয়ে চারাকে রক্ষা করতে হবে। চারা লাগানোর পর পরই চারার গোড়ায় পানিসেচ দিতে হবে।

৩.৩.১২ সারের পরিমাণ

লিচু গাছে বয়স অনুসারে সারের ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে বয়স অনুসারে সারের পরিমান দেয়া হলোঃ

গাছের বয়স	জৈবসার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩ বছর	১০-২০	৫০০	৪০০	১৫০-২০০
৪-৬ বছর	২০-৩০	৬০০	৫০০	২৫০-৩০০
৭-১০ বছর	৩০-৪৫	৭৫০	৭০০	৫০০
১০ বছরের বেশি	৫০-৬০	১০০০	৭৫০	৬০০

গাছে যদি জিংকের অভাব দেখা দেয় অর্থাৎ পাতা যদি তামাটে রঙ ধারণ করে তবে প্রতি বছর ৫০০ লিটার পানির সাথে ২ কেজি চুন ও ৪ কেজি জিংক সালফেট গুলে বসন্তকালে গাছে ছিটাতে হবে।

৩.৩.১৩ গাছের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের প্রধান কান্ড যাতে ৩-৫ ফুট বাড়তে পারে সেইজন্য মাঝে মাঝে মরা ডাল ছাঁটাই করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হয় ।

৩.৩.১৪ আগাছা দমন

গাছের বৃদ্ধির জন্য জমিকে সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে । বর্ষার শুরু ও শেষে কোদাল কুপিয়ে আগাছা সাফ করে ফেলতে হবে ।

৩.৩.১৫ মুকুল ভাঙ্গন

প্রথম ৩ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা ভেঙে দিতে হবে, গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির দরুণ । গাছের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির জন্য ২ ফুট পর্যন্ত ডগাও ভেঙে দিতে হবে ।

৩.৩.১৬ সেচ প্রয়োগ

গাছের প্রধানত শীত ও গ্রীষ্মের দিনগুলোতে পানির প্রয়োজন হয় বেশি। চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হয় তবে ফলন্ত গাছের বেলায় পূর্ণ ফুল ফোটা অবস্থায় একবার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আর একবার সেচ দিতে হবে। ফল আসার পর সেচ না দিলে ফল পড়ে যায় ও ফল ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শীতকালে বিকেলের দিকে সেচ দিলে ঠান্ডায় গাছের ক্ষতি হয় না। গাছের গোড়ায় বেশি বা কম রস গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই পরিমাণ মতো পানি সেচের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩.৩.১৭ পোকামাকড়

লিচুর পোকামাকড়ের মধ্যে ফল ছিদ্রকারী পোকা ও লিচুর মাকড়ই বেশি ক্ষতি করে থাকে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা: ফল পরিপক্ব হওয়ার সময় এ পোকা ফলের বোঁটার কাছ দিয়ে ভেতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এরা ফলের শাঁস খায় না তবে বোঁটার কাছে বাদামি রঙের এক ধরনের করাতের গুঁড়ার মতো পদার্থ উৎপন্ন করে। এতে ফলের বাজার মূল্য কমে যায়। এ পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক যেমন- রিপকড ১০ ইসি, সিমবুশ ১০ ইসি, বাসাথ্রিন ১০ ইসি ইত্যাদি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর দুই থেকে তিনবার স্প্রে করতে হবে। তবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন আগে স্প্রে করার কাজ শেষ করতে হবে।

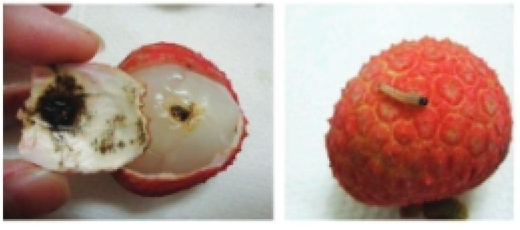

চিত্রঃ লিচুর ফল ছিদ্রকারী পোকা

লিচুর মাকড়: মাকড় লিচুগাছের পাতা, ফুল ও ফল আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতার নিচের দিক লাল মখমলের মতো হয়। পরে পাতা দুর্বল হয়ে মরে যায় এবং ডালে ফুল, ফল ও নতুন পাতা হয় না।

দমন ব্যবস্থা: ফল সংগ্রহের পর আক্রান্ত অংশ ভেঙে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এছাড়া ক্যালথেন ৪০ এমএফ অথবা নিউরন ৫০০ ইসি বা টর্ক ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে নতুন পাতায় ১৫ দিন পর পর দুই থেকে তিনবার স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই

লিচুর বেশ কয়েকটি রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিউ এবং অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগই প্রধান।

পাউডারী মিলডিউঃ লিচুর মুকুলে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুল নষ্ট হয় এবং ঝরে পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য গাছে মুকুল আসার পর সালফারজাতীয় কীটনাশক যেমন- থিউভিট ৮০ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্রঃ লিচুর পাউডারী মিলডিউ

অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ: এ রোগের আক্রমণে প্রথমে ফলের বোঁটার দিকে পানি ভেজা পচা দাগের সৃষ্টি হয়, যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেয়ে সব ফল পচিয়ে ফেলে এবং একসময় ফল শুকিয়ে ঝরে পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য লিচু বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিচের মরা পাতা, আক্রান্ত ফল ও আগাছা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফল গাছে থাকা অবস্থায় নিয়মিত ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্রঃ লিচুর অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ

২০১৪

ফল ঝরা: ফল ঝরা লিচুর একটি প্রধান সমস্যা। পরাগায়ন ও গর্ভধারণে ব্যর্থতা, পুষ্টির অভাব, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, মাটিতে রসের অভাব, বাতাসে কম আর্দ্রতা, ঝড়ো বাতাস, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ এবং বেশি গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্যও লিচু ঝরে যেতে পারে। লিচু ঝরা রোধে ফল মটর দানা এবং মার্বেল আকার হলে লেবেলে নির্দেশিত মাত্রা অনুযায়ী প্লেরা নামক হরমোন গাছে স্প্রে করতে হবে। গুটি বাঁধার সময় প্রতি লিটার পানির সঙ্গে ১ গ্রাম লিবরেল জিংক বা জিংক সালফেট মিশিয়ে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। সেইসাথে নিয়মিত সেচ ও রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্রঃ লিচুর ফল ঝরা সমস্যা

ফেটে যাওয়া: দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ বৃষ্টি, শুষ্ক ও গরম হাওয়া, রোগ-পোকার আক্রমণে ফল ফেটে যেতে পারে। এছাড়া মাটিতে বোরন বা ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দিলে এবং আগাম জাতে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার: মাটিতে জৈবসার ও নিয়মিত সেচ দিতে হবে। বর্ষার শুরুতে ও শেষে গাছের গোড়ায় ক্যালসিয়াম জাতীয় সার যেমন- ডলোচুন গাছপ্রতি ১০০ গ্রাম করে ব্যবহার করতে হবে অথবা ফলের কচি অবস্থায় চক পাউডার ২ গ্রাম ও বোরিক এসিড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। সেইসঙ্গে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

চিত্রঃ লিচুর ফেটে যাওয়া

বাদুড় দমন: বাদুড়ের আক্রমণের কারণেও লিচুর ফলন হ্রাস পেতে পারে। বাদুড় দমনের জন্য ফল পাকার সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ও সহজ উপায়গুলোর মধ্যে ঢোল-টিন পেটানো, বাঁশ ফোটানো, পটকা ফোটানো, বাগানের চারপাশে জাল পেতে রাখা, জাল দিয়ে ফল ঢেকে রাখা ইত্যাদি।

৩.৩.১৮ ফল সংগ্রহ

ফেব্রয়ারি-মার্চ মাসে লিচু গাছে ফুল আসে ও মে-জুন মাসে লিচুর পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়। এ সময় ফলের খোসা লালচে রঙ ধারণ করে ও কাঁটাগুলো চ্যাপটা হয়ে খোসা প্রায় মসৃণ হয়ে যায়। কিছু পাতাসহ গোছা ধরে লিচু সংগ্রহ করা হয়, এতে ফল বেশি দিন ধরে ঘরে রাখা যায়। বৃষ্টি হলে তার পর পরই কখনো লিচু সংগ্রহ করা ঠিক নয়।

৩.৩.১ ফলন

লিচু পুষ্ট হলে ফলের কাঁটা ছাড়বে ও রঙ উজ্জ্বল হবে। পুষ্ট ফল শাখা ও পাতাসহ পাড়া হয়। ২০-৩০ বছর বয়স পর্যন্ত লিচুগাছে ফলন বাড়তে থাকে। সাধারণত প্রতিটি গাছ থেকে বছরে ৮০-১৫০ কেজি বা ৩২০০-৬০০০টি লিচু পাওয়া যায়। অবস্থাভেদে এর তারতম্যও লক্ষ করা যায়।

পাঠ সংক্ষেপ

১। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ নিষ্কাশিত গভীর উর্বর দো-আঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য সর্বোত্তম।
২। সাধারণত মাটির পিএইচমান ৬.৫-৬.৮ হলে লিচু চাষ উপযোগী হয়। তবে বেলেমাটি লিচু চাষের অনুপযুক্ত।
৩। বর্ষাকাল অর্থাৎ জুন-জুলাই মাস লিচুর চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।
৪। ফলের খোসা লালচে রঙ ধারণ করলে ও কাঁটাগুলো চ্যাপটা হয়ে খোসা প্রায় মসৃণ হয়ে গেলে লিচু সংগ্রহ করতে হয়।

৩.৪ আনারসের চাষ (Cultaviton of Pineapple)

ইংরেজী নাম: **Pineapple**

বৈজ্ঞানিক নাম: ***Ananas comosus***

গোত্র: **Bromelliaceae**

আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে আনারসের আবাদকৃত জমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর এবং মোট দুই লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন হয়ে থাকে। আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও উন্নত জাতের আনারস চাষ করলে ফলন অনেক বেশি হয়। আনারস পাহাড়ি অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য বেশি উপযোগী। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, নরসিংদী জেলায় প্রচুর পরিমাণে আনারসের চাষ হয়। পুষ্টিমানের দিক দিয়েও আনারসের গুরুত্ব অপরিসীম। আনারস ভিটামিন 'এ', 'বি', ও 'সি' -এর উৎস। তাইতো ছন্দাকারে বলা যায় "আনারস মধুর ফল পুষ্টিগুণে ভরা, অর্থ দেয় লাভ দেয় দূর করে জরা।" বসতবাড়ির আশেপাশে খালি জায়গাতেও আনারস চাষ করে সহজেই পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়, সেই সঙ্গে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হওয়া যায়।

৩.৪.১ ব্যাবহারঃ

পাকা আনারসের অম্ল মধুর রসালো মিষ্টি গন্ধ হৃদয় ছুঁয়ে যায়, খাওয়ার প্রতি লোভ বাড়িয়ে দেয়। আনারস অবশ্যই দারুণ মনোহরি সুগন্ধি, উপাদেয় এবং সুস্বাদু ফল।

১। আনারসের জুস, স্লাইস, এসিড, স্কোয়াশ, সিরাপ, জ্যাম, জেলি, ভিনেগার, সাইট্রিক এসিড, ক্যালসিয়াম সাইট্রেট, অ্যালকোহল বিশ্বনন্দিত।

২। খুশখুশে কাশি জ্বরে আনারস মহৌষধ।

৩। আনারসের পাতা থেকে মোম ও সুতা তৈরি হয়।

৩.৪.২ পুষ্টি ও ভেষজ গুণ

১। পাকা ফল বলকারক, কফপিত্ত বর্ধক, পাচক ও ঘর্মকারক।

২। কাঁচাফল গর্ভপাতকারী। পাকা ফলের সদ্য রসে ব্রোমিলিন নামক জারক রস থাকে যা পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ক। ৩। কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে সেবন করলে ক্রিমির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৪। পুষ্টিমানের বিচারে আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ বি সি পাওয়া যায়। তাছাড়া ম্যাঙ্গানিজ, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস আছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। জ্বরে বিশেষ পথ্য ও ওষুধ হিসেবে কাজ করে।

৩.৪.৩ আনারসের জাত

আনারসের বেশ কয়েকটি জাত আছে। এর মধ্যে ঘোড়াশাল, হানিকুইন ও জায়ান্টকিউ অন্যতম।

৩.৪.৪ বংশবিস্তারঃ স্বাভাবিক অবস্থায় আনারসের বীজ হয় না। তাই বিভিন্ন ধরনের চারার মাধ্যমে আনারসের বংশবিস্তার হয়। সাধারণত পার্শ্ব চারা, বোঁটার চারা, মুকুট চারা ও গুঁড়ি চারা দিয়ে আনারসের বংশবিস্তার হয়। এর মধ্যে পার্শ্ব চারা বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য সবচেয়ে ভালো।

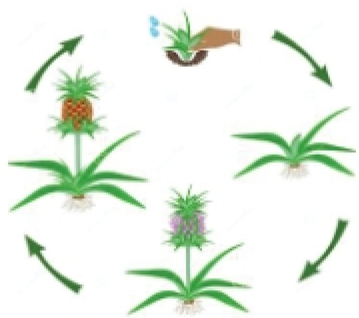

চিত্রঃ আনারসের বংশবিস্তার

৩.৪.৫ জমি ও মাটি

উঁচু জমি ও পানি দাঁড়ায় না দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি আনারস চাষের জন্য বেশ উপযোগী। মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি সমতল করতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি কোনো স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেন্টিমিটার উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অন্য বেডের মধ্যে ৫০-১০০ সেন্টিমিটার ফাঁক রাখতে হবে। পাহাড়ের ঢাল আনারস আবাদে বেশ উপযোগী। পাহাড়ের ঢালে আনারসের চাষ করার জন্য কোনোক্রমেই জমি চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আলগা করা উচিত

নয়। এতে ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে উর্বর মাটি ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু পাহাড়ের জঙ্গল বা আগাছা মাটির স্তরে কেটে পরিষ্কার করে জমি চারা রোপণের উপযোগী করে তুলতে হবে।

৩.৪.৬ চারা রোপণ ও সার ব্যবস্থাপনা

গুণগত মানসম্পন্ন ভালো ফলন পেতে হলে আনারস চাষের জমিতে যতটুকু সম্ভব জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে মাটির ধরন অনুযায়ী সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে জৈবসার ব্যবহার করলে মাটির গুণাগুণ ও পরিবেশ উভয়ই ভালো থাকবে। বাড়িতে গবাদি পশু থাকলে সেখান থেকে গোবর সংগ্রহ করা যাবে। নিজের গবাদি পশু না থাকলে পাড়া-প্রতিবেশী যারা গবাদি পশু পালন করে তাদের কাছ থেকে গোবর সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া ভালো ফলন পেতে হলে জমিতে আবর্জনা পচাসার ব্যবহার করা যায়। বাড়ির আশপাশে গর্ত করে সেখানে আবর্জনা, ঝরা পাতা স্তূপ করে রেখে আবর্জনা পচা সার তৈরি করা সম্ভব।

মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর মাস আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন অর্থাৎ ফেব্রCুয়ারি মাসেও চারা লাগানো যায়। এক মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। ৫০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাইনে ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা লাগাতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেন্টিমিটার পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের জন্য কন্টুর পদ্ধতি বা সমউচ্চতা বরাবর ঢালের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে জোড়া সারি করে চারা রোপণ করা হয়। কখনও ঢাল বরাবর সারিতে চারা রোপণ করা উচিত নয়। এতে ভূমিক্ষয় বাড়ে। পাহাড়ের ঢালে জোড়া সারিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার ও চারা থেকে চারার দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার দেয়া উচিত। এতে হেক্টরপ্রতি ৫০ হাজার বা বিঘা প্রতি (৪০ শতাংশ) ৮ হাজার চারা প্রয়োজন। নির্ধারিত স্থানে চারা রোপণের পর গোড়া ভালোভাবে চেপে দেয়া উচিত।

৩.৪.৭ সার ব্যবস্থাপনা

গাছপ্রতি পচা গোবর ৩০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩৫ গ্রাম, টিএসপি ১৫ গ্রাম, এমওপি ৩৫ গ্রাম ও জিপসাম ১৫ গ্রাম প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে যত চারা আছে তা হিসাব করে সে মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ৪-৫ দিন পর থেকে শুরু করে ৫-৬ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ি অঞ্চলে আনারস একটি উল্লেখযোগ্য ফসল। সেখানে পাহাড়ের ঢালে কন্টুর পদ্ধতিতে সুন্দর লাইন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনারস লাগানো হয়। সার ব্যবস্থাপনাও সমতল ভূমির আনারসে চেয়ে ভিন্নতর। চারা রোপণের দুই মাস পর গাছপ্রতি ইউরিয়া ও টিএসপি সার ১০ গ্রাম করে গাছের গোড়া থেকে ১৫ সেন্টিমিটার দূরে ডিবলিং পদ্ধতিতে/পেগিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। একইভাবে গাছের বয়স যখন ৭-৮ মাস হবে তখন আর একবার একই মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

৩.৪.৮ সেচ ও নিকাশ

শুকনো মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেয়া খুবই প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেজন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেন্টিমিটার পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আগাছা আনারসের খুবই ক্ষতি করে। তাই আনারসের জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বছরে অন্তত দুইবার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে; একবার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল সংগ্রহ করার পর ও দ্বিতীয় বার অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। গাছ বড় হওয়ার আগে এটি সম্ভব। কিন্তু গাছ ঝোপালো হয়ে গেলে আগাছা পরিষ্কার করা যায় না তেমনি পরিষ্কার করার তেমন প্রয়োজনও পড়ে না। জমিতে সেচ এবং সার প্রয়োগের পর মালচিং করে নিলে জমি আগাছামুক্ত থাকে। আগাছা দিয়ে মালচিং করার পর একসময় পচে জৈবসার হিসেবে মাটিতে যুক্ত হয় এবং এতে করে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

৩.৪.৯ বালাই ব্যবস্থাপনা

আনারসে সাধারণত বালাইয়ের আক্রমণ কম হয়। চাষের জমিতে পোকার আক্রমণ হলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করলে বেশি ভালো হয়। তবে যে কোনো প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৩.৪.১০ আনারসে হরমোন ট্রিটমেন্ট

বাংলাদেশে যে পরিমাণ আনারস উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই আসে মধ্য জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য ভাদ্র অর্থাৎ জুন থেকে আগস্ট মাসে। এ সময় আম, কলা, পেয়ারা, কাঁঠাল এসব ফলেরও মৌসুম। কাজেই এ সময় আনারসের দাম কমে যায়। এমনকি এক সাথে প্রচুর আনারস পাকার ফলে এবং বৃষ্টির দিনে পরিবহনের অভাবে আনারস পচে যায়, নষ্ট হয়। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা বেশি থাকা সত্তেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন না থাকায় তা খাওয়া যায় না। তাছাড়া আনারসভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হলেও সারা বছর এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা জরুরি। পরিকল্পিতভাবে হরমোন প্রয়োগ করে সারা বছর কাঙ্ক্ষিত সময়ে আনারস পাকানো যায়। আনারস উৎপাদনে প্রধান সমস্যার মধ্যে রয়েছে গাছে ফুল আসতে ১৫-১৬ মাস এবং আনারস পাকতে ২১-২২ মাস সময় লেগে যায়। এতে ফলের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা জমিতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। বিশ্বে আনারস উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশে বহুকাল আগে থেকেই হরমোন প্রয়োগ করে আনারসের উৎপাদন করা হচ্ছে।

হরমোন প্রয়োগে সুবিধা

১। কম সময়ে আনারস পাওয়া

২। ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো সময়ে আনারস পাকানো যায়

৩। অমৌসুমে আনারস বিক্রি করে বেশি দাম পাওয়া যায়

৪। কম খরচে বেশি লাভ করা যায়

৫। সারা বছর ফলানো যাবে বলে উৎপাদনের এবং সরবরাহের বছরব্যাপী নিশ্চয়তা পাওয়া যায়

হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি

পরিকল্পিতভাবে চাষ করলে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর আনারস উৎপাদন করা যায়। হরমোন প্রয়োগের পদ্ধতি হচ্ছে, আনারসের শাকার রোপণের আট-নয় মাস বয়সের ৩০-৩২টি পাতা সম্বলিত গাছে হরমোন প্রয়োগ করতে হয়। গাছপ্রতি ৫০ মিঃ লিঃ ইথ্রেল দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। ইথ্রেল দ্রবণ তৈরির পদ্ধতি হচ্ছে- পানি-এক লিঃ, ইথ্রেল-৫০০ গ্রাম ভালভাবে মিশিয়ে প্রতি গাছে ৫০ মিঃ লিঃ করে প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে এক লিটার দ্রবণ ২০ গাছে প্রয়োগ করা যায়। হরমোন প্রয়োগের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে।

৩.৪.১১ মুড়ি ও সাথী ফসল চাষ

আনারস চাষে অন্যান্য লাভের সাথে আরেকটি লাভ মুড়ি ফসল। মুড়িগাছ একাধিক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে এবং ফল ধরে। সাধারণত মুড়ি ফসল থেকে ৫ থেকে ৬ বছর সফলভাবে ফল সংগ্রহ করা যায়। ঘোড়াশাল জাতের বেলায় কাপাসিয়া এলাকায় ৪০ থেকে ৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মুড়ি ফসল থেকে ফল পাওয়া যাচ্ছে। তবে এ ক্ষেত্রে আগাছা পরিষ্কার, শূন্যস্থান পূরণ, সার প্রয়োগ, বালাই ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। আনারসের সাথে অনায়াসে আদা, সয়াবিন, সরিষা, কলাই, কচু সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন ফল গাছের বাগানের ভেতর আনারস আবাদ করে। পাহাড়ি এলাকায় সাধারণত ট্যারেসিং বা কন্টুর পদ্ধতিতে ৬০ সেন্টিমিটার গভীর ও ৩০ সেন্টিমিটার প্রস্থ চাষ করা ভালো। পাহাড়ি এলাকায় জমি তৈরিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেন না বেশি নাড়াচাড়া করলে ভূমি ক্ষয় হয়ে যাবে।

৩.৪.১২ ফল সংগ্রহ

সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মাঘ মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে আনারস গাছে ফুল আসে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে আগস্ট মাসে আনারস পাকে। ফলের গোঁড়ার দিকের রং যখন সবুজ থেকে হলদে অথবা হাল্কা বাদামী রং এ পরিণত হয় তখনই ফল পেকে গেছে বলা যাবে। পাকা ফল সংগ্রহ করতে হবে। কিছু কিছু জাত আছে সারা বছর আনারস দেয়।

পাঠ সংক্ষেপ

১। উঁচু জমি ও পানি দাঁড়ায় না দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি আনারস চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

২। মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ অর্থাৎ অক্টোবর নভেম্বর মাস আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

৩। পরিকল্পিতভাবে চাষ করলে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর আনারস উৎপাদন করা যায়।

৪। আনারস পাকা অবস্থায় জমি থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

এসো নিজে করি

নিচের ছবিগুলো দেখে ফলের নাম লিখ এবং কখন গাছ হতে সংগ্রহ করতে হবে তার পরিপক্কতার মাত্রা উল্লেখ কর।

ফলের নাম	ছবি	পরিপক্কতার মাত্রা

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতিমধ্যে তুমি আমের রোগ ও পোকা দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা রোগ ও পোকা দমন ব্যবস্থা গ্রহন করে এবং তিনি কিভাবে আমের রোগ ও পোকা দমন করেছেন তা পর্যবেক্ষন করে তোমার পরামর্শ প্রদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

২০২৪

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন ধরনের মাটি আম চাষের জন্য উপযোগী?
২. আম চাষের জন্য উপযুক্ত সময় কখন?
৩. কোন অবস্থায় আম গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়?
৪. কাঁঠাল চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
৫. কোন ধরনের মাটি কাঁঠাল চাষের জন্য উপযোগী?
৬. আমাদের দেশে কি ধরনের কাঁঠাল পাওয়া যাই?
৭. কোন অবস্থায় কাঁঠাল গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়?
৮. কোন ধরনের মাটি লিচু চাষের জন্য উপযোগী?
৯. কিভাবে লিচুর চারা উৎপাদন করা হয়?
১০. কখন লিচু গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়?
১১. আনারস চাষে উপযোগি তাপমাত্রা কত?
১২. কোন ধরনের মাটি আনারস চাষের জন্য উপযোগী?
১৩. আনারস চাষের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
১৪. কোন অবস্থায় আনারস জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আম চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
৩. আমের চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
৪. আমের তিনটি জাতের নাম লিখ|
৫. আমে জিং এর অভাবে কি ক্ষতি হয়?
৬. কাঁঠালে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
৭. কাঁঠাল চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
৮. কাঁঠালের চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
৯. কাঁঠালের চারা রোপনের জন্য কখন উপযুক্ত সময়?
১০. লিচু চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?
১১. লিচুর চারা রোপনের ক্ষেত্রে কতটুকু দুরুত্ব বজায় রাখতে হয়?
১২. লিচুর চারা রোপনের জন্য গর্তের সাইজ কি রকম হবে?
১৩. লিচুর তিনটি জাতের নাম লিখ|
১৪. আনারসে কি কি পুষ্টি উপাদান থাকে?
১৫. আনারস চাষের জন্য জমি নির্বাচনে কি কি বৈশিষ্ট বিবেচনা করা প্রয়োজন?

২০২৪

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। আমের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
২। আমের বাগানের জন্য জমি তৈরি, চারা রোপন ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।
৩। আমের বাগানের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। কাঁঠালের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
৫। কাঁঠালের বাগানের জন্য জমি তৈরি, রোপণ দুরুত্ব ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।
৬। কাঁঠালের উপকারিতা আলোচনা কর।
৭। লিচুর চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
৮। লিচু চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।
৯। লিচুর পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। আনারসের চারা উৎপাদন পদ্বতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
১১। পাহাড়ি এলাকাই আনারস চাষের জন্য জমি তৈরি ও সার ব্যাবস্থাপনা বর্ননা কর।
১২। সারাবছর কিভাবে আনারস চাষ করা যাই সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

জব ৩.১। গুটি কলম এর মাধ্যমে লিচু গাছের চারা উৎপাদন

গুটিকলম দাবাকলমের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। গুটি কলম সাধারণত ফল গাছের গাছের বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বিভিন্নরকম ফলের বংশবিস্তারে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ পেয়ারা, লেবু জামরুল, লিচু, ডালিম, করমচা, গোলাপজাম, জলপাই, কামিনী ইত্যাদি। সাধারণত ঝোপালো কম উঁচু ফল গাছে এ ধরণের গাছের বংশবিস্তারের জন্য গুটি কলম উপযোগী।

শিখনফল

১। কলমের জন্য মাতৃগাছ নির্বাচন করতে পারবে।
২। মাতৃগাছ হতে প্রয়োজনীয় সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন করতে পারবে।
৩। কলমের জন্য প্রয়োজনীয় রুটিং মিডিয়াম তৈরী করতে পারবে।
৪। গুটি কলমের সকল ধাপসমূহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।
৫। গুটি কলমের মাধ্যমে লিচুর সুস্থ ও সবল চারা তৈরী করতে পারবে।

শাখা গুটি কলম

যেসব গাছের শাখার অগ্রভাগের অংশ নিচের দিকে নুইয়ে পড়ে সেশব গাছে শাখা কলম করা হয়। শাখ কলম করার জন্যে এর কিছু অংশবিশেষের বাকল তুলে ৫-৭ সেমি মাটির গভীরে পুঁতে রাখা হয়। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে বাকল তোলা উপরের অংশের গোড়া থেকে অস্থানিক শিকড় গজায় এবং তখন মাতৃগাছ থেকে এটিকে বিচ্ছিন্ন করে রোপণ করা হয়। যেমনঃ রাস্পবেরী, কালো জাম ইত্যাদি।

গুটি কলমের ধাপসমূহ

ক) সুস্থ-সবল ও নীরোগ শাখা নির্বাচন।
খ) নির্বাচিত শাখার বাকল তুলে ফেলা।
গ) কাটা অংশে রুটিং মিডিয়ামের ব্যবহার।
ঘ) রুটিং মিডিয়ামসহ গাছকে পলিথিন দিয়ে পেচিয়ে আবদ্ধ রাখা।
ঙ) মূল উৎপাদন।

প্রয়োজনীয় উপকরন

১। ধারালো ছুরি
২। পলিথিন
৩। সুতলি
৪। মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়াম ইত্যাদি।

গুটি কলমের শাখা নির্বাচনে নির্দেশিকা

ক) ভূমির সমান্তরালে অবস্থান করা শাখা নির্বাচন।

খ) কচি ও সুস্থ শাখা নির্বাচন।

গ) ডালটির পুরুত্ব পেন্সিলের মত হতে হবে

ঘ) শাখা কলম করার স্থান দক্ষিণ-পূর্ব দিকে করা উত্তম।

মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়া প্রস্তুতি

কলম করার জন্যে মাটির পেস্ট বা রুটিং মিডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। রুটিং মিডিয়া কলম কালীন অবস্থায় শাখাকে পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। কলম করার জন্যে যেসব রুটিং মিডিয়ামের প্রয়োজনঃ

ক) ৫০% এঁটেল-দোআঁশ মাটি

খ) ৫০% গোবর সার

গ) নারিকেলের ছোবড়া/ গুড়া

ঘ) পাটের আঁশ

এগুলো একসাথে মিশ্রিত করে শিকড় গজানোর স্থানে ঢেকে দিতে হবে।

গুটি কলমের উপযুক্ত সময়ঃ বৈশাখ - আষাঢ় মাস গুটি কলম করার উত্তম সময়।

লিচু গাছের গুটি কলম করার পদ্ধতি

লিচু গাছে কলম করার উপযুক্ত সময় বর্ষাকাল। গুটি কলমের জন্য এক থেকে দুই বছরের চারা ব্যবহার করা উত্তম।

১। মাতৃ গাছের নির্বাচিত ডালের আগা থেকে ৪০-৫০ সেমি লম্বা একটি গিটের নিচে কলমটি করতে হবে।

২। নির্বাচিত ডালের মধ্যে একটি গিটের নিচে ৩-৪ সেমি মাপে ডালের ছাল গোল করে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নিতে হবে।

৩। কেবল ডালটির বাকল উঠিয়ে ফেলতে হবে। ডালটির শক্ত কাঠটিতে আঘাত লাগানো চলবে না।

৪। ডালটির বাকল উঠিয়ে নেওয়ার পর কাঠটিতে লেগে থাকা সবুজ রং এর আবরণটি ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলতে হবে। এবং কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হবে।

৫। এরপর মাটির পেস্ট টি ডালের মধ্যে কাটা অংশটির মধ্যে দিয়ে ভালো ভাবে ঢেকে দিতে হবে। যেন বাকল তোলা পুরো জায়গায় ঠিকমত মাটির পেস্ট টি বসে যায়।

৬। মাটির পেস্ট টি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পর, ২০ সেমি লম্বা পলিথিন দিয়ে মাটির বলটি ঢেকে দিয়ে দু'দিকে উপরে এবং নিচে সুতলি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৭। কলম করা ডাল অর্থাৎ গুটির মধ্যে শিকড় আস্তে সময় লাগে ২.৫-৩ মাস।

৮। প্রথমে সাদা রঙের শিকড় দেখা যাবে। শিকড় এর রং যখন খয়েরী বা তামাটে হবে তখন গুটি সহ ডালটি গাছ থেকে কেটে নিতে হবে।

৯। গুটির পলিথিন সরিয়ে নিয়ে ডালটি ছায়া জায়গায় পলিথিন ব্যাগ অথবা টবে ৪-৫ সপ্তাহ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

১০। কলম করা ডালটি ৪-৫ সপ্তাহ সংরক্ষণ করে রাখার পরে লাগানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে।

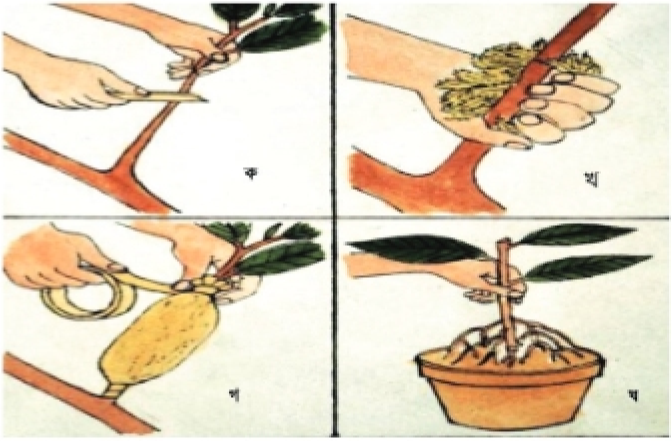

(ক) কান্ডের বাকল অপসারণ, (খ) বাকল অপসারণকৃত কান্ডে গ্রোয়িং মিডিয়ার প্রলেপ, (গ) গ্রোয়িং মিডিয়ার প্রলেপযুক্ত অংশটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে দেয়া এবং (ঘ) গুটি কলমের চারা টবে লাগানো

গুটি কলমের সুবিধা

ক) এটি অন্যান্য কলম প্রক্রিয়ার চেয়ে তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি এবং খুব একটা দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

খ) অল্প সময়ে বহু সংখ্যক গাছের চারা উৎপাদন করা যায়।

গ) কলম করা চারায় বীজ পদ্ধতির চেয়ে স্বল্প সময়ে ফল ধারণ করে।

ঘ) যে সমস্ত প্রজাতি কাটিং এ সহজে শিকড় গজায় না তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী।

ঙ) কলম করা চারা পোকামাকড় ও মাটিবাহিত রোগ সহনশীল হয়ে থাকে। এটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি সুবিধা। কলম করা চারাটি ব্যাক্টেরিয়া, ফাঙ্গাস, নেমাটোড, নডিউল, টোবাক্যো মোজাইক ভাইরাস ইত্যাদি সহনশীল ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

চ) নতুন চারাটির মাতৃ উদ্ভিদের চেয়ে বেশি জীনগত উন্নয়ন সাধিত হয়ে থাকে।

ছ) নতুন চারাটি লবণাক্ততা, আর্দ্রতা সহনশীল হয়ে থাকে।

গুটি কলমের অসুবিধা

ক) বাণিজ্যিকভাবে এ পদ্ধতি কাটিং অপেক্ষা ব্যয়বহুল।

খ) এই পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে গেলে অধিকসংখ্যক মাতৃ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়।

গ) সঠিক পদ্ধরি অনুসরণ না করলে চারাটি আশানুরূপ হয় না।

জব ৩.২: হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারাবছর আনারস উৎপাদন

বাংলাদেশে সাধারণত মধ্য জৈষ্ঠ থেকে মধ্য ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে আনারস সংগ্রহীত হয়ে থাকে। এ সময় প্রচুর পরিমাণে আনারস পাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতও হয়ে থাকে । ফলে পরিবহণের অভাবে অনেক ফল নষ্ট হয়ে পচে যায়। বছরের অন্যান্য সময় আনারসের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন না থাকায় তা দুষ্প্রপ্য হয়ে যায়। ফলে দামও বেড়ে যায় এমন কি অমৌসুমে জনসাধারন আনারস খেতে পারে না। আমরা হরমোন প্রয়োগ করে সারাবছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করতে পারি। আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু গ্রীষ্মকালীন ফল। টাঙ্গাইল, সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রচুর পরিমাণে আনারস চাষ হয়ে থাকে।

শিখনফল

১। আনারস গাছে হরমোন প্রয়োগ করতে পারবে
২। হরমোন প্রয়োগের পদ্ধতি জানতে পারবে
৩। হরমোনের নাম জানতে পারবে
৪। আনারস গাছে হরমোন প্রয়োগ করে সারাবছর ফল উৎপাদন করতে পারবে।

হরমোন প্রয়োগের সময়কাল

আনারসের জমিতে সব গাছে এক সাথে ফুল/ফল আসে না। যার দরুন দীর্ঘদিন যাবৎ জমি আটকে থাকে ফলে জমির উৎপাদন কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। এছাড়াও অমৌসুমে ফল উৎপাদন করা যায় না। হরমোন প্রয়োগ করে প্রায় শতভাগ গাছে একসাথে ফুল আসে। চারার বয়স যখন নয় (৯) মাস অথবা ২২ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করতে হয় অথবা চারার বয়স তের (১৩) মাস ২৮ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

হরমোনের নাম

- ইথ্রেল
- ক্যালসিয়াম কার্বাইড

হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি

আনারসের চারা রোপণের ৯-১৩ মাস পর প্রতি মাসে বৃষ্টিহীন দিনে ইথ্রেল ৫০০ পিপিএম অথবা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম (১%) দ্রবন প্রতি গাছে ৫০ মিলি পরিমাণে সকালে গাছের কাণ্ডে ঢেলে দিতে হবে।

সারাবছর আনারস পাওয়ার উপায়

সারাবছর আনারস পেতে হলে জমিকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে প্রতি মাসেই এক একটি ব্লকে আনারস চারা রোপণ করতে হয় অথবা একবার রোপণ করে ৩-৪ টি ব্লকে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিমাসে হরমোন প্রয়োগ করতে হবে। হরমোন প্রয়োগের ২০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসে এবং ৫-৬ মাস পর ফল আহরণ করা যায়।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

সঠিক সময়ে ও সঠিক মাত্রায় আনারস গাছে হরমোন প্রয়োগ করতে পারবে।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

২০২৪

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ষাকালীন ফল চাষ

(Cultivation of Monsoon Fruits)

সুস্থ-সবল দেহ নিয়ে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে হলে ফলের বিকল্প নেই। কারণ শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ লবণ, অর্গানিক এসিড, ডাইয়েটরী ফাইবার, ফলিক এসিড, ফ্লাভিনয়েড এবং প্রচুর উপকারী হরমোন ও ফাইটোকেমিক্যালের একটি দারুন উৎস হচ্ছে ফল যা দেহের পুষ্টিচাহিদা পূরণ, শারীরিক বৃদ্ধি ও ক্ষয়রোধ, মেধা বিকাশ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুস্বাস্থের জন্য অপরিহার্য। আমাদের দেশের জলবায়ুতে বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফল জন্মে যে গুলোর স্বাদে, গন্ধে, রঙে, আকারে ও ফলনে নানা বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। সবুজ, হলুদ, কমলা অথবা লাল রং এর ফল আমাদেরকে সুস্থ্য রাখে এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাতে স্বাদ ও গন্ধেভিন্নতা ও বৈচিত্র আনয়ন করে। গ্রীস্ম ও বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রাপ্যতা প্রায় ৫৪ ভাগ। ফল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে। বিশেষ করে গ্রীস্ম ও বর্ষায় দেশি ফলের আমদানি বাড়ার কারনে বিদেশি ফলের আমদানি কমে যায়। পুষ্টিবিদরা জানান, বর্ষার ফল পুষ্টিগুণে ভরা। লটকনে ভিটামিন "সি" আর "এ" আছে। এই ভিটামিন চুল, দাঁত ও ত্বকের জন্য ভালো। এছাড়া আমড়া লেবুতে ভিটামিন "সি" আছে। এই ফলও শরীরের জন্য উপকারী। তাই বেশি বেশি ফল খাওয়ার পরামর্শ তাঁদের। বর্ষার ফল পেয়ারা, লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেওয়া, কামরাঙা, কাউ, গাব ও লেবু ইত্যাদি। বিশেষ করে গ্রীস্ম ও বর্ষায় দেশি ফলের আমদানি এতটাই বেড়ে যায় যে, বিদেশি ফলের আমদানি কমে যায়। বছর ব্যাপী পুষ্টির নিশ্চয়তার জন্য সারা বছর সুষমভাবে ফল উৎপাদন হওয়া দরকার। এজন্য বর্ষা মৌসুমের রকমারী বিভিন্ন রকমের ফলের উৎপাদন

বাড়ানোর পবশাপাশি এসব ফলের রপ্তানী ও প্রক্রিয়াকরণের দিকে নজর দিতে হবে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে-

১. পেয়ারা, আমড়া, লেবু ও লটকন এর পরিচিতি, ব্যবহার ও পুষ্টিগুণ উল্লেখ করতে পারবে
২. উপর্যুক্ত ফলগুলো চাষের উপযোগী মাটি ও জমি নির্বাচন ও জাত নির্বাচন করতে পারবে
৩. উপর্যুক্ত ফলগুলো চাষের উপযোগী জমি প্রস্তুত, গর্ত তৈরি ও গর্তে সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করতে পারবে
৪. উপর্যুক্ত ফলগুলোর আন্ত:পরিচর্যা, ফলসংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবে।

৪.১ পেয়ারার চাষ (Cultivation of Guava)

ইংরেজী নাম: Guava

বৈজ্ঞানিক নাম: *Psidium guajava*

গোত্র: Myrtaceae

পেয়ারার উৎপত্তি: পেয়ারার উৎপত্তি স্থল আমিরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চল।

পেঁয়ারা ভিটামিন "সি" সমৃদ্ধ একটি দ্রুত বর্ধনশীল ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফল জন্মে থাকে। দেশের অধিকাংশ এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারার চাষ হচ্ছে। দেশে ২৩.৭৩ হাজার হেক্টর জমিতে পেয়ারার আবাদ হয় এবং উৎপাদন ২৪৩.৯৬ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস২০২১)। বাংলাদেশ বর্তমানে পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে ৮ম স্থানে রয়েছে। হেক্টর প্রতি গড়ফলন প্রায় ৪.৮ মেট্রিকটন। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষাবাদ হলেও মোট উৎপাদনের সিংহভাগই (৭৭%) আসে আম, কলা, কাঁঠাল, তরমুজ, পেয়ারা এবং আনারস এ ৬ প্রজাতির ফল থেকে। যেখানে পেয়ারার উৎপাদন শতকরা ৪.৭৫ ভাগ (বিবিএস২০২১)।

৪.১.১ পেয়ারার পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

পেয়ারার পরিচিতি ও ব্যবহার: পেয়ারা গাছ ছোট থেকে মাঝারি আকারের হয়ে থাকে। শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না। টাটকা ফল হিসাবে খাওয়া ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জ্যাম, জেলি, জুস প্রভৃতি খাদ্য তৈরী হয়।

২০২৪

পুষ্টিগুণ: পেয়ারার পুষ্টিমান অনেক। প্রচুর ভিটামিন "সি" রয়েছে। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারায় জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, ভিটামিন "সি" ২১০ মিলিগ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ ক্যালরি, ভিটামিন "বি১" ০.২১ মিলিগ্রাম, ফলিক এসিড ১.৩-২.৯ মিলিগ্রাম, নিকোটিনিক এসিড ৬-১০ মিলিগ্রাম, প্রোটিন ১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, নায়াসিন ০.৫৫ মিলিগ্রাম ও পানি ৯২.৪ গ্রাম।

জাত নির্বাচন: আমাদের দেশে ছোট বড়, গোলাকার, উপবৃত্তাকার, নাশপাতির আকার, সাদা ও লাল শাঁশ বিশিষ্ট বিভিন্ন জাতের পেয়ারা দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো কাজী পেয়ারা, বারি পেয়ারা-২, বারি পেয়ারা-৩। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জাত গুলো হলো- বাউ পেয়ারা-১, বাউ পেয়ারা-২, বাউ পেয়ারা-৩,বাউ পেয়ারা-৪,বাউ পেয়ারা-৫,বাউ পেয়ারা-৬ বাউ পেয়ারা-৭,বাউ পেয়ারা-৮,বাউ পেয়ারা-৯ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত জাত গুলো হলো- ইপসাপেয়ারা। এসব জাতের পাশাপাশি অন্যান্য জনপ্রিয় জাতগুলো হলো- স্বরুপকাঠি, কাঞ্চন নগর ও মুকুন্দপুরী।

কাজী পেয়ারা: থাইল্যান্ড থেকে আনা এ জাতটি বাংলাদেশে "কাজী" পেয়ারা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। আকারে বেশ বড় এবং গড় ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম। ফলের আকার অনেকটা ডিম্বাকার, শাঁস মচমচে ও টক মিষ্টি স্বাদের। প্রায় সর্বত্রই এর চাষ করা চলে।

চিত্র: কাজি পেয়ারা

চিত্র: মাধুরী পেয়ারা

স্বরুপকাঠি: বরিশালের স্বরুপকাঠিতে পেয়ারার চাষ বেশি হয়, এ জন্য এর নাম স্বরুপকাঠি রাখা হয়েছে। এ জাতের ফলের আকার আনেকটা ডিম্বাকার, গোলাকার ও উপরিভাগ অমসৃণ। শাঁস সাদাটে ও অল্প বীজযুক্ত, মিষ্টি, রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। তবে এ জাতের পেয়ারা "কাজী" জাত অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট।

কাঞ্চননগর: চট্রগ্রাম জেলার কাঞ্চন নগরে এ জাতটি বেশি দেখা যায়। এজন্য এ জাতের এরুপ নামকরণ হয়েছে। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট হল, অন্যান্য জাতের চেয়ে এ শাঁসে বীজের সংখ্যা খুব কম থাকে। ফল নাশপাতি আকারের ও শাঁস মিষ্টি।

থাইপেয়ারা: থাইল্যান্ডের "ফারাং" জাতটি এখন বাংলাদেশে "থাইপেয়ারা" নামে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠেছে। ফল বেলুনাকার ও গোলাকার। প্রতিটি থাইপেয়ারার ওজন ৪০০-৭০০ গ্রাম। পরিণত পেয়ারার খোসার রং হলদে সবুজ। শাঁসের রং সাদা, বেশ মিষ্টি। বীজ কম, সারা বছর ফল ধরে। তবে বর্ষাকালে বেশি ফল ধরলেও শীতের ফলের মত তা মিষ্টি হয় না।

মাধুরী: লাল শাঁসের সৈয়দা পেয়ারার সাথে কাজী পেয়ারার সংকরায়নের ফলে একটি হাইব্রিড জাতের পেয়ারার উদ্ভাবন করা হয়েছে যার নাম "মাধুরী"। ফলের আকার কাজী পেয়ারার মতই। ফল পাকলে হালকা হলুদাভ সবুজ হয়, বেশ সুগন্ধযুক্ত এবং ভিতরের শাঁস হয় লাল। প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-৭৫০ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

আঙ্গুর পেয়ারা: ফল ছোট আকারের, গোলাকার, আকার-আকৃতি অনেকটা বড় মার্বেলের মতো। ফল ধরে আঙ্গুরের মত থোকা ধরে।

পলি পেয়ারা: পলি পেয়ারার রং কালচে। ডাল ও পাতার রঙও কালচে বেগুনি। পাকলে শাঁসের রং হয় লাল। সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু, মিষ্টি। পাকা পেয়ারার শাঁস নরম ও শাঁস দিয়ে জ্যাম জেলী বানানো যায়।

মুকুন্দপুরী: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুকুন্দপুরে এ জাতের পেয়ারা বেশি চাষ হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্য অনেকটা কাঞ্চননগর পেয়ারার মতই।

বারি পেয়ারা-২: সারা বছর ধরে। উচ্চ ফলনশীল জাত। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। অ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

বারি পেয়ারা-৩: উচ্চ ফলনশীল জাত। পাকলেও ফলের রং সবুজ থাকে। শাঁসের রং লাল।

বারি পেয়ারা-৪: এ জাতটি বীজবিহীন। গাছে নিয়মিত ফল ধরে। শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি ও কচকচে। প্রায় সারা বছর ফল পাওয়া যায়। অমৌসুমে পেয়ারা উৎপাদনের জন্য ভাল জাত।

৪.১.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

চাষের জলবায়ু

পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। পেয়ারা গাছের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা হচ্ছে ২৩-২৮° সে.। প্রায় সব মাটিতে পেয়ারা চাষ করা যায়, জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি থেকে ভারী এটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা সেখানে পেয়ারা ভাল জন্মে। মাটির অনুকূল পিএইচ হলো ৪.৫ থেকে ৮.২।

জমি ও মাটি নির্বাচন

উচ্চ জমি ও খোলামেলা রোদযুক্ত জায়গা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুনিষ্কাশিত ভারী পলি মাটিতে পেয়ারা ভাল হয়। পেয়ারা গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। ভাল ফলনের জন্য মাটিতে সব সময় পর্যাপ্ত রস থাকা দরকার। সমতল ভূমিতে বর্ষাকালে পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

বাগানের লেআউট তৈরি: বর্গাকার (Squar system) পদ্ধতিতে সঠিক দূরত্বে লে-আউট তৈরি করে কলমের চারা রোপণ করলে বাগান দেখতে সুন্দর হয় এবং প্রতিটি চারা সমান ভাবে আলো-বাতাস পায় ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এ পদ্ধতিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ও সারি থেকে সারির দূরত্ব সমান থাকে এবং পাশাপাশি দুই সারির চারটি গাছ মিলে একটি বর্গক্ষেত্র তৈরী করে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি গছের পাশে সমান জায়গায় থাকায় গাছগুলো সুষমভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং আন্তপরিচর্যা, স্প্রে ও ফসল সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ সহজভাবে করা যায়।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ:

জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে জমিতে রেখেই সেগুলো রোদে শুকাতে হবে। তারপর তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সেসব ছাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আগাছা পরিষ্কার, জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস এবং চাষের কাজ হয়ে যাবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর ৪ মি.X ৪ মি. দূরত্বে ৬০সে.মি.X৬০ সে.মি.X৪৫ সে.মি. সেমি আকারে গর্ত বর্ষার আগে তৈরি করতে হবে। গর্ত খনন করার সময় উপরের দুইতৃতীয়াংশ মাটি একদিকে এবং নিচের এক তৃতীয়াংশ মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। গর্তের মাটি তুলে পাশে রেখে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। নিচের মাটির সাথে প্রতি গর্তে চারা রোপণের ১০-১৫ দিন আগে ১০-১৫ কেজি পচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে এবং উক্ত সার কোদাল দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে গর্তে মাটি ভরাট করে পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। নিচের বাকি এক তৃতীয়াংশ মাটি গর্তের উপরে ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

৪.১.৩ চারাসংগ্রহ ও রোপণ

চারাসংগ্রহ

বীজ থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায়। আবার গুটি কলম এর মাধ্যমেও কলম তৈরি করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে গুটি কলম এর মাধ্যমে পেয়ারার কলম তৈরি করা হয়। পেয়ারার প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চারা/কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বীজ থেকে এবং বিভিন্ন অঙ্গজ উপায়ে পেয়ারার বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত গাছে ফল ধরে দেরীতে এবং সেফল মাতৃবৃক্ষের ফলের মত গুন বিশিষ্ট হয় না। সবদিক বিবেচনা করে তাই পেয়ারার কলমের চারা লাগানোই ভাল। কারন কলমের গাছে ফল ধরে তাড়াতাড়ি এবং গাছে সঠিক জাতের, সঠিক গুনমান সম্পন্ন ফল পাওয়া যায়। এ জন্য ছেদ কলম,গুটি কলম, জোড় কলম, কুড়িঁ সংযোজন প্রভৃতি অঙ্গজ পদ্ধতিতে পেয়ারার কলম তৈরী করা যায়। এদের মধ্যে গুটি কলম করার পদ্ধতিই সহজ ও বহুল প্রচলিত। প্রায় ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে গুটি কলমটি কাটার উপযুক্ত হয়।

পেয়ারার গুটি কলম

পেয়ারা গাছে গুটি কলম পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা হয়। সাধারণত বর্ষাকালে গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। গুটি কলম করার পদ্ধতির ধাপ সমুহ নিম্নেরুপ:

(১) গুটি কলম করার জন্য নির্দিষ্ট মাতৃগাছের এক বছরের সতেজ ও সরল পেনসিল থেকে একটু মোটা ৩০-৩৫ সেমি লম্বা নিরোগ ডাল নির্বাচন করতে হবে। ডালে গুটি বাধার জায়গা, যেখানে বাকল/ছাল ধূসর রঙ হয়েছে, সেই অংশটুকু থেকে পাতা ও ছোট ছোট ডালপালা সরিয়ে আগে পরিস্কার করে নিতে হবে। ডালের পরিস্কার জায়গায় গীটের একটু নীচে ধারালো ছুরি দিয়ে ডালের চারিদিকে ঘুরিয়ে ছাল/বাকল গোল করে কেটে নিতে হবে। ডালের উপর দুটো গোলাকার কাটা ছাল/বাকলের মাঝের অংশ ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি কেটে ৩ সেমি অংশ ছাল তুলে ফেলতে হবে। ছাল তোলার পর ছুরির ধারালো ফলার উল্টো দিক দিয়ে ঘষে ডালে লেগে থাকা ক্যাম্বিয়াম স্তর তুলে দিতে হবে।

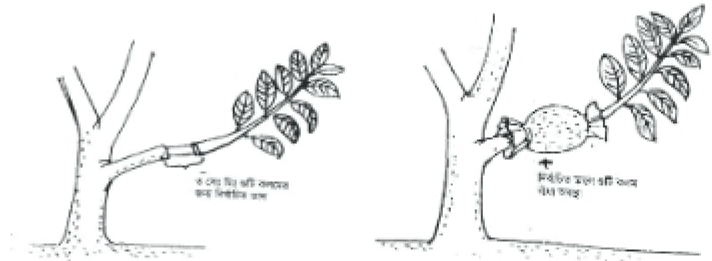

চিত্র: পেয়ারার গাছে গুটি কলম

(২) এরপর জৈব সার মিশ্রিত (তিনভাগ এঁটেল মাটি ও একভাগ পঁচা গোবর) মাটি পানি দিয়ে রুটির জন্য তৈরি আটার বলের মত করে নরম মাটি দিয়ে গোল করে সমানভাবে কাটা অংশ এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন কাটা অংশ ছাড়া উভয় দিকে আরও ২-৩ সেমি পরিমান ডালের অংশ ঢাকা থাকে।

(৩) এরপর প্রায় ২০ সেমি মাপের লম্বা ও চওড়া পলিথিন দিয়ে মাটির বলটি ভালভাবে জড়িয়ে দুইমাথা সুতলি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে।

(৪) প্রায় ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে ডালে ছাল তোলা অংশের উপর দিক থেকে শিকড় গজায়। প্রথমে শিকড়ের রং সাদাটে হয়। কয়েকদিন পর তা খয়েরি বা তামাটে রঙে পরিবর্তিত হরে কলমটি শিকড় গজানো বাধা অংশসহ কেটে এনে অপ্রয়োজনীয় কিছু ছোট ডাল ও পাতা ফেলে দেওয়ার পর সাবধানে পলিথিন সরিয়ে দিয়ে ছায়া সাথানে তৈরি বীজতলায় বা টবে ৪-৫ সপ্তাহ সংরক্ষণ করার পর গাছটি লাগানোর উপযুক্ত হবে।

চারা রোপণ

সাধারণত জমিতে বর্গাকার পদ্ধতিতে ৪ মি.X ৪ মি. দূরত্বে লে-আউট করে এক বছর বয়সের চারা বা কলম লাগাতে হবে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পেয়ারার চারা/ কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়।চারা বা কলম রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি পুণরায় উলটপালট করে এর ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারাটি লাগিয়ে চারার চারিদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে কলম/চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা

২০২৪

করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বিকাল বেলা চারা রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের সময় কান্ডের মূল ডাল রেখে অন্য ডাল ছেঁটে দিতে হবে।

কলম কাটার প্রায় ৫ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে গুটি কলমটি কাটার উপযুক্ত হয়।

৪.১.৩ আন্ত:পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলেনা পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদিপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ ব্যবস্থাপনা

পেয়ারার চারা রোপণের সময় যদি গর্তের মাটি শুকনো থাকে তাহলে চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে কিছু পানি দিতে হবে। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় পেয়ারা গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি সেচের প্রয়োজন। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে বড় আকারের ফল ও বেশি ফলন পাওয়া যাবে। গোড়ায় পানি জমে গেলে ও ঠিকমত নিষ্কাশন না হলে গাছ মরে যেতে পারে।

আগাছা দমন

আগাছা পেয়ারা গাছের অন্যতম শত্রু এবং বিভিন্ন ভাবে গাছের ক্ষতি করে থাকে। গাছের গোড়া ও নালার আগাছা সবসময় পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। গাছের ওপরে পরগাছা ও লতাজাতীয় আগাছা থাকলে তাদূর করতে হবে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

শুন্যস্থান পূরণ

চারা লাগানোর ৭-১০ দিনের মধ্যে যে সমস্ত চারা মারা যায়, সেখানে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে তিন কিস্তিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার একেবারে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ না করে যতদূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার করে সে পর্যন্ত মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। নিচের ছকে বিভিন্ন বয়সের গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেখানো হলো:

সারের নাম	**গাছের বয়স**		
	১-২ বছর	**৩-৫ বছর**	**৬ বছর বা তদূর্ধ**
গোবর (কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০
ইউরিয়া(গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
এমপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০

সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি আসার সময় পানি সেচ অত্যাবশ্যক। গাছের গোড়া থেকে মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করা ও গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দেওয়া দরকার।

অঙ্গ ছাঁটাই (Pruning): অঙ্গ ছাটাই বরতে মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করা বুঝায়। রোপণকৃত চারা বা কলমের সুন্দর কাঠামো দেওয়ার নিমিত্তে মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ৪-৫টি ডাল রেখে গোড়ার দিকের সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসে অঙ্গ ছা৭টাই করা হয়। অঙ্গ ছাটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ডাল নুয়ে দেওয়া: ছাটাই পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এজন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল ছাঁটাইকরণ (Fruit thinning): কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। ফল আকারে বেশ বড় হওয়ায় গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘ দিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফল ছোট থাকা অবস্থায় (মার্বেল অবস্থা) ৫০-৬০ % ফল ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল ছাঁটাই করে প্রায় সারাবছর “কাজী পেয়ারা” ও “বারি পেয়ারা-২” জাতের গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফল ঢেকে দেওয়া (Fruit bagging):পেয়ারা ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকা,পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং আকর্ষণীয় রঙের হয়। ব্যাগিং বাদামী কাগজ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগে না বিধায় ফলে কোষ বিভাজন রেশি হয় এবং ফল আকারে বড় হয়। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি হারে টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সাথীফসল

চারা রোপণের পর ২-৩ বছর পর্যন্ত পেয়ারা বাগানে ফাঁকা জায়গায় শিম জাতীয় ফসল যেমন- বিভিন্ন পাতা জাতীয় সবজি, মটরশুটি, ডালফসল, বরবটি, বাদাম, সানহেম্প ইত্যাদি রোপণ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

১) পেয়ারার ছাতরা পোকা (Mealy bug): ছাতরা পোকা পেয়ারার অন্যতম ক্ষতিকর পোকা।

লক্ষণ

১) এরা পাতা ও ডালের রস চুষে নেয় ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে।

২) পোকার আক্রমণে পাতা ও ডালে সাদা সাদা তুলার মতো দাগ দেখা যায়।

৩) এর আক্রমণে অনেক সময় পাতা ঝরে যায় এবং ডাল মরে যায়। ২০২৪

৪) কাঁচা পেয়ারাও এ পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলের খোসার ওপর এরা দলবদ্ধভাবে থেকে রস চুষে খায়। ফলের খোসায় কালো ছাতা পড়ে, আঠালোবাব হয় ও অধিক আক্রান্ত ফল দুর্গন্ধ বের হয়। পোকা পেয়ারা গাছে থাকে ও আক্রমণস্থল থেকে রস চুষে খায়। ফলে সেসব অংশ দুর্বল হয়ে শুকিয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ছাতরা পোকা এক ধরনের আঠার মতো মিঠা রস ছাড়ে। সে রস পাতা বা গাচের যেকানে পড়ে সেকানে চটচটে আঠার মতো হয়ে যায় এবং সেখানে কালো রঙের ছত্রাক জন্মলাভ করে। তাকে শুটি মোল্ড বল।

চিত্র: পেয়ারার ছাত্ররা পোকা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) ছাতরা পোকাসহ আক্রান্ত অংশ কেটে ধ্বংস করতে হবে।

২) ছাতরা পোকার বিস্তার ঠেকাতে পিঁপড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৩) জৈব বালাইনাশক নিমবিসিডিন (০.৪%) ব্যবহার করতে হবে।

৪) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি মিপসিম বা সপসিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২) পেয়ারার সাদা মাছি পোকা (Spiraling white fly)

লক্ষণ: সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেকা যায়। এরা পাতার রস শুঁষে গাছকে দুর্বল করে। রস শোষণের সময় পাতায় মধু সদৃশ বিষ্ঠা ত্যাগ করে যার উপর শুঁটিমোল্ড নাসক ছত্রাক জন্মে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

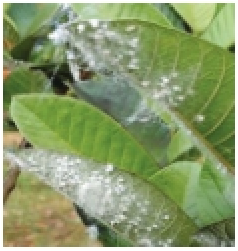

চিত্র: পেয়ারার সাদা মাছি পোকা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) সাদা আঠাযুক্ত বোর্ড স্থাপন বা আলোর ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

২) আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলতে হবে।

৩) ৫০ গ্রাম সাবানের গুড়া ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পাতার নিচে সপ্তাহে ২/৩ বার ভাল করে স্প্রে করতে হবে। অথবা তামাকের গুড়া পিানিতে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৪) ব্যাপক আক্রমণ হলে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদিত কীটনাশক রগর/মারশাল ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে।

৩) ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit borer): পেয়ারা ফলের প্রধান সমস্যা হলো ফল ছিদ্রকারী পোকা।

লক্ষণ: আক্রান্ত ফল বিকৃত দেখায়। কাছে গেলে ফলের গায়ে ছোট্ট গোলাকার ছিদ্র দেকা যায়। ছিদ্র ধীরে ধীরে শুকিয়ে বাদামি ও পরে কালো হয়ে যায়। সদ্য ছিদ্ররে মুখে কীড়ার মল দেখা যায়। আক্রান্ত পেয়ারার ছিদ্র বরাবর কাটলে ভিতরে কীড়া দ্বারা সৃষ্ট সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের ভিতরে কীড়ার মল চোখে পড়ে। অনেক সময় কীড়াও দেখা যায়।

চিত্র: পেয়ারার ফল ছিদ্রকারী পোকা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) পেয়ারা গাছ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২) আক্রান্ত গাছ থেকে আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুঁতে ফেলতে হবে।

৩) সন্ধার পর আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে এই পোকার মথ ধরে ধ্বংস করা যায়।

৪) সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে এই পোকার মথ ধ্বংস করা যায়।

রোগবালাই দমন

১) পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ বা ক্ষত রোগ (Anthracnose): এ্যানথ্রাকনোজ পেয়ারার একটি ছত্রাক জনিত প্রধান ক্ষতিকর রোগ।

লক্ষণ

১) এ রোগের আক্রমণে কান্ড, শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফলে আক্রমণ করে।

২) প্রথম অবস্থায় পেয়ারারে গায়ে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায়। এ দাগ আস্তে আস্তে হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। শেষে দাগ বাদামি থেকে কালো রং ধারণ করে ও পেয়ারাকে খাওয়ার অনুপযুক্ত করে ফেলে। তীব্র আক্রমণে আক্রান্ত পেয়ারা শুকিয়ে শক্ত হয়ে ফেটে যায়। পাতায় কালচে বাদামি শুকনো দাগের সৃষ্টি হয়।

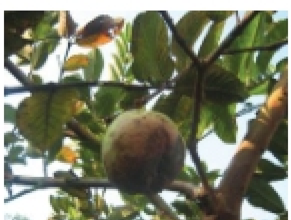

চিত্র: পেয়ারার ক্ষত রোগ

২০২৪

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা, ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পেয়ারার কুড়ি আসার আগে প্রতি লিটার পানির সাথে টপসিন এম ২ গ্রাম বা ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

২) **ঢলে পড়া রোগ (Wilt):** ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ ১) রোগাক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলদে এবং বাদামি রং দারন করে।

২) গাছের শাখা প্রশাখা আগা থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গাছটি মারা যায়।

চিত্র: পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাই একে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

২)বাগানের পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

৩) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমন: এল ৪৯ ও পলি পেয়ারার সাথে কলম করে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

৪) বাগানের মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ কমানোর জন্য চুন প্রয়োগ করতে হবে।

৪.১.৪ ফল সংগ্রহ

ফল পাকার সময় ফলের রং সবুজ থেকে ধীরে ধীরে হলদে হতে থাকে। ফুল আসার ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার আগেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল পাকলেই তার শত্রু অনেক। বিভিন্ন ধরনের পাখি ও রাতে বাদুড় অনের ফল নষ্ট করে, সেজন্য ফল পাকার ঠিক দুই দিন আগেই ফল তোলা প্রয়োজন। গাছ ছোট থাকলে হাত দ্বারা বেছে একটি একটি করে করে সুপরিণত ফল সংগ্রহ করা ভাল। কাঁচা ফল কখনো সংগ্রহ করা উচিত নয়। দুরের বাজারে পাঠাতে হলে একটু কাঁচা অবস্থায় ফল তোলতে হবে।

ফলন: সাধারণত বীজের চারা থেকে জন্মানো গাছে প্রতিগাছে গড়ে ৮০-৯০ কেজি ও কলমের গাছে প্রতি গাছে গড়ে১৫০-২০০ কেজি ফল পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ২০-৩৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

৪.১.৫ ফলসংরক্ষণ

সংগ্রহের পর অধিকাংশ জাতের ফলই ২-৩ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। এজন্য সংগ্রহের পরপরই বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কাঠের বাক্সে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্রাগে ফল ভরে যদি চালানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে ৫-৬ দিন পর্যন্ত ফল ভাল থাকে। অনেক সময় ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পেয়ারাকে হিমাগারে ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

৪.২ আমড়া উৎপাদন (Cultivation of Hogplum)

ইংরেজী নাম: Hogplum
বৈজ্ঞানিক নাম: *Spondias mombin*
গোত্র: Anacardiaceae

আমড়া বর্ষা মৌসুমের একটি জনপ্রিয় ও ভিটামিন "সি" সমৃদ্ধ স্বল্পপ্রচলিত বা অপ্রচলিত ফল। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়। যেমন, বিলাতি আমড়া (Golden apple) ও দেশি আমড়া (Hogplum)। ভাল জাতের আমড়া আমাদের দেশে বিলাতী আমড়া বা বরিশালী আমড়া নামে পরিচিত। এটি মহিলা ও শিশুদের নিকট অতিপ্রিয় ফল। দেশে ৪.৬২ হাজার হেক্টর জমিতে পেয়ারার আবাদ হয় এবং উৎপাদন ৪২.৫৩ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস ২০২১)।

৪.২.১ আমড়ার পরিচিতি ও জাত নির্বাচন

পুষ্টিগুণ: আমড়া একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। আমড়াতে প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৮৩ ভাগ পানি, ১.১ গ্রাম আমিষ, ১৫.০ গ্রাম শ্বেতসার, ০.১০ গ্রাম স্নেহ, ৮০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ০.২৮ মিলিগ্রাম থায়াসিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লেবিন, ৯২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৫৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩.৯ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে।

ব্যবহার: বিলাতি আমড়া কাঁচা খাওয়া হয়। এটি খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। বিলাতী ও দেশি ২ ধরনের আমড়া থেকেই উন্নতমানের সুস্বাদু আচার, চাটনী ও জেলী তৈরি করা হয়। আমড়ায় প্রচুর পরিমান

১০৩৪

ভিটামিন সি, আয়রন, ক্যালসিয়াম আর আঁশ আছে, যেগুলো শরীরের জন্য খুব দরকারি। হজমেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আমড়া যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ফাইবারে সমৃদ্ধ।

চিত্র: আমড়ার আচার

চিত্র: আমড়ার জেলি

চিত্র: আমড়ার চাটনী

চাষের জলবায়ু: গ্রীস্ম মন্ডলীয় জলবায়ুতে আমড়া ভাল হয়। বাংলাদেশের জলবায়ু আমড়া চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

জাত নির্বাচন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) উদ্ভাবিত আমড়ার জাতগুলো হলো বারি আমড়া-১ ও বারি আমড়া-২।

বারি আমড়া-১ (বারমাসি আমড়া): প্রায় সারা বছর ফল ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বারি আমড়া-১ একটি নতুন জাতের আমড়া।

বৈশিষ্ট

১. গাছ বামন আকৃতির হয়
২. ফল ছোট (৬০ গ্রাম)।
৩. ফলের শাঁস হালকা সাদা, মধ্যম রসালো ও টক মিষ্টি।
৪. ফলের খোসা পাতলা ও মসৃন।
৫. ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%।
৬. দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি আমড়া-২

বৈশিষ্ট

১. গাছ লম্বাকৃতি।
২. ফল বড় (৯৫-১০০ গ্রাম)।
৩. ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৬০%।
৪. জাতটি দেশের উপকূলীয় এলাকায় চাষোপযোগী।

৪.২.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

মাটি ও জমি নির্বাচন: আমড়া চাষের জন্য বন্যামুক্ত উচ্চ থেকে মাঝারী উচ্চ জমি নির্বাচন করতে হবে। গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দো-আঁশ মাটি আমড়া চাষের জন্য উত্তম।

বাগানের লে-আউট তৈরি

বর্গাকার বা ষড়ভোজ পদ্ধতি আমড়া চাষের জন্য উপযুক্ত।

জমি প্রস্তুত, গর্ত বা পিট তৈরি ও গর্তে সার প্রয়াগ

জমি তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে জমিতে রেখেই সেগুলো রোদে শুকাতে হবে। তারপর তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে এবং কোদাল দিয়ে কুপিয়ে সেসব ছাই মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আগাছা পরিষ্কার, জীবাণু ও পোকামাকড় ধ্বংস এবং চাষের কাজ হয়ে যাবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ি জমিতে কন্টুর বা ম্যাথ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। চরা রোপণের জন্য সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভোজী পদ্ধতি ব্যকহার করা যেতে পারে। জমি তৈরির পর ৫ মি.X ৫ মি. দূরত্বে ৬০সে.মি.X৬০ সে.মি.X৬০ সে.মি. আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। আমড়া চারা রোপণের জন্য প্রতি গর্তে/ মাদায় ২০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি সার এবং ৫০ গ্রাম জিবসাম সার প্রয়োগ করতে মটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪.২.৩ চারা সংগ্রহ ও রোপণ

চারা/কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন

বীজ বা কলমের মাধ্যমে আমড়ার বংশ বিস্তার করা হয়। পরিপক্ক আমড়া বীজ থেকে শাঁস ছাড়িয়ে নিয়ে বালিতে রোপণ করতে হয়। চারা গজানোর পর ছোট অবস্থায় চারা গুলো তোলে কম্পোষ্ট ও ভিটি বালি মিশ্রিত অন্য টবে স্থানান্তর করতে হয়। একটি বীজ থেকে এক বা একাধিক চারা হতে পারে। কম্পোষ্ট ও ভিটি বালি মিশ্রিত টবে একবারে বীজ লাগিয়েও এই চারা উৎপাদন করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে চারার অঙ্কুরোধগম ক্ষমতা কমে যায়। বীজের চারাতে ও বংশগত গুনাবলী ঠিক থাকে। কলমের মাধ্যমেও আমড়ার বংশ বিস্তার করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে দেশি আমড়ার চারা রুট ষ্টক হিসাবে ব্যবহার করে ক্লেফট গ্রাফটিং (Cleft grafting) পদ্ধতিতে আমড়ার কলম করা হয়।

চারা সংগ্রহ

বীজ থেকে সরাসরি চারা তৈরি করা যায়। আবার ক্লেফট গ্রাফটিং (Cleft grafting) পদ্ধতির মাধ্যমেও আমড়ার কলম তৈরি করা যায়। তবে বাণিজ্যিক ভাবে ক্লেফট গ্রাফটিং পদ্ধতিতে কলম এর মাধ্যমে আমড়ার কলম তৈরি করা হয়। আমড়ার প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে কলম/চারা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চারা রোপণ: এপ্রিল- মে মাসে আ মড়ার চারা/কলম লাগানোর উপযুক্তি সময়। গর্ত তৈরির ১৫-২০ দিন পর পুণরায় গর্তের সার মিশ্রিত মাটি উলটপালট করে চারার গোড়ার বলসহ গর্তের ঠিক মাঝখানে

২০২৪

সোজাভাবে লাগাতে চারার চারিদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে কলম/চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

রোপণের পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। চারাটি যাতে হেলেনা পড়ে সেজন্য শক্ত খুঁটির সাথে চারা বেঁধে দিতে হবে এবং খাঁচা দিয়ে চারাকে গবাদিপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে। মাটি আলগা করা এবং প্রয়োজনে গোড়ায় মাটি দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত বা মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

শুষ্ক মৌসুমে গাছের বৃদ্ধির জন্য সেচ প্রয়োগ করা উত্তম। ফলন্ত গাছের বেলায় আমড়ার ফুল ফোটার শেষ পর্যায়ে এবং মটর দানার সময়ে একবার, স্প্রিংকলার বা বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছে সার প্রয়োগের পর হালকা শেষ প্রয়োগ করা হলে সুফল পাওয়া যায়।

সার ব্যবস্থাপনা

বছরে ২ বার আমড়া গাছে সার প্রয়োগ করা উচিত। বর্ষার শুরুতে ১ম কিস্তি (এপ্রিল-মে) এবং ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) দিতে হবে। মাটিতে 'জো" অবস্থায় সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১০০	১৫০	১০০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	১৫০	২০০	১৫০	৬০
৫-৬ বছর	১৫-২০	২০০	২৫০	২০০	৭৫
৭-১০ বছর	২০-২৫	২৫০	৩০০	২৫০	৯০
১০ বছর তদুর্ধ্ব	২৫-৩০	৩০০	৩৫০	৩০০	১০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

দুই-তিন মাস অন্তর ৪ কিস্তিতে (বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ) উপরোক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। বারি আমড়া-২ এর ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ দ্বিগুন হবে এবং বছরে দুই কিস্তিতে (বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ) সার প্রয়োগ করতে হবে।

২০২৪

ফুল ও ফল ছাটাই

১-২ বছর পর্যন্ত গাছে কোন ফল না রাখাই উত্তম। তাই এ সময় ফুল ধারণ করলেও ফুল ফেলে দেওয়া হলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। বারি আমড়া-১ এর ফলের আধিক্য থাকে বলে ২০-৩০% ফল ছাঁটই করে ফেলে দেওয়া উচিত। এতে গাছের অন্যান্য ফলের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং ফলের গুনগত মানও উন্নত হয়।

পোকামাকড়

১) আমড়া পাতার বিটল পোকা (Hog plum beetle): আমড়া উৎপাদনকারী সব এলাকাতেই এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

লক্ষণ: এ পোকা কচি পাতা খেয়ে গাছকে পত্র শূন্য করে ফেলে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। পূর্ণবয়স্ক ও কীড়া উভয় অবস্থায় এরা আক্রমণ করে। জুন থেকে আগষ্ট মাসে এদের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়। বয়স্ক গাছের চেয়ে কচি গাছ এ পোকার দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। এ পোকার গায়ে লাল ফোঁটার মত দাগ দেখা যায়।

চিত্র: আমড়া পাতার বিটল পোকা

প্রতিকার

১. পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলতে হবে।
২. লার্ভা অবস্থায় গুচ্ছাকারে থাকার সময় পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
৩. আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা রগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পনিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগবালাই

১) আমড়ার পাতায় দাগ (Leaf spot of hog plum): আমড়ার চারার এটি একটি প্রধান রোগ। ছত্রাক জনিত কারনে এই রোগটি হয়।

লক্ষণ

সাধারণত আমড়ার চারার বয়স্ক পাতায় এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের কচি পাতা ভালো থাকে। এ রোগের আক্রমণে পাতার ওপরে প্রথমে ছোট ছোট বা বিন্দু বিন্দু বাদামি দাগ পড়ে। এ সব দাগ পরে বড় হয় এবং দাগের মধ্যভাগে ধূসর বা হালকা ধূসর রং ধারণ করে। দাগের চারিদিকে বাদামি

রেখার বেষ্টনী থাকে। পরবর্তীতে এসব দাগের মাঝখানে ছিঁড়ে ছিদ্র হয়ে যায়। আস্তে আস্তে অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে বড় আকার ধারন করে। দাগ ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে ও চারার বৃদ্ধি কমে যায়।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত পাতা ছিঁড়ে ধ্বংস করতে হবে।

২. আক্রান্ত পাতায় ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পনির সাথে ১ গ্রাম ডায়থেন বা টপসিন) বা বোর্দো মিশ্রণ (তুঁতে+চুন+পানির মিশ্রণ) ছিটাতে হবে।

২) এনথ্রাকনোজ রোগ: এ রোগ আমড়ার পাততা ও ফল পেচে যায়।

লক্ষণ: এ রোগের আক্রসণে পাতা ও ফলে কালচে-বাদামি দাগ দেখা যায়। পাতা আস্তে আস্তে মরে যায়, কচি ফল ঝরে যায় এবং আক্রমণ বেশি হলে গাছটি আস্তে আস্তে মরে যায়।

প্রতিকার

টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি.লি. হারে মিশিয়ে স্প্রে করলে দমন করা যায়।

৪.২.৫ ফলসংগ্রহ

ফল সংগ্রহ:

খাওয়ার জন্য পুষ্ট ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ফল পুষ্ট হলে আমড়ার রং সবুজ এবং গায়ে হালকা বাদামি প্যাচ সৃষ্টি হয়। চারা তৈরি জন্য আমড়া গাছে কিছুটা পাকিয়ে নেওয়াই উত্তম। পাকা হালকা হলুদ রং ধারণ করে। পুষ্ট ফলের বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যায়।

ফলন

হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

৪.২.৬ ফলসংরক্ষণ

সংগ্রহের পর আমড়া ৪-৫ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। এজন্য সংগ্রহের পরপরই বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে কাঠের বাক্সে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্রাগে ফল ভরে যদি চালানোর ব্যবস্থা করা যায় তবে ৫-৬ দিন পর্যন্ত ফল ভাল থাকে। অনেক সময় ১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পেয়ারাকে হিমাগারে ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

৪.৩ লেবু উৎপাদন (Cultivation of Lime/Lemon)

ইংরেজী নাম: Lemon
বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrus aurantifolia*
গোত্র: Rutaceae

লেবু বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত ফল এবং দেশের সর্বত্রই চাষ হয়। লেবু ভিটামিন "সি" সমৃদ্ধ ফল। লেবু বাংলাদেশের সিলেট, পর্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, রাজশাগ্রী ও মৌলভীবাজারে বেশি জন্মে। লেবু জাতীয় ফল বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি কমলালেবু, পাতিলেবু, কাগজিলেবু, বাতাবীলেবু, মুসাম্বী ইত্যাদি। আমাদের দেশে ৬৫.৬৯ হাজার হেক্টর জমিতে লেবুর চাষ হয় এবং উৎপাদন ৮১.৬০ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস২০২১)। এ অধ্যায়ে মূলত পাতিলেবু ও কাগজীলেবু নিয়ে আলোচনা করব। প্রত্যেকের বাড়িতে দুই চারটি করে লেবুর গাছ দেখা যায়।

৪.৩.১ লেবু পরিচিতি ও জাতনির্বাচন

লেবুর পরিচিতি ও ব্যবহার

আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে কাগজি ও পাতি লেবুর চাষ হয়ে থাকে। ছোট গাছ, ছোট ছোট শাখা এবং পাতা। শাখা বেশ শক্ত এবং কাটায় ভরা। সরবৎ চাটনি বিশেষত গরম ভাতে রস মিশিয়ে খেতে ভালো লাগায় কাগজি লেবুর বিশেষ কদর দেখা যায়। কাগজির রসে এমন একটি সুগন্ধ পাওয়া যায় যা পাতিলেবুতে নেই। তাজা ফল হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও এই জাতীয় ফল থেকে নানা রকমের জেলি, ঠান্ডা পানীয়,আচার ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে। প্রসাধন দ্রব্যে ও সাইট্রিক অ্যাসিড তেরি করতে এই ফলের রস ব্যবহার হয়।

লেবুর উৎপত্তি

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া।

পুষ্টিগুণ: এই ফলে মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন"সি" কিছু পরিমাণে ভিটামিন "এ" ও "বি" আছে। এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণ খানজ লবন, ক্ষারীয় লবণ, শর্করা পাওয়া যায়।

জলবায়ু: বিভিন্ন জাতের লেবুর জন্য বিভিন্ন রকম মাটি ও জলবায়ু দরকার হয়। যেমন পাতি বা কাগজি লেবুর জন্য অল্প উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু অথচ বৃষ্টিপাত বেশি নয় এরকম জায়গা ভালো হয়। কিন্তু লেমন অপেক্ষাকৃত প্রতিকুল আবহাওয়া এবং পরিবেশ সহ্য করতে পারে। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৪০° থেকে ১০৮° ফারেনহাইড এর মধ্যে থাকে।

জাত নির্বাচন

পাতলা খোসাযুক্ত লেবুকে আমরা বলি "লাইম" এবং অপেক্ষাকৃত পুরু খোসাযুক্ত লেবুকে বলি "লাইম"।

বারি লেবু-১: এ জাতটি"এলাচী মশলা" এর মত গন্ধযুক্ত বিধায় এর নাম এলাচী লেবু। এলাচী লেবুর গাছ, পাতা ও ফল আকারে বড়। এলাচী লেবুর গাছে সময়মত ও পরিমাণমত সার ও পানি দিলে বছরে ২ বার ফল

দিতে পারে। এলাচী লেবু বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। তবে পাহাড়ি বৃষ্টিবহুল এলাকায় ফলন বেশি হয়।

বৈশিষ্ট

১. গাছ, পাতা ও ফলের আকার বড়।
২. একটি গাছে গড়ে ১০০-১১০ টি ফল ধরে।
৩. প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-২৭০ গ্রাম।
৪. ফল ডিম্বাকার এবং ত্বক অমসৃণ ও পুরু।
৫. ফলের বীজের সংখ্যা ১০০-১১০ টি।
৬. ফলে রস ২৫%।

বারি লেবু-২

এ জাতটি প্রায় সারা বছর ফল উৎপাদনকারী উচ্চ ফলনশীল জাত।

বৈশিষ্ট

১. একটি গাছে গড়ে ১৮০-১৯০ টি ফল ধরে।
২. নিয়মিত ফল ধরে।
৩. ফল গোলাকৃতির ও বহিরাবরণ মসৃণ।
৪. প্রতিটি ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম।
৫. বীজের সংখ্যা ৪০-৪৫ টি, রং সাদাটে ও লম্বা।
৬. ফলে রস ৩১-৩৪%।

বারি লেবু-৩

বৈশিষ্ট

১. একটি গাছে গড়ে ২০০-২২০ টি ফল ধরে।
২. পাতা ছোট আকৃতির ও সবুজ এবং নিয়মিত ফল ধরে।
৩. প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-৬০ গ্রাম।
৪. ফলের আকার মাঝারী ও বহিরাবরণ মসৃণ।
৫. ফলে রস ৩৭-৩৮%।
৬. বীজের সংখ্যা ১৮-২২ টি, রং হালকা বাদামি থেকে সাদাটে ও লম্বাটে।

কাগজী লেবু

বৈশিষ্ট

১. লেবু গাছে ঝোঁপ জাতীয়, পাতা ছোট ছোট।
২. লেবুর আতার ছোট, ডিম্বাকার/গোলাকার।
৩. লেবুর ত্বক পাতলা, রসে পরিপূর্ণ।

চিত্র: বারি লেবু-৩

৪.৩.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জলবায়ু ও মাটি

জমি ও মাটি নির্বাচন: লেবু হালকা দো-আঁশ ও সুনিষ্কাশিত অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।

বগানের লেআউট তৈরি: লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানের আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে লাইন বা সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিন পুর্বে ২.৫ X ২.৫ বা ৩X৩ মিটার দুরত্বে ৬০X৬০X৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্ত বা মাদার উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। এই হিসাবে হেক্টর প্রতি ১১১১- ১৬০০ টি চারার দরকার হয়।

৪.৩.৩ চারাসংগ্রহ ও রোপণ

চারা/কলম ও বংশবিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: লেবু গাছের চারা বীজ ও কলম দুই ভাবেই তৈরি করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার প্রজাতি সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। আবার গুটি কলমের মাধ্যমে বংশপরম্পরায় একই গাছ থেকে চারা তৈরি করা যায়।

চারা সংগ্রহ: লেবুর প্রকৃত মাতৃগাছের কলম সংগ্রহের জন্যে জাত উদ্ভাবনকারী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে সংগ্রহ করা ভাল। এছাড়াও কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার সেন্টার এবং বিএডিসির উদ্যান কেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নার্সারী হতে লেবুর কলম সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চিত্র: লেবুর বংশবিস্তার

২০২৪

চারা/কলম রোপণ: একবছর বয়সের কলমের চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে রোপণ করতে হবে। চারাটি সোজাভাবে গর্তে বসিয়ে, গাছের গোড়ার মাটি ভালোভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে।

৪.৩.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা: চারা রোপণের পর প্রত্যেকটি চারা গাছ একটি করে শক্ত খুঁটি দিয়ে বেধেঁ দিতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: চারার লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময় মত সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল:

গাছের বয়স	সারের নাম ও পরিমাণ			
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১৫	২০০	২০০	২০০
৩-৫ বছর	২০	৪০০	৩০০	৩০০
৬ অথবা তদুর্ধ	২৫	৫০০	৪০০	৪০০

(কৃষি প্রযুক্তি হাত বই ২০২২)

করে উল্লেখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), দ্বিতীয় কিস্তি মধ্যে-ভাদ্র থেকে মধ্য- কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে এবং তৃতীয় কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অঙ্গ ছাটাই: গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া, গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালপালা সূর্যালোক পায় না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা-প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাই করে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। সাধারণত ফল সংগ্রহের পর পুরানো ডালগুলোকে হালকা করে ছেঁটে দিলে প্রচুর ফুল আসে।

লেবুর পোকামাকড়

১) লেবুর প্রজাপতি পোকা (Lemon butterfly): লেবুগাছের পাতার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর পোকা হলো লেবুর প্রজাপতি পোকা।

লক্ষণ: কচি পাতার কিনারা থেকে শুরু করে মধ্যশিরা পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। কখনো কখনো পরিপক্ক পাতা খেতে শুরু করে, এমনকি সম্পূর্ণ গাছের পাতা খেয়ে গাছ পাতাশূন্য করে ফেলে। বিশেষ করে নার্সারিতে এরা লেবুর চারা ও অল্পবয়স্ক গাছের পাতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে গাছের বৃদ্ধি কমিয়ে দিয়ে মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

চিত্র: লেবুর প্রজাপতি পোকা

প্রতিকার

১. ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/ লেবাসিড ৫ ইসি ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

২) লেবু গাছের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা (Citrus stem borer): বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্রই লেবু জাতীয় গাছের অন্যতম প্রধান অনিষ্টকারী পোকা।

লক্ষণ: এই পোকার কীড়া লেবুগাছের ডগার মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে এবং এভাবে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে ওপরে উঠে যায়। আক্রান্ত ডগা আস্তে আস্তে কালো হয়ে মরে যায়। ডগা মারা যাওয়ার পর কীড়া প্রধান কান্ডে সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

১. মরা ও আক্রান্ত ডগা কেটে সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. গর্তের মধ্যে প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন ঢেলে দিয়ে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়।

৩) লেবু গাছের ছাতরা পোকা (Citrus mealy bug): এই জাতীয় পোকা লেবু জাতীয় গাছে সবসময় আক্রমণ করে থাকে।

লক্ষণ: বাচ্চা (নিম্ফ) ও পূর্ণবয়স্ক ছাতরা পোকা লেবুগাছের শাখা ও পাতা থেকে রস শোষণ করে খায়। ফলে গাছের রং মলিন দেখায়, গাছ নেতিয়ে যায় এবং আক্রান্ত শাখা মরে যায়। লেবু গাছের শাখা ও পাতায় ছাতরা পোকার দ্বারা নিঃসৃত মধুকনা জমা হয়। ফলে সেখানে কালো ছত্রাকজেন্মায় যা গাছের সালোক-সংশ্লেষণে বাধা দেয়। মধুকণা খাওয়ার লোভে কালো পিপড়ার সমাগম হয় এবং লেবু গাছে পিপড়ার উৎপাত বেড়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছে ফুল ও ফল হয় না। তাছাড়া অপরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ে।

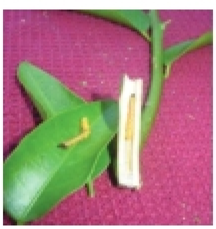

ছবি: লেবু গাছের কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

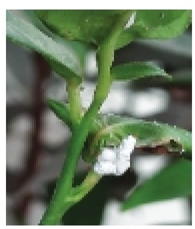

ছবি: লেবু গাছের ছাতরা পোকা

প্রতিকার

১. ঝরে আক্রান্ত ডগা, ডালপালা ও পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
২. পরভোজী লেডি বার্ড বিটল ছাতরা পোকা ধরে খায়।
৩. প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

লেবুর রোগবালাই

১) লেবুর আগা মরা রোগ (Die back): ডালের আগা বা মাথা থেকে শুকিয়ে তা নিচের দিকে নামতে থাবে বলেই এ লক্ষণকে বলা হয় ডাই ব্যাক বা আগা মরা। এ রোগ চি পুষ্টির ঘাটতি জনিত কারনে হয়।

লক্ষণ: আক্রমণের প্রথম দিকে আগা মরা লক্ষণ দু-একটি ডালের মধ্যে সীমিত থাকে। পরে তা সব ডালেই ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত ডালের বয়স্ক পাতার মধ্য শিরা ও অন্যান্য শিরা হলদে রং ধারণ করে এবং শিরার কাছাকাছি স্থানসমূহ ফিঁকে হলুদ হয়ে যায়। শেষে পাতা ঝরে যায় ও ডালের মাথা শুকাতে শুরু করে। রক্ষণ তীব্র আকার ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ গাছই মরে যায়।

ছবি: লেবু গাছের আগা মরারোগ

প্রতিকার

১. প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত ডালপালা কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. লেবুগাছে সুষমমাত্রায় নিয়মিত সার দিতে হবে।
৩. কলম করার জন্য এ রোগ প্রতিরোধী জাতের (কাগজী লেবু, মিঠা কমলা) লেবুর চারা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২) লেবুর ক্যাংকার রোগ (Canker): ক্যাংকার লেবুর একটি প্রধান রোগ।

লক্ষণ পাতা, শাখা, ডগা, পাতা ও ফলের বোঁটা, ফল প্রভৃতি এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগের প্রথম লক্ষণ হলো ছোট ছোট হলুদ দাগ পড়া। পরে এসব দাগ বড় ও উঁচু হয়ে উঠে। দাগ তখন বাদামি ও খসখসে হয়ে যায়। ফুসকুড়ির মতো এসব দাগের চারপাশে হলুদ আভা থাকে। তবে ফলে এরুপ হলদে আভা থাকে না, শুধু পাতায় থাকে। গাছের মাথার দিকে পাতা এ রোগের তীব্র আক্রমণে ঝরে পড়ে।

চিত্র: লেবুর ক্যাংকার রোগ

প্রতিকার

১. রোগ মুক্ত চারা রোপণ করতে হবে।

২. এ রোগে আক্রান্ত মরে যাওয়া গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৩. আক্রান্ত গাছের কোন অংশ কলম তৈরি করার জন্য নেওয়া যাবে না।

৪. ছাঁটাইয়ের পর ১% বোর্দো মিশ্রণ বা প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ মিশিয়ে কাটা জায়গায় ও গাছ ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করতে হবে।

৩) লেবুর গ্রিনিং রোগ (Greening)

এটি লেবুর একটি মহাক্ষতিকর রোগ। এ রোগ ব্যাকটেরিয়া জীবানু দ্বারা হয়ে থাকে।

লক্ষণ: এ রোগে আক্রান্ত লেবু গাছের বয়স্ক পাতার মধ্য ও পার্শ্ব শিরাসমূহ প্রথমে হদুদ রং ধারণ করে। শিরার মধ্যবর্তী অংশসমূহ প্রথমে হালকা হলুদ হয়। মধ্যশিরা থেকে হলদে রং ধীরে ধীরে পাতার কিনারার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষে পুরো পাতাই হলুদ হয়ে যায়। গ্রীস্মকালে এরুপ আক্রান্ত পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ছোট ও পুরু হয়। ডালের এক গিট থেকে আরেক গিটের দূরত্ব কমে আসে। তীব্রভাবে আক্রান্ত গাছ আগা থেকে মরতে দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের ফল খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে, ফলের স্বাদ তিতে হয়ে যায় এবং রসও অনেক কমে যায়।

চিত্র: লেবুর গ্রিনিং রোগ

প্রতিকার

১. গ্রিনিং রোগ মুক্ত সুস্থ সবল চারা রোপণ করতে হবে।

২. আক্রান্ত গাছের কোন অংশ কলম তৈরি করার জন্য নেওয়া যাবে না।

৩. এ রোগের বাহক পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. ১০০০ পিপিএম ঘনত্বের টেট্রাসাইক্লিন দ্রবণে চুবিয়ে কলমসামগ্রী শোধন করতে হবে।

৪.৩.৫ ফলসংগ্রহ

ফল সংগ্রহ: ফলগুলো পুষ্ট হলেই রং বদলাতে আরম্ভ করে। যতই পরিনত হবে ততই রং ধারণ করবে। এছাড়া তৈলরন্ধ্রগুলো স্পষ্ট হলে ফল তোলার উপযুক্ত হয়।

ফলন: কোথাও কোথাও বছরে দুইবার ফলন দেয়। কাগজি বা পাতিলেবু একই গাছে বারোমাস হতে দেখা যায়। ফুল আসা থেকে ফল তৈরি হওয়া পযন্ত ৯ মাসের মতো সময় লাগে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১০-১৫ টন।

৪.৩.৬ ফলসংরক্ষণ

ফল তোলার পর ১১° সে. তাপমাত্রায় ও ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমঘরে দুইমাস পযন্ত তাজা ফল হিসাবে সংরক্ষণ করা যায়।

৪.৪ লটকনের চাষ (Cultivation of Burmese grape)

ইংরেজী নাম: Burmese grape

বৈজ্ঞানিক নাম: *Baccaurea sapida*

গোত্র: Phyllanthaceae

লটকন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত একটি অপ্রচলিত ফল। উৎপাদনের পরিমাণ বেশি না হলেও বাংলাদেশে সব এলাকাতেই এর চাষ হয়। প্রধান কান্ড ও ডালপালা থেকে সরাসরি ফুলের মঞ্জুরী বের হয়। আমাদের দেশে ফলটি “বুবি”(Bubi) সর্বাধিক পরিচিত। নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোণা ও সিলেট এলাকায় উল্লেখ্যযোগ্যভাবে এর চাষাবাদ হয়। এ সব জেলায় ইদানীং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লটকনের চাষ হচ্ছে। আমাদের দেশে ১৬০ হেক্টর জমিতে লটকন চাষ হয় এবং উৎপাদন ২৪১০ মেট্রিক টন (বিবিএস২০২১)। বিভিন্ন দেশে সীমিত আকারে লটকন রপ্তানি হচ্ছে।

৪.৪.১ লটকনের পরিচিতি ও জাতনির্বাচন

লটকনের পরিচিতি ও ব্যবহার

লটকনের গাছ মাঝারি আকৃতির চিরসবুজ গাছে গোল গোল ক্যাপসুলের মত ফল হয়, যা থোকায় থোকায় ধরে। গোলাকার এই ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ ও পাকলে হলুদাভ হয়। টক- মিষ্টি স্বাদযুক্ত লটকন খাদ্যমানের দিক দিয়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ। স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা; যাতে আলাদা ধরনের হলুদ ফুল হয়, উভয় রকম ফুলই সুগন্ধি।ফলে ২-৫ টি বীজ হয়, বীজে গায়ে লাগানো রসালো ভক্ষনযোগ্য অংশ থাকে যা জাত ভেদে টক বা টকমিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। ছায়াযুক্ত স্থানেই এই গাছ ভাল জন্মে।

ব্যবহার: লটকনকে অম্লমধুর ফল বলা যায়। এই ফলের খোসা অনেক নরম। তাই সহজে হাত দিয়ে ছাড়িয়ে সরাসরি ফল হিসাবে খাওয়া যায়। তাছাড়াও জেলী, জ্যাম তৈরিতে এই ফল ব্যবহৃত হয়। লটকনের গাছের ছাল দিয়ে রঙ তৈরি করা হয় যা রেশম সুতা রঙিন করতে ব্যবহৃত হয়।

পুষ্টিগুণ: ফল ভিটামি "বি-২" সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম লটকনে থাকে খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯১ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৪২ গ্রাম, চর্বি ০.৪৫ গ্রাম, আয়রন ০.৩০ গ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৩ গ্রাম এবং ভিটামিন বি২ ০'১৯ গ্রাম।

লটকনের উৎপত্তি: গাছটি দক্ষিণ এশিয়ার বুনো গাছ হিসেবে জন্মালেও বাংলাদেশ, মালয়শিয়া ও থাইল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়।

জাত নির্বাচন: লটকন বাংলাদেশে অত্যন্ত মধুর স্বাদযুক্ত একটি সুপরিচিত ফল।

বারি লটকন-১: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কতৃক উদ্ভাবিত জাতগুলো হলো"বারি লটকন-১"। এটি একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ উপযোগী।

বৈশিষ্ট

১. ফল গোলাকৃতি এবং ফল টক-মিষ্টি স্বাদ (ব্রিক্সমান ১৫.৬০)।
২. ফলের রং হালকা হলুদ থেকে বাদামি বর্ণের
৩. ফলের শাঁস নরম, রসালো ও সুগন্ধযুক্ত
৪. ফলের গড় ওজন ১৫ গ্রাম
৫. প্রতিটি ফলে ৪-৫ টি কোষ থাকে।

৪.৪.২ জমি তৈরি ও গর্তে সার প্রয়োগ

জমি ও মাটি নির্বাচন: সুনিষ্কাশিত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকন চাষ করা যায়। তবে বেলে দো-আঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁতে ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। এজন্য বাড়ির আশেপাশে বা বড় বড় গাছের নিচে অধিক ছায়াযুক্ত স্থানে খুব সহজেই লটকন চাষ করা সম্ভব।

বাগানের লেআউট তৈরি: সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে বর্গাকার পদ্ধতিতেই লটকনের বাগান করা হয়।

গর্ত তৈরি: বর্ষার শুরুতে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পুর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটারের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভারভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটি শকনা হলে গর্তে পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। তারপর ভালভাবে আবার কুপিয়ে চারা/কলম লাগাতে হবে।

চিত্র: লটকন গাছ

৪.৪.৩ চারাসংগ্রহ ও রোপণ

চারাসংগ্রহ: আমাদের দেশের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন নার্সারি থেকেই লটকনের চারা সংগ্রহ করা যায়।

চারা/কলম ও বংশ বিস্তার পদ্ধতি নির্বাচন: বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে বংশ বিস্তার করা যায়। তবে এতে ফলের মাতৃগুণ বজায় থাকে না। বীজে গাছে ফল আসতে পাঁচ-ছয় বছর সময় লাগে কিন্তু কলমের গাছে দু-তিন বছর পর ফল ধরা শুরু করে। এজন্য গুটি কলমের চারা ব্যবহার করা ভাল। লটকনের বীজে আবরণ অত্যন্ত শক্ত। তাই বীজ জমিতে বা পলিব্যাগে বোনার আগে এক থেকে দুদিন পানিতে ভিজিয়ে নিলে চারা দ্রুত গজায়। প্রাথমিক অবস্থায় গাছের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হয়। এরপর এক বছর বয়সের চারা মূল জমিতে লাগানো যায়। গুটিকলমের জন্য নির্বাচিত গাছের সুস্থ-সবল, সতেজ ও নিরোগ ডালের মধ্যে গ্রীস্মের প্রথম ভাগে গুটিকলম করতে হয়। চিকন ও সমান্তরাল ডাল এ কাজের জন্য ব্যবহার করা উত্তম।

চারা/কলম রোপণ: গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পর পরই পানি দিতে হবে।

চারার রোপণের সময়: বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য (এপ্রিল-মে) মাসে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে দিকে অর্থাৎ ভ্রাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টম্বর) মাসেও চারা রোপণ করা যায়।

২০২৪

চিত্র: লটকনের বংশবিস্তার

৪.৪.৪ অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের প্রথমদিকে ঘন ঘন সেচ দেওয়া প্রয়োজন। শকনা মৌসুমে শীতের শেষে গাছে ফুল আসার পর ২/১ টি সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় ও ফলন বাড়ে।

সার প্রয়োগ: কাঙ্খিত ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে লটকন গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেওয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্ধে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৫০০	৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
জিবসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

গাছের গোড়ার ০.৫-১.০ মিটার দূর থেকে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লেখিত সার সমান তিন কিস্তিতে (১ম কিস্তি ফল সংগ্রহের পরপর, ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে এবং ৩য় কিস্তি শীতের শেষে) প্রয়োগ করা যেতে পারে। ১০১৪

ডাল ছাটাই

গাছের মরা ডাল এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

পোকামাকড়

১) ফল ছিদ্রকারী পোকা

লক্ষণ: ফল ছোট অবস্থায় যখন ফলের খোসা নরম থাকে তখন এই পোকা ফলের খোসা চিদ্র করে ডিম পাড়ে। পরবর্তীকালে ডিম থেকে লার্ভা উৎপন্ন হয় এবং ফল পাকলে ফলের নরম শাঁস খেয়ে থাকে।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত ফল পোকাসহ নষ্ট করে ফেলতে হবে।
২. প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে পারফেকথিয়ন বা লেবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ফল ছোট থাকা অবস্থায় গাছে স্প্রে করতে হবে।

২) চেফাল বিটল

লক্ষণ: এই পোকা পাতার নিচে ডিম পাড়ে এবং ডিত থেকে লার্ভা উৎপন্ন হওয়ার পর লার্ভা পাতা খেয়ে ছিদ্র হরে ফেলে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত পাতা খেয়ে জালেরমতো করে ফেলে।

প্রতিকার: সুমিথিয়ন/ ডেবিকুইন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

৩) মিলিবাগ ও সাদা মাছি পোকা: সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়। এরা গাছের পাতার রস শুষে গাছকে দূর্বল করে। রস শোষণের সময় পাতায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে এবং সেই বিষ্ঠা উপরই শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে।

প্রতিকার

১. আক্রান্ত পাতা ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করতে হবে।
২. রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিরতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতা ও গাছের ডালপালায় প্রতি ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করেভিজিয়ে দিতে হবে।

৪) **স্কেল পোকা (Scale insect)**

লক্ষণ: এই পোকা প্রথমে পাতার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে এরা পাতার রস শোষণ করে খেতে থাকে। আস্তে আস্তে এরা কচি ডালেও আক্রমণ করে অবশেষে সমস্ত গাছকে মেরে ফেলে।

প্রতিকার: এই পোকার আক্রমণ দেখা যাওয়া মাত্র ব্রাশ দিয়ে ঘষে মেরে ফেলতে হবে অথবা সাবানের পানি দিয়ে স্প্রে করলেও প্রাথমিকভাবে দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হলে ট্রেসার (০.২ এমএল/লিটার) অথবা ফিপ্রোনিল (১ এমএল/লিটার) অথবা একতারা (০.৫ গ্রাম/লিটার) হারে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

রোগবালাই

১) এ্যানথ্রাকনোজ (Anthranose): কলেটোট্রিকাম সিডি নামক ছত্রাক লটকনের এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। লক্ষণ: গাছের পাতা, কান্ড, শাখ-প্রশাখা ও ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ফল শক্ত, ছোট ও বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকা শুরু হলে দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে এবং ফলটি ফেটে বা পচে যেতে পারে।

প্রতিকার:

১. গাছের নিচে ঝড়ে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
২. গাছে ফল ধরার পর টপসিন-এম অথবা নোইন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ভারভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায।

২) উইল্ট রোগ (Wilt): ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়।

লক্ষণ: প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে পাতা শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখানএবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছ ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে এবং মারা যায়।

প্রতিকার

১. দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বর্দোমিক্সার অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি রিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
৩. বাগানের মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে (২০০-২৫০ গ্রাম/গাছ)।
৪. রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলম করতে হবে।

৪.৩.৫ ফলসংগ্রহ

ফল সংগ্রহ

শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-আগষ্ট মাসে ফল পাকে। ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। ফল পাকলে এর পরিপক্কতা অনুযায়ী ছড়া ছড়া হিসাবে ফল সংগ্রহ করা উচিত। লটকন ফলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত এমন ভাবে ফল ধরে যে, তাতে গাছের ডাল অনেক সময় দেখা যায় না।

ফলন: কলমের গাছে সাধারণত ৪ বছর বয়স থেকেই ফল আসা শুরু করে এবং ১৮-২০ বছরের গাছে সর্বোচ্চ ফলন দেয়। অবস্থান ভেদে গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে গাছ প্রতি ৪ কেজি (৪ বৎসর) থেকে ১২০/১৩০ কেজি (১৮-২০ বৎসর) পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ১২.৫ টন।

৪.৩.৬ ফলসংরক্ষণ

পাঠ সংক্ষেপ

১. গ্রীস্ম ও বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রাপ্যতা শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ।
২. বাংলাদেশ বর্তমানে পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে ৮ম স্থানে রয়েছে।
৩. দেশে ২৩.৭৩ হাজার হেক্টর জমিতে পেয়ারার আবাদ হয় এবং উৎপাদন ২৪৩.৯৬ হাজার মেট্রিক টন (বিবিএস২০২১)।
৪. পেয়ারা টাটকা ফল হিসাবে খাওয়া ছাড়াও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে জ্যাম, জেলী, জুস প্রভৃতি তৈরি করা হয়।
৫. বাংলাদেশে প্রায় ৪.৬২ হাজার হেক্টর জমিতে আমড়ার আবাদ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৪২.৫৩ হাজার মেট্রিক টন । হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১৫-২০ মেট্রিক টন।
৬. বারি আমড়া-১ জাতটি প্রায় সারা বছর ফল ধরে।
৭. গুটি কলমের মাধ্যমে পেয়ারার বংশ বিস্তার বহুল প্রচলিত।
৮. ব্যাগিং করা পেয়ারা অপেক্ষাকৃত বড় এবং আকর্ষণীয় রঙের হয়।
৯. চারা তৈরি করার জন্য আমড়া গাছে কিছুটা পাকিয়ে নেওয়া উত্তম।
১০. লেবু হালকা দো-আঁশ ও নিষ্কাশন সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।
১১. লটকনের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা এবং কান্ড ও ডালপালা থেকে সরাসরি ফুলের মন্জুরী বের হয়।
১২. লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁত ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে ।

এসো নিজে করি

ইতোমধ্যে তোমরা পেয়ারা, আমড়া, লেবু ও লটকন চাষে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে জেনেছ। নিম্ন ছকে কয়েকটি পোকা/রোগের আক্রান্ত ছবির নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুমি ছবি দেখে পোকা/রোগ সনাক্ত করে ফসলের নাম ও দমনের উপায় নির্ধারণ কর।

ক্র/নং	ফসলের নাম	পোকা/রোগের নাম	ছবি দেখে উত্তর লিখ	দমনের উপায়
০১)				

০২)			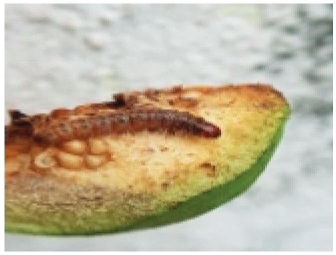	
০৩)				
০৪)				
০৫)				
০৬)				

অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন

ইতেমধ্যে তুমি লেবুগাছে কিভাবে ডালপালা ছাঁটাই করা হয় সে সম্পর্কে জেনেছ। তুমি তোমার পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করে সেখানে কৃষকরা লেবুগাছের ডালপালা ছাঁটাই করে এমন একজন কৃষকের সাথে আলাপ করে তিনি কিভাবে লেবু গাছের ডালপালা ছাঁটাই করেছের তা পর্যবেক্ষণ করে তোমার পরামর্শ প্রদান সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

প্রশ্নাবলী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পেয়ারা চাষের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা কত?
২. আমাদের দেশে কোন ফল “বুবি” নামে পরিচিত?
৩. “মাধুরী” কিসের জাত?
৪. প্রতি বছর আমড়া ধরে এমন একটি জাতে নাম বল?
৫. লটকন ফল কোথায় ধরে?
৬. বিশ্বে পেয়ারা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
৭. লেবুর একটি ভাইরাস ঘটিত রোগের নাম লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. লটকন কোন পরিবেশে ভাল হয়?
২. পেয়ারা চাষে কেন ফল ছাঁটাইবরণ করা হয়?
৩. পেয়ারা চাষে ব্যাগিং এ উপকারিতা কি?
৪. গুটি কলমের মাধ্যমে লটকনের বংশ বিস্তার কেন উত্তম?
৫. লেবুর গ্রিনিং রোগে লক্ষণ কি?
৬. আমড়ার ব্যবহার লিখ।

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. পেয়ারার গুটি কলম পদ্ধতির ধাপ সমুহ বর্ণনা কর।
২. লেবুর রোগ ও পোকা দমন পদ্ধতি আলোচনা কর।
৩. আমড়ার গর্ত তৈরী, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ পদ্ধতি লিখ।

জব ৪.১: পেয়ারার জেলী তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
- পেয়ারার জেলী তৈরি করতে পারবে।
- জেলী তৈরির বিভিন্ন উপকরণের নাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১.প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;

২.জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;

৩.যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পুর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;

৪ .কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;

৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

যে পদ্ধতিতে ফল বা সবজির আকার, প্রকৃতি, অবয়ব ও পারস্পর্শিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভৌত, রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষে এবং ফল ও সবজির বিরাট অংশের অপচয় রোধকল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই। প্রক্রিয়াজাতকরণ হচ্ছে সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। জেলী তৈরি করার সময় ফলের রস ব্যবহার করা হয়। মিহি চালুনী বা কাপড়ের সাহায্যে ফলের শাঁসকে ছেকে নেওয়া হয় বলে ফলের আঁশ বাদ পড়ে যায়। এজন্য প্রস্তুতকৃত জেলী বেশ পরিস্কার ও অনেকটা স্বচ্ছ দেখায়। ফল ও সবজিতে অবস্থিত পেকটিন চিনির উপস্থিতিতে রস অথবা পাল্পকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। কম পেকটিনযুক্ত ফলের সাথে সামান্য পরিমাণ (০.৪-০.৫%) পেকটিন ফলের রসের সাথে মিশিয়ে নিতে হয়। যে সমস্ত ফলে পেকটিনের পরিমাণ বেশি যেমন: পেয়ারা সেগুলোতে পেকটিন যোগ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত পেয়ারা, আম, আনারস, পেঁপে, মিষ্টি বেল, টমেটো ইত্যাদি থেকে জেলী তৈরি করা হয়। গ্রামে লোকজনদেরকে ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দিতে পারলে তারা সহজে

২০২৪

ফল ও সবজি থেকে বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে বিভিন্ন রকম আচার, চাটরি, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি সহজেই তৈরি করতে পারবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

পেয়ারার রস	১ কেজি
চিনি	৬৫০ গ্রাম
অ্যাসেটিক এসিড	৭ গ্রাম
পটাশিয়াম মেটাবাইসালফেট (কেএমএস)	৫৫০ গ্রাম

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১। ব্যালেন্স, ২। সসপেন, ৩। ঝাঝরা, ৪। বঁটি বা ছুরি, ৫। বোতল, ৭। চামচ ৮। হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার (এই যন্ত্রের সাহায্যে রস বা সিরাপে দ্রবনীয় কঠিন পদার্থ (টিএসএস) পরিমাণ নিণয় করা হয়। যা ডিগ্রী বিক্স হিসাবে দেখানো হয়), ৯। পাতলা কাপড় ইত্যাদি।

কাজের ধারা/প্রস্তুত প্রণালী

রস নিষ্কাশন

১। পরিপুষ্ট অথবা কাঁচা বা ডাঁসা পেয়ারা পরিস্কার পানিতে ধুয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে সমপরিমাণ পানিতে সিদ্ধ করতে হবে।

২। সিদ্ধ করার সময় কাঠের হাতল দিলে টুকরোগুলোকে ভালভার নাড়াচাড়া দিতে হবে যাতে এগুলোতে আঠালো ভাব সৃষ্টি হয়। পেয়ারা সাধারণত ৩০-৩৫ মিনিট সিদ্ধ করলেই নিঃসৃত রস জেলী তৈরির উপযোগী হয়।

৩। পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে রস আলাদা করে নিতে হবে। এ রসের সাথেই বের হয়ে আসে পেকটিন ও এসিড। নিঃসৃত পেকটিন ও এসিড জেলী তৈরিতে সাহায্য করে। রস যতই স্বচ্ছ হবে জেলী ততই উজ্জ্বল হবে। এভাবে জেলী তৈরির জন্য রস তৈরি হয়ে গেল।

জেলী তৈরিকরণ

১। উপকরণের পরিমাণ অনুযায়ী রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড আলাদা করে ওজন নিতে হবে।

২। এবার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে হবে। রান্না চলাকালীন সময় অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে। মিশ্রণটি মোটমুটি গাঢ় হয়ে আসলে রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে ঘন ঘন গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করতে হবে এবং ৫৮° ব্রিক্স (টিএসএস ৫৮°) আসা পর্যন্ত রান্না চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর সাইট্রিক এসিড যোগ করে মিশ্রণটি ৬৫° ব্রিক্স আসা পর্যন্ত জ্বাল করতে হবে। (হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে রস ও সিরাপের দ্রবণীয় কঠিন পদার্থ (টিএসএস) পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। যা ডিগ্রী বা ব্রিক্স হিসাবে দেখানো হয়)।

৩। রিফ্রাক্টোমিটার এর অনুপস্থিতিতে শীটিং পরীক্ষার মাধ্যমে জেলী হয়ে যাওয়ার চুড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। শীটিং পদ্ধতিতে চামচ মিশ্রণের মধ্যে ডুবানো হয় এবয় ঠান্ডা হরে চামচ বেয়ে মিশ্রণটিকে পড়তে দেওয়া হয়। যদি এটা একা ধারে না পড়ে শীটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জেলী হয়ে গেছে।
৪। টিএসএস ৬৫° ব্রিক্স হলে বা শীটিং পরীক্ষায় জেলী প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বুঝা গেলে নির্ধারিত পরিমাণ কেএমএস সামান্য পানিতে গুলিয়ে মিশ্রণের সাথে যোগ করে ৬৬° ব্রিক্স আসা পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে।
৫। চুলা থেকে পাত্রটি নামিয়ে জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ভালভাবে ছিপি এঁটে শুকনো ও ঠান্ডা জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

বোতল জীবাণুমুক্তকরণ: জেলীর বোতলগুলোকে সসপেনে পানি নিয়ে তাতে ১৫-২০ মিনিট গরম পানিতে ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। জেলী হয়ে গেলে বোতলগুলোকে পাত্র থেকে উঠিয়ে পানি নিংড়িয়ে জেলী ভরা উত্তম।

কাজের সতর্কতা

১। স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় জেলী বোতল সংক্ষণ করতে হবে।
২। বোতলের জেলী মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ১ বছরের অধিক সময় ধরে ব্যবহার করা যায়।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি পেয়ারার জেলী তৈরি করার মাধ্যমে ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৪.২: আমড়ার আচার তৈরি করার দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
- আমড়ার আচার তৈরি করতে পারবে।
- আচার তৈরির বিভিন্ন উপকরণের নাম ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;

৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষে এবং ফল ও সবজির বিরাট অংশের অপচয় রোধকল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই। যে পদ্ধতিতে ফল বা সবজির আকার, প্রকৃতি, অবয়ব ও পারস্পর্শিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভৌত, রাসায়নিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলে। প্রক্রিয়াজাতকরণ হচ্ছে সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। রকমারি মশলা মেশানো ফল বা সবজি খাওয়ার তেল অথবা ভিনেগারে ডুবানো অবস্থায় প্রস্তুত খাদ্যকে আচার বা পিকল বলা হয়। বিভিন্ন রকম ফল ও সবজি যেমন- আমড়া, তেঁতুল, জলপাই, আম, চালতা ইত্যাদি থেকে আচার তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিতে ফল বা সবজির জলীয় অংশ বেশ কমে গিয়ে তেল বা ভিনেগার সম্পৃক্ত হয়ে উঠলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। আচার তৈরিতে মশলা হিসাবে সরিষা, আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, মেঁথি, জিরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয। এছাড়া টক মিষ্টি করার জন্য চিনি ও অ্যাসিটিক এসিড ব্যবহার করা হয়। আচারে ব্যবহৃত সরিষার তেল ও এসিড প্রিজারভেটিভ হিসাবে কাজ করে। আচার খাদ্যকে সুস্বাদু করে। চিনি পুষ্টি ও মিষ্টতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে এবং মশলা উহাকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তুলে। সব ধরনের আচার মুলত একই নীতির প্রয়োগ ঘটে এবং তৈরি প্রক্রিয়াও প্রায় অভিন্ন। শুধু উপকরণের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। খুব সহজ পদ্ধতিতে এবয় মূল্যবার যন্ত্রপাতি ছাড়াউ আচার প্রস্তুত করা সম্ভব বিধায় গ্রাম পর্যায়ে এ প্রযুক্তি প্রসারের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সাথে সৃষ্টি হবে বেকার যুবক ও কৃষক-কৃষাণীদের জন্য কমসংস্থানের নতুন ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র।

প্রয়োজনীয় উপকরণ সমূহ

আমড়া	১ কেজি	জিরার গুঁড়া	২.৫ গ্রাম
রসুন	৩০ গ্রাম	মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম
আদা	৬০ গ্রাম	চিনি	১০০ গ্রাম
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	লবণ	৪০ গ্রাম
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	সরিষার তৈল	৪০০ মি.লি.
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	অ্যাসেটিক এসিড (গ্রাসিয়াল)	১৫ মি.লি.

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ:

১। ব্যালেন্স, ২। সসপেন, ৩। ঝাঝরা, ৪। বঁটি, ৫। ছুরি. ৬। বোতল,। ৭। চামচ ইত্যাদি।

কাজের ধারা/প্রস্তুত প্রণালী

১। আমড়ার আচারের জন্য নিখুঁত ও পরিপক্ক আমড়া বেছে নিতে হবে। পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বঁটি বা চাকু দিয়ে আমড়ার উপরের ছাল বা ত্বক ছিলে ফেলে দিতে হবে।

২। আমড়াগুলো ৩-৪ সে.মি. লম্বা টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

৩। কাটা আমড়াগুলো সামান্য পানি দিয়ে সিদ্ধ করুন এবং পরে পানি নিংড়িয়ে নিতে হবে।

৪। অন্যান্য উপকরণগুলো পরিমাণমত ওজন দিয়ে আলাদা করে রাখতে হবে।

৫। আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিলিটার ১% অ্যাসিটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেস্ট তৈরী করে তাতে শুকনা মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া ভাল ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

৬। একটি কড়াইয়ে সবটুকু সরিষার তেল নিয়ে তাতে আমড়ার টুকরো গুলো ভাল ভাবে ভেজে নিন।

৭। একটি ঝাঝরা চামচ দিয়ে আমড়ার ভাজা টুকরাগুলো উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখতে হবে।

৮। এবার আদা, রসুন ও হলুদ-মরিচের পেষ্ট আমড়া ভেজে নেওয়ার পর কড়াইয়ের পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে ভালভাবে কষিয়ে নিতে হবে।

৯। অতঃপর কষানো মশলার সাথে ভাজা আমড়ার টুকরো,চিনি, লবণ, মেথির গু৭ড়া, জিড়ার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করতে হবে এবং জ্বাল চালিয়ে যেতে হবে।

১০। শেষে অবশিষ্ট ১৪ মি.লি. অ্যাসিটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে সামান্য সময় জ্বাল দিতে হবে।

১১। অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর তৌরকৃত আচার গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আচারের উপর তেল ভেসে থাকে।

১২। আচারের বোতলগুলো পরিষ্কার এবং শুকনো জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় আচারের বোতল সংক্ষণ করতে হবে।

২। বোতলের আচার মাঝে মাঝে রোদে দিয়ে ১ বছরের অধিক সময় ধরে ব্রবহার করা যায়।

৩। আচারের বোতলগুলোকে আচার ভরার পূর্বে সসপেনে পানি নিয়ে তাতে ১৫-২০ মিনিট গরম পানিতে ফটিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি আমড়ার আচার তৈরি করার মাধ্যমে ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

জব ৪.২ : পেয়ারা বাগানে গর্ত তৈরি, গর্তে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণের দক্ষতা অর্জন

শিখনফল

- পেয়ারা চাষের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি ও জীবাণুমুক্ত করতে পারবে।
- গর্তে প্রয়োগের জন্য জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।
- গর্তের মাটির সাথে সার সঠিক পরিমান ও পদ্ধতিতে মিশিয়ে চারা রোপণের উপযোগী করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদন্ড

১. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
২. জব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৩. যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্তকরণের পূর্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
৪. কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত মালামাল ও কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
৬. কাজ শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী যন্ত্রপাতি ও মালামাল জমা দেয়া ইত্যাদি।

ব্যক্তিগতসুরক্ষাসরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
০১	সানগ্লাস	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	এপ্রোন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৩	মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৪	হ্যান্ড গ্লাভস	স্ট্যান্ডার্ড	০১ জোড়া

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি

লাভজনকভাবে এবং বিজ্ঞানসম্মত বা পরিকল্পিত পেয়ারা ফল বাগান স্থাপন করতে হলে জমি ভালোভাবে চাষের পর বাগানে গাছ লাগানোর জন্য নকশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা রোপণের স্থানে গর্ত করা উচিত। অত:পর খননকৃত গর্তে সার প্রয়োগ করে চারা রোপণের উপযোগী করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ

১। কোদাল, ২। খন্তা ও শাবল, ৩। পচা গোবর ও রাসায়নিক সার, ৪। ঝুড়ি, ৫। মাপযন্ত্র বা ট্যাপ, ৬। ঝরণা, ৭। বাঁশের কাঠি, ৮। দড়ি, ৯। বাঁশের খাচা।

কাজের ধারা/প্রস্তুত প্রণালী

১) জাতভেদে পেয়ারার গাছ রোপণের জন্য বর্ষার আগে অর্থাৎ বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে গর্ত করা উত্তম।

২) জমিতে গর্ত করার আগে চারা রোপণের নকশা মোতাবেক ফিতা বা কাঠির সাহায্যে মাপ দিতে হবে। মাপ দিয়ে নির্ধারিত দূরত্বে খুঁটি পুঁতে চারা রোপণের স্থান চিহ্নিত করতে হবে।

৩) চাষের পর জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট মাপের গর্ত তৈরি করতে হবে।

৪) জমি তৈরি সম্পন্ন হলে চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্ত চিহ্নিতকরণ খুঁটিকে কেন্দ্র করে নিচে উল্লেখিত আকারেরগর্ত তৈরি করতে হবে-

ফল গাছের নাম	চারা বসানোর গর্তের মাপ (ঘণ সেমি)
পেয়ারা	৬০ সেমি X ৬০ সেমি X ৪৫ সেমি

মাটি শক্ত ও কাদা মাটিতে বড় আকারের গর্ত খুবই উপযোগী। বেলে দো-আঁশ বা হালকা ধরনের মাটির জন্য গর্তের আকার কিছু ছোট হলেও চলে।

৫) গর্ত খননকালে গর্তের উপরের তিন ভাগের দুই ভাগ মাটি একদিকে এবং নিচের বাকী তিন ভাগের এক ভাগ মাটি অন্যপার্শ্বে রাখতে হবে। গর্তের খননকৃত মাটি ছড়িয়ে রেখে শুকিয়ে নেয়া ভাল। গর্তের ভিতর পাতা পুড়িয়ে রোগ জীবাণু বা পোকার কীড়া নষ্ট করা যায়। কয়েক দিন সূর্যের আলো গর্তে পড়লেও রোগজীবাণু মারা যায়।

৬) এক সপ্তাহ পরে গর্তের উপরের মাটির সংগে পচা গোবর ও রাসানিক সার নিচে উল্লেখিত পরিমান মিশাতে হবে:

গাছের আকৃতি	গোবর সার	টিএসপি	এমওপি
পেয়ারা	১০-১৫ কেজি	২৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম

জীবাণু ও পোকার কীড়া নষ্ট করার পর গর্তের উপরের মাটির সাথে উপরে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় জৈব ও রাসায়নিক সার মেশানোর পর গর্ত ভরাট করার সময় উপরের অংশের মাটি নিচে দিতে হবে। আর নিচের অংশের মাটি গর্তের উপরিভাগে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি বেশি উর্বর। উপরের মাটি নিচে দিলে গাছ দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান তাড়াতাড়ি পাবে। মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

৭) সার মেশানো মাটি দিয়ে গর্ত পূরণ করার এক সপ্তাহ গর্তে চারা রোপণের উপযোগী হয়। চারা পট বা পলিথিন ব্যাগ থেকে সাবধানে বের করতে হবে।

৮) এখন চারার গোড়ার বলের পরিমান মাটি গর্ত হতে সরিয়ে রাখতে হবে। এরপর পলিথিন ব্যাগটি চাকু দ্বারা লম্বালম্বিভাবে কেটে দিতে হবে। তবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেন মাটির বলটি পলিথিন ব্যাগ কাটার সময় অথবা পট থেকে বের করার সময় ভেঙ্গে না যায়।

৯) এখন চারাটি সোজা করে গর্তে বসাতে হবে। গর্তে বসানোর সময় দেখতে হবে যেন বেশি নিচে বা উপরে লাগানো না হয়। আগে যে পরিমাণ নিচে পুঁতা ছিল ঠিক তা বজায় রাখতে হবে। গর্তে চারা বসানোর পর গর্ত হতে সরিয়ে নেয়া মাটি দিয়ে বলটি ভালো করে চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর তাতে ঝাঝরি দিয়ে পানি দিতে হবে।

১০) চারা লাগানোর পর উত্তর -পশ্চিম কোনা বরাবর গাছের সহায়ক খুঁটি দিয়ে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে চারা বাতাসে হেলে গাছের ক্ষতি হবে।

১১) পেয়ারার চারা রোপণের পর নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। চারা রোপণের প্রথম কয়েকদিন কেবল পাতায় পানি দিয়ে চারাকে সতেজ রাখতে হবে এবং কয়েকদিন হালকা ছায়া দিতে পারলে ভাল হয়। বাঁশের খাঁচা দিয়ে চারাটি গরু ছাগলের আক্রমণ হতে রক্ষারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজের সতর্কতা

১। হালকা মাটিতে গর্ত খননের সময় সাবধানে খনন করতে হবে যেন গর্তে পাড় ভেঙ্গে না যায়।

২। খননকৃত গর্ত ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে যেন রোগজীবাণু মারা যায় এবং বিষাক্ত পদার্থ দূরীভুত হয়।

৩। পরিমিত আকারের গর্ত খনন করা উচিত।

৪। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

৫। গর্ত ভরাট করার সময় গর্তের ভেতরের মাটি যেন আলগা না থাকে।

৬। সার ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

তুমি সঠিক সময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ করতে সক্ষম হয়েছ।

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য

আশা করি বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে পারবে।

সমাপ্ত

স্বাস্থ্যসেবা : শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগের একটি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সাধারণ রোগের জন্য এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ঔষধও সরবরাহ করা হয়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য